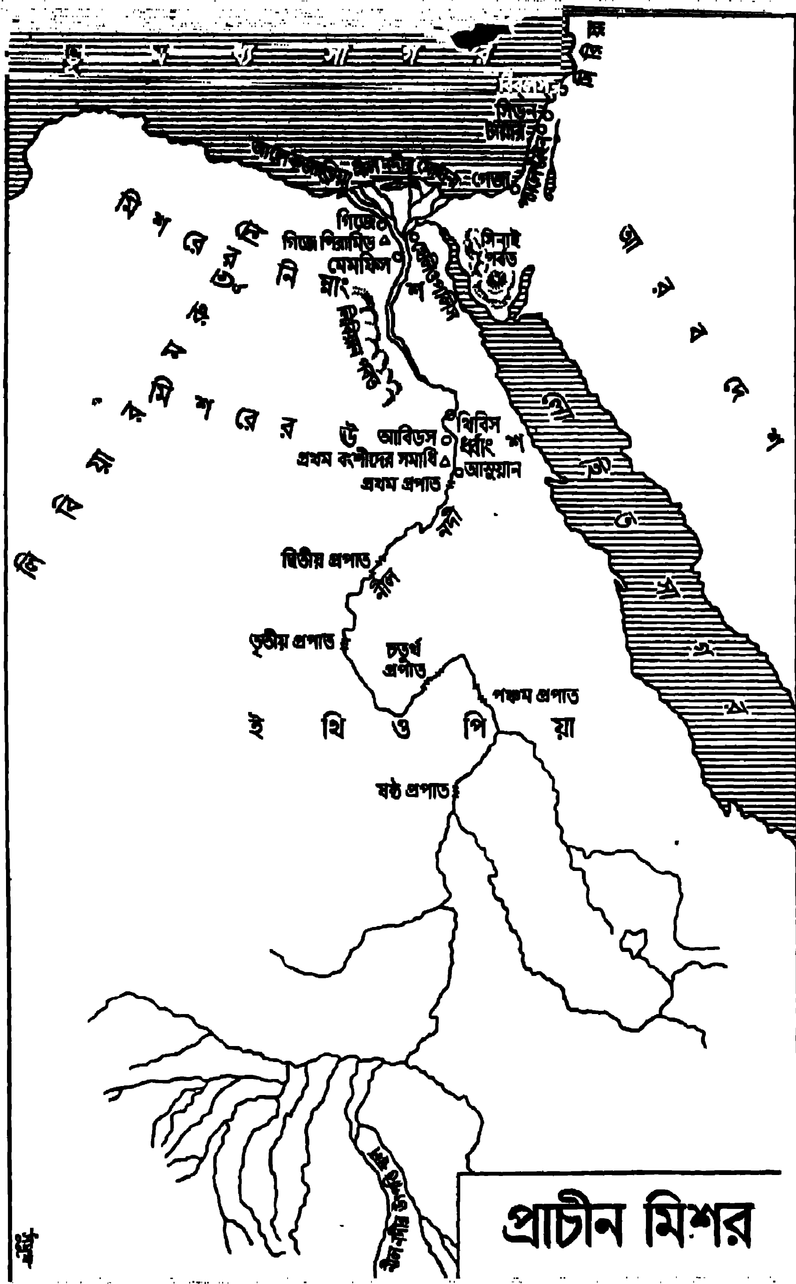
প্রাচীন মিশর


গিজে
গিজে পিরামিড
মেমফিস
থিবিস
আবিডস
ধ্বংস
প্রথম বংশীদের সমাধি
আসুয়ান
প্রথম প্রপাত
দ্বিতীয় প্রপাত
তৃতীয় প্রপাত
চতুর্থ প্রপাত
পঞ্চম প্রপাত
ষষ্ঠ প্রপাত
ইথিওপিয়া
সিনাই
পর্বত

প্রাচীন মিশর

প্রাচীন মিশর

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূল্য ৫'৫০ টাকা

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৬
প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র : সুমুখ মিত্র

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
ক্যাশ প্রেস
৩০/বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

বিস্মরণীর অতল অন্ধকূপ থেকে
প্রাচীন মিশরের লুপ্ত ভাষা ও মহান ঐতিহ্যের
উদ্ধার সাধন করেছিলেন
যে নিষ্ঠাবান অক্লান্তকর্মী সুধীবৃন্দ,
প্রাচীন মিশরের গৌরবময় ইতিহাসকে
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন
যে উৎসাহী জ্ঞানদীপ্ত বিদগ্ধমণ্ডলী,
মিশরতত্ত্বের পথিকৃৎ উনবিংশ শতকের
সেই অশেষগুণান্বিত মনস্বী পূর্বসূরীগণের স্মরণে—

বিষয় সূচী

পূর্বাভাষ

প্রথম খণ্ড

ইতিহাসের পটভূমি

দ্বিতীয় খণ্ড

সংস্কৃতির পরিচয়

পঞ্জী

চিত্র-সূচী

রেখাঙ্কন

হাফটোন চিত্র

প্রচ্ছদ পট ও নাম-পৃষ্ঠা

পূর্বাভাষ

মিশরের স্বপ্নময় অতীতকে আবিষ্কার করে মিশর তত্ত্ববিদেরা এমন একটি 'লস্ট অ্যাটলানটিস'-এর সন্ধান দিয়েছিলেন যেখানে মানুষের প্রথম আত্মসম্বিৎ সচকিতে চোখ মেলেছিল, সভ্যতার প্রথম দীপ্তি ঝলমলিয়ে উঠেছিল। রূপকথা নয় কিম্বদন্তী নয়, মিশরের যে-ইতিহাস তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে গড়ে তুলেছেন, সে-ইতিহাস একান্ত বাস্তব একটি সুদৃঢ় ইমারত, পিরামিড স্ফিনক্সের মতই যার বিকার নেই, বিনাশ নেই। এখানকার সুন্দর সুন্দর প্রাচীর-চিত্র বিরাটাকার ভাস্কর্য সবই সেই আদি কালের ইতিবৃত্তের সঙ্গে জড়ানো, ইতিহাস চিরঞ্জীব হয়ে আছে অতুলনীয় শিল্প-সম্পদের মধ্যে। প্রাচীর ও পাহাড়ের গায়ে হায়রোগ্লাইফিক লিখনের পাঠোদ্ধার করে, রাশি রাশি প্যাপিরাসে লিখিত নানা বিবরণ পাঠ করে তাঁরা এতকালের কৃষ্ণ যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, বিশ্বমানবের সামনে এনে ধরেছেন মিশরের বিভিন্ন যুগের অনুপম কাহিনী, রাজবংশ রাষ্ট্র সমাজ ধর্মের অসংখ্য বর্ণাঢ্য চিত্রাবলী। সেই সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার পাঠকের একটু বিশেষ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই এ-বইখানা লেখা হয়েছে।

প্রাচীন মিশর ত এক স্বপ্নরাজ্য, সে-রামও নেই সে-অযোধ্যাও নেই। সে-কথা ঠিক, কিন্তু স্বপ্নরাজ্যে কল্পবাসের জন্যে আজও আমরা রামায়ণ শুনি, ইলিয়াড-ওডেসি পড়ি। সুদূর অতীতের ভাস্বর সূর্য দূরে থাক জোনাকির মিটমিটে দীপ্তিরও যেন কেমন আকর্ষণ আছে। তবে এরূপ কিছু আকর্ষণ সত্ত্বেও বিশ্ব-সভ্যতার পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন লুপ্ত সভ্যতার বিস্তৃত কাহিনী লিখবার সার্থকতা সম্বন্ধে বিতর্ক তোলা যে যায় না এমন নয়। বিষয়টা একটু বিস্তারিত করে বলা দরকার। এই ধরুন, অন্যান্য দেশের যেমন সুমের ক্রীট সিন্ধু উপত্যকার কথা বাদ দিয়ে মিশরীয় সভ্যতার বর্ণনাকে একটা লক্ষ্যশূন্য অসম্পূর্ণ প্রয়াস বলে মনে করা স্বাভাবিক। মিশরে যেমন সভ্যতার উদ্ভব হল, এই তিনটি দেশেও তখন তেমনি আলোর ঝর্ণা ভুঁই ফুঁড়ে উঠেছিল, সুমের ও

ক্রীটের সঙ্গে মিশরের অন্তর্বিস্তর বাণিজ্যিক সংযোগ সাংস্কৃতিক বিনিময়ও ঘটেছিল। তারপর ব্যাবিলোনীয় আসিরীয় পারসীক গ্রীক রোমান প্রভৃতি জাতীয় সংস্কৃতির পর-পর আবির্ভাব, হিন্দু বৌদ্ধ চীনা ক্রিশ্চান মুস্লিম সমাজের ক্রমবিকাশ, এই সব বৃত্তান্ত বিবেচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, উত্থান-পতনের চলা-পথে জাতিবিশেষের ভাগ্যদেবতা যেমন বিধানই করে থাকুন না কেন, বিশ্বদেব তাঁর সভ্যতার দান থেকে মানবসমাজকে বঞ্চিত করেন নি। বিশ্ব-সভ্যতা কখনো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় নি, তার বহমান প্রবাহে কোথাও ছেদ পড়ে নি। যুগে-যুগে এই সভ্যতার স্রোতস্বিনী দুকূল ভাসিয়ে দেশ বিদেশে ছুটেছে, যেখানকার যে-জিনিস কঙ্কর বালু কর্দম সবই সংগ্রহ করেছে, আর কত সব দেশের মানুষ নিজের সম্পদ মনে করে বিদেশের সেই বিভূতি অঙ্গে মেখে উল্লাস-ভরে গান গেয়েছে—

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার
কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।

ক্ষুদ্র জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে সভ্যতাকে চিরদিন আটক রেখেছে মানুষ এমনি করেই, ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমরা তার পরিচয় পাই। সেই দেশ-কেন্দ্রিক সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তন করে মানব-সভ্যতাকে একটি সার্বজননীন ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন হয়েছে এখন। তাই জাতীয় সংস্কৃতির খণ্ডিত কাহিনীগুলিকে একটি অনুস্যূত সূত্রে গেঁথে সার্বভৌম বিশ্ব-ইতিহাস (Universal History) রচনার উদ্যম দেখা দিয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাস শুধু কতকগুলি জাতীয় ইতিবৃত্তের সমষ্টিমাত্র নয়, তার মধ্যে আছে মানবাত্মার বিকাশের প্রেরণা। পণ্ডিত-প্রবর লর্ড অ্যাকটন সার্বভৌম ইতিহাসের এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন:

By Universal History I understand that which is distinct from the combined history of all countries, which is not a rope of sand, but a continuous development and is not a burden on the memory, but an illumination of the soul. It moves in a succession to which the nations are subsidiary.……

এই আদর্শের অনুসরণ করে এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌, জওহরলাল নেহরু, উইল

ডুরান্ট ও অন্যান্য মনস্বীগণ পৃথিবীর ইতিহাস লিখেছেন। বলা বাহুল্য তাঁদের কালোচিত রচনাগুলি পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছে কিন্তু এ-কথা বলার পরও প্রশ্ন থেকে যায়: সার্বভৌম ইতিহাসের অরণ্যে জাতীয় সংস্কৃতির মহীরুহগুলি নির্বিশেষে হারিয়ে যায় না ত? বনের সঙ্গে তরুরাজির কোথায় এমন বিরোধ যে গাছের চিত্র স্বতন্ত্রভাবে আঁকলে বনের সামগ্রিক নক্সার মূল্য বজায় রাখা চলে না? সমষ্টির সমগ্র রূপটি চোখের সামনে রেখে ব্যষ্টির ইতিবৃত্তের আলোচনাকে পণ্ডশ্রম মনে করবার কোন কারণ আছে কি?

বিশ্বের অতিপ্রাচীন কয়েকটি সভ্যতার মধ্যে একটির জন্মভূমি মিশর, সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে প্যালেস্টাইন সিরিয়া মেসোপটেমিয়া গ্রীস ও ইরাণের সঙ্গে তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল। নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের অতীত কালের সঙ্গে, তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হয় সে-সব দেশের ইতিহাস যখন পড়া যায়। সেখানকার প্রত্যেকটি ইতিহাস যেন মিউজিয়ামের এক একটি কক্ষ, মিশরের সুবৃহৎ হল-ঘরে প্রথম প্রবেশ করে তবেই ত পুবের খোলা দরজা দিয়ে অন্য কক্ষগুলিতে যাওয়া-আসা চলে। প্রাচীন মিশরের কাহিনী বর্ণনার সার্থকতা এখানেই। কিন্তু প্রাচ্য ভূমির জ্ঞানের বৃত্ত যা আরম্ভ করা হয়েছে মিশরে, সে-বৃত্তকে সম্পূর্ণ করতে হয় সেখানকার অন্যান্য দেশগুলির বিশেষত প্যালেস্টাইন ইরাক ও ইরাণের ইতিহাস পাঠ করে। বাংলা ভাষায় এ-সব দেশের কোন ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস আছে বলে জানা নেই। অদূর ভবিষ্যতে এই ইতিহাসসমূহের প্রকাশন প্রধানত নির্ভর করবে বাংলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত পাঠকের আগ্রহ এবং সরকারী শিক্ষা-বিভাগের সক্রিয় সমর্থনের ওপর। এই পুস্তক পাঠ করে পাঠকের মনে কৌতূহল জাগ্রত হবে মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য জানবার জন্য, এই ভরসায় গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, 'প্রাচীন মিশর' গ্রন্থের মুদ্রণে অর্থ সাহায্য দ্বারা উৎসাহ দানের জন্য লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।

নৃতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ মত প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা ছিল 'মেডিটারেনিয়ান জাতি', ইলিয়ট স্মিথ যার নাম দিয়েছেন 'ব্রাউন জাতি'। নূতন প্রস্তরযুগে (Neolithic Age) এই জাতির মানুষ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ইয়োরোপ, উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্য সাগর-তীরবর্তী দেশসমূহ, মিশর—

এই বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে স্থানে স্থানে বসবাস করতো। এই জাতির মানুষের বর্ণ ফিকে সাদা তামাটে পর্যন্ত হরেক রকমের, চুল কালো, মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, দৈর্ঘ্য মাঝারি। মিশরের প্রাগ-বংশীয় (pre dynastic) অধিবাসীরা মেডিটারেনিয়ান ধাঁচের খাঁটি দৃষ্টান্ত, পরে পিরামিড যুগ থেকে গোল করোটি চওড়া মুখবিশিষ্ট নব আগন্তুকদের সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পূর্বাঞ্চলে সুমের দেশ এমন কি সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত মেডিটারেনিয়ান জাতির বিস্তৃতি ঘটেছিল।

আফ্রো-এশিয়ার বিরাট ভূখণ্ডে মেডিটারেনিয়ান জাতির ব্যাপ্তি সত্বেও সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল নীল ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস ও সিন্ধু, এই তিনটি মাত্র নদী উপত্যকায়, আর সব তৃণভূমিতে যারা থাকতো তারা সকলেই ছিল বর্বর যাযাবর। নদী উপত্যকায় মানুষ স্থিতিবান হয়ে কিরূপে সভ্য সমাজ গড়ে তুলেছিল, আর সেই জাতিরই বাকি সব লোক মরুপ্রান্তরে ও তৃণ ভূমিতে যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করে অনুন্নত বর্বর জীবনই বা কেন যাপন করতে লাগলো, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে তার কারণ এখন অজানা নেই। ভূ-তাত্বিকেরা যাকে বলেন 'চতুর্থ বরফ যুগ' সে-সময়ে সমগ্র উত্তর ইউরোপ বরফে আচ্ছন্ন ছিল আলপস ও পিরেনিজ পর্যন্ত, হিমবাহ নেমে আসতো পর্বত শ্রেণী থেকে, সেখানকার অতি শীতল বায়ুমণ্ডল অতলান্তের বর্ষণোন্মুখ মরশুমি হাওয়াকে দক্ষিণ দিকে সরিয়ে রেখেছিল। মনুষ্যবাস ছিল না সেখানে, সেই তুষারাবৃত ভূমি ছিল ম্যামথ শিং-যুক্ত হরিণ, পশম-যুক্ত গণ্ডার প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারের লীলাভূমি, যে-সব জন্তু এখন আর নেই, কিন্তু যাদের চিত্র আলটামিরা গুহার গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। ইউরোপের যখন এমনধারা অবস্থা প্রকৃতির কৃপায় তখন উত্তর আফ্রিকা আরব পারস্য ও সিন্ধু উপত্যকা, এই দেশগুলি বন জঙ্গল তৃণগুল্ম সমাচ্ছন্ন ছিল। সাহারা ছিল শ্যামল জলাভূমি, নল-খাগড়া প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ, তারই মধ্যে মানুষ থাকতো, প্রস্তরাস্ত্র দিয়ে পশু ও মাছ শিকার করতো (অনেক প্রস্তরাস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এ-অঞ্চলে), বনের ফল-মূল সংগ্রহ করতো। এই ধরনের শিকারীর জীবনকে নৃ-তাত্বিকেরা 'খাদ্য সংগ্রহের পর্যায়'-ভুক্ত করে থাকেন। তখন সম্ভবত আগুনের ব্যবহার সুরু হয় নি, কৃষি-কার্য ত নয়ই।

তারপর ঘটলো একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বরফ-যুগ যেমন শেষ হয়ে এলো, বরফ তখন উত্তরমুখে আর্কটিক মহাসমুদ্রের দিকে সরে যেতে লাগলো। ইউরোপ

ক্রমেই মনুষ্যবাসের উপযোগী হয়ে উঠলো। অতলান্তের বর্ষা বায়ুপ্রবাহ এখন আর আফ্রো-এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডকে জলসিক্ত করে না, তার গতিমুখ ফিরেছে উত্তরে ইউরোপের দিকে। ফলে ইউরোপের হল প্রভূত উপকার, কিন্তু দারুণ গ্রীষ্ম ও বায়ুর প্রকোপে সাহারা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল। কালক্রমে একই কারণে আফ্রো-এশিয়ার অনেক স্থানেরই সেই দশা হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে যে-রকম সাড়া দিয়েছে সেখানকার মানুষ, চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রার প্রণালীও রূপায়িত হয়ে গেছে। আফ্রো-এশিয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের নির্মম চ্যালেঞ্জের সামনে মানুষের বাঁচবার মাত্র তিনটি পথ মুক্ত ছিল, প্রথমটি স্থান ত্যাগ এবং অভ্যস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের সন্ধান করে তারই মধ্যে বসবাস। কতগুলি মানব-গোষ্ঠী গেল ইউরোপে, সেখানে তারা পশু শিকার মাছ ধরা এমনি সব অভ্যস্ত কাজ করে কায়ক্লেশে বেঁচে রইলো। শীতের দাঁত-বসানো তীব্রতায় আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহ করাই তাদের প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছিল, এমন একটুও শক্তি অবশিষ্ট ছিল না যা দিয়ে ভবিষ্যতে সভ্যতার ভিত্তি-স্থাপন চলে। একদল যেমন গেল ইউরোপে—তেমন আর একদল মানুষ সাহারা ছেড়ে দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবেশ করলো, তাদের সেখানে খাদ্যের অভাব ঘটে নি বটে, কিন্তু উষ্ণ দেশের ক্লান্তিকর পরিবেশ তাদের অলস শ্রম-বিমুখ করে তুলেছিল, সেজন্য এরাও সভ্যতার অগ্রদূত হতে পারি নি। দ্বিতীয় এক শ্রেণীর মানুষ প্রাকৃতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও বাসভূমি ত্যাগ করে নি, তাদের মধ্যে যারা অভ্যাস বদলাতে পারে নি তারা ধ্বংস পেল, আর যারা পশুপালন দ্বারা জীবনধারনের নতুন উপায় উদ্ভাবণ করলো, তারা যাযাবর জাতি হয়ে উঠলো, এখানে ওখানে ঘুরতে-ফিরতে লাগলো চারণভূমির সন্ধানে। এই যাযাবর জাতিসমূহ স্থিতিবান বর্ধিষ্ণু সমাজের পক্ষে ছিল একটি মানবীয় চ্যালেঞ্জ, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে সভ্য-সমাজ বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এই ত গেল যাযাবরদের কথা, কিন্তু তৃতীয় একটি মানবসমাজ নদী উপত্যকার জলা-ভূমিতে এসে পরিচিত পরিবেশের মধ্যে বসবাস করেও জীবনযাত্রার অভ্যাস বদলে ফেলেছিল। খাদ্য সংগ্রাহক পর্যায়ের উর্ধ্বে উঠেছিল তারা, সুজলা শ্যামলা নদী উপত্যকার অনুকূল অবস্থার মধ্যে নূতন উদ্ভাবনী শক্তি জেগে উঠেছিল তাদের, তাই তারা সুরু করেছিল চাষের কাজ, গম যব প্রভৃতি ফসল উৎপাদন। কৃষির

আবিষ্কার নীল ইউক্রেটিস-টাইগ্রিস ও সিন্ধু, আফ্রো-এশিয়ার এই তিনটি উপত্যকাভূমিতে মানব-সভ্যতার প্রথম আবির্ভাবের পথ বেঁধে দিয়েছিল। অতি প্রাচীনকালে চীনেও পীত নদী উপত্যকায় অনুরূপ অবস্থার মধ্যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র কাহিনী।

প্রাচীন প্রস্তর-যুগ চলেছিল লক্ষ লক্ষ বছর। সে-যুগের মানুষের তমসাচ্ছন্ন শিকারী জীবনে যুগান্তকর বিপ্লব ঘটিয়েছিল কৃষির উদ্ভব, যেমন বিপ্লব চলেছে আমাদের চোখের সামনে, মানুষ যখন চন্দ্রলোকে গ্রহ-উপগ্রহে ভ্রমণের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবার উপক্রম করেছে অ্যাটমিক আবিষ্কারের ফলে। মানুষ তখন নৃতত্ত্বের সংজ্ঞায় খাদ্য উৎপাদকের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। উৎপন্ন শস্য রাখার জন্য আধার দরকার হয়, সেই প্রয়োজন থেকে মৃৎ-শিল্পের উৎপত্তি। প্রাচীন প্রস্তর-যুগে অমসৃণ প্রস্তরখণ্ড হাতিয়ার রূপে ব্যবহার হত, এখন মসৃণ করা চকচকে পাথরে-তৈরি ছুরি বর্শা-ফলক প্রভৃতি নানারকম প্রহরণ নূতন প্রস্তর-যুগের আগমন ঘোষণা করেছিল। প্রয়োজনের অনুপাতে প্রায় চক্রবৃদ্ধি হারে নূতন শিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল। তারপর এক সময়ে চিত্রাঙ্কণ থেকে হায়রোগ্লাইফিক লিখন সুরু হয়েছিল মিশরে, তার বিবরণ এই গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। সুমের দেশে প্রবর্তিত হয়েছিল 'কিউনিফরম' বা কীলকাক্ষরে লিখন।

মিশরে কৃষির প্রথম উদ্যোগের স্মৃতি 'অসিরিস মিথ'-এর কল্পনায় রক্ষিত হয়েছে। প্রবাদ এই যে নীল-নদীর অববাহিকা অঞ্চলের রাজা ছিলেন অসিরিস, মিশরে প্রথমে তিনিই না কি কৃষি-কার্য শিখিয়েছিলেন। একটি প্রাচীন চিত্রে দেখা যায়, অসিরিসের দেহ থেকে যবের চারা গাছের উদ্গম হয়েছে, কালক্রমে তিনি দেবতার মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন। পশ্চিমে লিবিয়ার তৃণ-ভূমি শুকিয়ে যখন মরুপ্রান্তরে পরিণত হল তখন সেখানকার মানুষেরা মিশরের নিম্নভাগে অববাহিকা অঞ্চলে এসে বাসা বাঁধলো, সে-অঞ্চলের দুর্ভেদ্য নিরন্ধ্র ঘন বনের মধ্যে জনসমাগম পূর্বে কখনো হয় নি। এদিকে দক্ষিণাঞ্চলের নদী উপত্যকায়ও নূতন আগন্তুকের দল এসে জুটেছিল। মিশরের স্থানে স্থানে তখন জলাভূমির অভাব ছিল না, প্রাচীন ও মধ্যম রাজ্যের চিত্রগুলিতে জলাভূমির তরুলতা হাঁস পানকৌড়ি প্রভৃতি জলচর পক্ষী এবং নানা প্রকার জীব যেমন জল-হস্তী বন্য বরাহ কুমীর ইত্যাদি আঁকা রয়েছে। এখন কিন্তু সারা দেশটায় বিল নেই, সে-সব জীবজন্তুও আর দেখা যায় না।

নব প্রস্তর যুগের বিস্তর সমাধি রয়েছে মিশরে, সমাধি-গর্ভে প্রাপ্ত নর-কঙ্কাল মৃৎ-পাত্র শস্য প্রহরণ উপকরণ এগুলি থেকে সে-কালের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত জানা গেছে। সভ্যতার উদ্ভবের পূর্ব থেকেই মানুষ পরলোকে সদ্গতির কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিল, যদিও তাদের সে-চিন্তা তখন মৃত্যুর পরে দেহ-মুক্ত ছায়া-পুরুষের আহার ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকরণের মধ্যেই সীমিত ছিল। সভ্যতার যুগে ধর্ম-বিশ্বাসের বিবর্তনের সঙ্গে আদিম ধরনের মাটি-চাপা-দেওয়া সমাধিরও রূপান্তর হয়েছিল, প্রথমে পোড়া ইঁটের কবর তারপর সে জায়গায় বিশ্ব-বিখ্যাত পিরামিড তৈরি করা হল। তখন ধাতু-যুগ আগত, মিশরে তাম্রের ব্যবহার ইতিপূর্বেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, সুমের ও সিন্ধু উপত্যকায় ব্রঞ্জের চলন হয়েছিল। ধাতু আবিষ্কারের ফলে মানব-সমাজে যে-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, ইতিহাসে তার তুলনা মেলে শুধু তিনটি ক্ষেত্রে: কৃষির উদ্ভাবনে, শিল্প-যুগের প্রবর্তনে, আর এখনকার অ্যাটমিক শক্তির অত্যাশ্চর্য সম্ভাবনায়।

ধাতুর ব্যবহার আর লিখন আরম্ভের সঙ্গে ইতিহাসের রূপ-মঞ্চে উঠেছিল মিশর খৃস্ট পূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে, তখনই তার আত্মশক্তির চেতনা জেগেছিল, সৃজনের প্রেরণা তাকে মুখর চঞ্চল করে তুলেছিল। জ্ঞান-দীপ্ত অপূর্ব সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতির মিছিল চলেছিল তিন হাজার বছর ধরে। রাজা রাষ্ট্র ধর্মের কত বিচিত্র ইন্দ্রজাল, কত জ্ঞান বিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধনা, কত অপরূপ শিল্পসৃষ্টি, অতুলনীয় সেই ঐশ্বর্যসম্ভার সবই মিশর উত্তরাধিকাররূপে জগতকে দিয়ে গেছে নিজেকে রিক্ত করে। প্রাচীন মিশরের প্রজ্ঞা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছিল, শ্রদ্ধা ভরে মাথা নত করে গ্রীকরা সেই প্রজ্ঞার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়েছিল।

মিশরের তিন সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস বিবৃতির গোড়াতেই আমাদের মনে এই প্রশ্নটি জেগে ওঠে: সেই দুর্নিরীক্ষ্য সুদূর অতীতে এমন কোন বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক মিলন-ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল কি যেখানে আমাদের ভারত-ভূমির সঙ্গে প্রাচীন মিশরের সংযোগ স্থাপনের সুযোগ ঘটেছিল। সিন্ধু সভ্যতার প্রভূত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে মাহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়, সে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল খৃস্ট পূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে, মিশরে তখন পিরামিড যুগ। এ-সময়কার মিশরীয় বাণিজ্য জাহাজগুলিতে পুন্ট্ (সোমালিল্যাণ্ড) থেকে স্বর্ণ ফিনিসিয়া থেকে দাস ও পণ্যাদি আনয়নের চিত্র

পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে মিশরের যে কোনরূপ সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ না আছে মিশরের লিখিত বিবরণ বা চিত্রাবলীতে, না আছে সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনসমূহের মধ্যে। মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আর্যজাতির দক্ষিণদিকে প্রথম নিষ্ক্রামণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় অষ্টাদশ খৃস্ট পূর্বাব্দে, হয়ত বা বহির্গমন সুরু হয়েছিল আরও কিছুকাল পূর্বে। মিশরের ইতিবৃত্ত থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে পূর্বদেশ থেকে হিকসোসরা মিশর আক্রামণ করেছিল খৃস্ট পূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক আরনল্ড টয়েনবি বলেন, হিকসোসরা আর্যজাতি কিন্তু খাঁটি নয়, মিশ্র—পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসরের পথে তাদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের স্থানীয় অধিবাসীরা ভিড়ে পড়েছিল, রক্তের সংমিশ্রণও ঘটেছিল। তিনি আরও বলেন, আর্যদের এক বৃহৎ অংশ তখন হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে সিন্ধুদেশে ও পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছিল, আর্যাবর্ত ব্রহ্মবর্ত প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারাই, এবং অবশিষ্ট অংশ যারা পশ্চিমদিকে যাত্রা করেছিল, তারা ব্যাবিলোনিয়া-বিজয়ী ক্যাসাইট আর মিশর-বিজয়ী হিকসোস। হিকসোসরা প্রকৃতপক্ষে আর্যজাতি ছিল কি না সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে, অনেকের মতে তারা সেমেটিক জাতি, কিন্তু পঞ্চদশ খৃস্টপূর্বাব্দে আসিরিয়ার উত্তরে মিটানি নামক রাজ্যের নৃপতিরা ও শাসকেরা ছিলেন ইন্দো-আর্য—সেকথা অনস্বীকার্য। হার্জফেল্ড তাঁর **Archæological History of Persia** গ্রন্থে মধ্য এশিয়া থেকে আর্যদের দুটি 'মাইগ্রেসনে'র কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম দফার আর্যগণ পূর্ব ইরাণের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল ১৫০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে, এবং তাদেরই একটি ক্ষুদ্র দল পশ্চিমদিকে বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়ে মিটানি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল খৃস্ট পূর্ব ১৪৫০ অব্দে। দ্বিতীয় দফার 'মাইগ্রেসনে' আর্যরা ইরাণে এসে বসবাস করেছিল (১০০০ খৃঃ পূঃ)। মিটানির শাসকবর্গের ভাষা ছিল আদিম বৈদিক ভাষারই অনুরূপ, ইন্দ্র বরুণ রুদ্র নাসত্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা ছিলেন তাঁদের উপাস্য। মিটানিরাজ দশরথের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন মিশরের ফারাও তৃতীয় আমেনহটেপ, এই রাজকন্যাই সুপ্রসিদ্ধ ইখনাটনের জননী। রাজ-পরিবারের বাহিরে, বিশেষ করে কোন বিদেশী কন্যার সঙ্গে ফারাওর বিবাহ ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। স্পষ্টই দেখা যায়, ইন্দো-আর্যবংশীয়া রানী পুরোহিতসমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, আর সেই জন্যেই সম্ভবত তিনি পুত্র ইখনাটনের শিক্ষা দীক্ষার পরিচালনা এমনভাবে করেছিলেন যে সিংহাসনে আরোহণ করেই

ইখনাটন পিতৃগণের কুলধর্মের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হলেন। পুরোহিত-গোষ্ঠীর ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, মিশরীয় দেবদেবীকে নির্বাসিত করে একমাত্র সূর্যদেব আটনের পূজার বোধন করেছিলেন মাতৃদেবীর শিক্ষার প্রভাবে, এই বৃত্তান্তটি থেকে আমাদের দেশের কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি অনুমান করেছেন যে ভারতের বৈদিক ধর্মকে অনুসরণ করেই মিশরে একেশ্বরবাদ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইখনাটনের একেশ্বরবাদ বৈপ্লবিক হলেও বিদেশ থেকে একটি আমদানি করা জিনিস বলে মনে করবার কারণ নেই, কেননা মিশরীয় ধর্মের ধারাবাহিক স্বভাবিক পরিণতিই ছিল একেশ্বরবাদ। এ-সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি—এখানে বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

প্রথম খণ্ড

ইতিহাসের পটভূমি

১

নীল নদীর উপত্যকা

মানব সভ্যতার ধাতৃভূমি নদী উপত্যকা। অতি প্রাচীন কালে নদী উপত্যকায় যে-কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, মিশরীয় সভ্যতা তার অন্যতম। মিশরে যেমন মধ্যপ্রাচ্যেও তেমনি ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকায় দেখা দিয়েছিল ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা, তার পরিচয় বহুকাল পূর্বে পাওয়া গেছে। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সাম্প্রতিক। ইতিপূর্বে ঐতিহাসিকেরা এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে মিশরীয় সভ্যতাই প্রাচীনতম, এবং এই উৎসধারা অন্যান্য দেশে প্রবাহিত হয়ে সেখানকার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। এখন সেই পূর্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটেছে। বিগত কয়েক দশকে মেসোপটেমিয়ায় উর প্রভৃতি স্থানে এবং সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বিস্তৃত খননকার্য দ্বারা যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা, সেই তথ্যগুলি থেকে এই প্রমাণ হয় যে মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার আদিকাল সমসাময়িক, আর মিশরীয় সংস্কৃতির অনেক ভাব ও উপকরণ সুমেরদেশ অর্থাৎ মেসোপটেমিয়া থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সুমেরীয় বা ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার জনক মিশর নয়, ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন পরিবেশে স্বতন্ত্রভাবে তাদের জন্ম। কিন্তু কথাটায় প্রাচীন মিশরের বৈদগ্ধ্যকে কোনমতে খর্ব করা হয় না। মিশরের সংস্কৃতি মানব জাতির একটি গৌরবময় উত্তরাধিকার। বিরাটের কল্পনাকে স্থায়ী রূপ দান করে যেরূপ শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল মিশরে, এক কথায় বলতে গেলে বিশ্বজগতে তার তুলনা নেই।

নীল নদীর উৎপত্তি আবিসিনিয়ার পাহাড় অঞ্চলে, সেখান থেকে উত্তর দিকে প্রায় চার হাজার মাইল প্রবাহিত হয়ে নদী এসে ভূমধ্য সাগরে মিশেছে। নদী-স্রোত এই সুদীর্ঘ পথ বিনা বাধায় অতিক্রম করে নি। ছয়টি বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরের স্তূপ স্রোতের একটানা গতিকে ব্যাহত করে প্রপাতের (cataract) সৃষ্টি করেছে। এই প্রপাতগুলি ঠিক নায়েগ্রা জল-প্রপাতের মত

কোন উঁচু পাহাড় থেকে ধারায়-ধারায় নিচে এসে পড়ে নি, এখানকার ছোট ছোট পাহাড়গুলিকে বেষ্টন করে প্রবাহটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে। এলিফ্যান-টাইন নামক স্থানের কাছে যে প্রপাত দেখা যায়, সেইটেই 'প্রথম প্রপাত', সেখান থেকে নদী সোজা বয়ে অববাহিকায় গিয়ে পড়েছে। এই প্রথম প্রপাতের উত্তরে সাহারা মরু অঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত উপত্যকাভূমিই মিশর। উপত্যকার স্থানে-স্থানে নরম পাথর কেটে নদী প্রবাহিত, নদীর একটি শাখা পশ্চিম দিকে দু' শো মাইল দূরে ফায়ুম হ্রদে গিয়ে পড়েছে। অনতিপ্রশস্ত উপত্যকাভূমি গড়ে মাত্র ত্রিশ মাইল চওড়া, সাত শো মাইল দীর্ঘ, উভয় পার্শে পাহাড় ও পাহাড়ের মত উঁচু মরু প্রান্তর। সমুদ্রের এক শো মাইল দক্ষিণে নীল নদী সপ্তমুখী অববাহিকায় বিভক্ত হয়েছে, বর্তমানে দুইটি মাত্র নদীমোহানা অবশিষ্ট। এই অববাহিকা অঞ্চলের নাম গ্রীকরা দিয়েছিল 'ডেলটা' অর্থাৎ 'ব-দ্বীপ'।

মিশরের নীল নদী উত্তরবাহিনী, আর ইরাকের ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস দক্ষিণ অভিমুখে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। দুই দেশের নদীর প্রবাহ যেমন বিপরীতমুখী, উপত্যকাভূমির পরিবেশও তেমনি ভিন্ন রকমের। ইরাকের নদী দুটির প্রকৃতি অস্থির চঞ্চল, অকস্মাৎ স্ফীত হয়ে প্রবল বন্যায় কখন যে দেশ ভেসে যায়, তার কিছু ঠিক নেই। বৃষ্টিরও বিরাম নেই, মাঠ ঘাট পঙ্ক কর্দমে ভরে যায়। এই সব কারণে প্রাচীন সুমেরদেশে প্রাকৃতিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইঁট দিয়ে বাঁধানো উঁচু বাঁধের ওপর নগর প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। সেখানে প্রকৃতির দুর্মদ শক্তির কাছে মানুষ নিজেকে নিতান্তই দুর্বল অনুভব করেছে, আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাসের চেয়ে দৈবশক্তির কাছে আত্মসমর্পণকেই শ্রেয় মনে করেছে। পক্ষান্তরে মিশরবাসীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিন্ন রূপ, অভিজ্ঞতাও অন্য রকমের। নদীর প্রবাহ অনুসরণ করে দিগ্‌মণ্ডলের যে ধারণা সে করেছে, সেই মত উত্তর দিকের নাম দিয়েছে 'ভাঁটার পথ' দক্ষিণ দিকের নাম 'উজান পথ'। তাই সে ইউফ্রেটিস নদীর এই অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছে: "সেই বিপরীত বাহিনী নদী যা উজান-পথে (দক্ষিণ দিকে) ভাটিয়ে চলেছে"। (**"that inverted river which goes downstream in going upstream"**)। নীল নদীর উভয় তটভূমির ওপর তালকুঞ্জের শ্যামশোভা, মাঝে মাঝে জলাভূমির মধ্যে প্যাপিরাসের জঙ্গল। পিছন দিকে দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে যত দূর দৃষ্টি যায় বিস্তৃত বালুরাশির ওপর প্রখর সূর্যের চোখ ঝলসানো রৌদ্রকিরণ। উর্বর

অনুর্বর তরুগুল্মহীন মরুদেশে নীল নদীর প্রশান্ত জলধারা সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ তৃণাস্তীর্ণ উপত্যকাভূমির ওপর দিয়ে ধীরে বয়ে চলেছে, গতিবেগ ঘণ্টায় তিন মাইল মাত্র। ইউফ্রেটিসের মত নীল নদীতে নেই উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতা, নেই উদ্দাম প্লাবন। অবিশ্রাম বৃষ্টির জলে অনিয়মিত ভাবে নদী স্ফীত হয় না, নির্দিষ্ট ঋতু কালে পাহাড়ে বরফ-গলার ফলে জল বৃদ্ধি পেয়ে দুকূল ভাসিয়ে দেয় আবার যথাকালে সেই ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, কোথাও অনিশ্চয়তার লেশ মাত্র নেই। প্রকৃতি যেখানে এমন বিনা উপদ্রবে সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাত্রার সাহায্য করে মানুষ সেখানে স্বভাবত আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, দৈবশক্তির কাছে আত্ম-সমর্পণের তেমন প্রয়োজন অনুভব করে না। মিশরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আমরা সেই আত্মনির্ভরশীলতার সাক্ষাৎ পাই, মিশরের ঐতিহ্যে আত্মশক্তির ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস। এখানে মানুষ নিজেকে দুর্বল বা ক্ষুদ্র মনে করে নি। প্রকৃতি তার জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না বলে নিজেকে পৃথিবীর প্রভু বলেই মনে করেছে সে। তার কল্পনা ক্ষুদ্রত্বের সীমাবন্ধন ছিঁড়ে ফেলে বিরাট আকার ধারণ করেছে, আর তখনই সম্ভব হয়েছে পিরামিড বা সমাধিগুহা বা স্ফিনক্সের মত বিরাট আকৃতির শিল্প নির্মাণ।

উত্তরে সুবিস্তীর্ণ অববাহিকা অঞ্চল আর দক্ষিণে অপ্রশস্ত দীর্ঘ নদী উপত্যকা, এই দুই অংশে নিসর্গ প্রকৃতির প্রভেদ যেমন, আদিকাল থেকে মানুষের চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যও তেমনি দেখা গেছে। মিশরের ঊর্ধ্বাংশের সংযোগ মরু অঞ্চল বা আফ্রিকার সঙ্গে, নিম্নাংশ ভূমধ্য সাগর ও এশিয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। উত্তরাংশে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ব-দ্বীপের দুই প্রান্তে। পূর্ব প্রান্ত দিয়ে ঐতিহাসিক যুগেরও আগেকার সেমেটিক জাতি প্রবেশ করেছে দুস্তর মরু অতিক্রম করে, আর পশ্চিম কোণ দিয়ে এসেছে লিবিয়ান জাতিসমূহ। প্রাচীন মিশরী ভাষার সেমেটিক গঠন-প্রণালী স্পষ্টই সেমেটিক প্রভাব ইঙ্গিত করে। দক্ষিণ মিশরের সঙ্গে নদীর ঊর্ধ্বাংশের সংযোগের বাধা পূর্বোক্ত কয়েকটি প্রপাত, কিন্তু সেই বাধা সত্ত্বেও দক্ষিণের নিগ্রো জাতিরা প্রথম প্রপাতের তলদেশে এসে ব্যবসায় ক্ষেত্রে মিশরীদের সঙ্গে মিলিত হত। এই মিলন-স্থানের নাম 'স্বয়ান' (আস্‌য়ান) অর্থাৎ বাজার। এইরূপে প্রপাতের ঊর্ধ্বে নীল নদী সুদানের সঙ্গে বাণিজ্যের জলপথ হয়ে উঠেছিল। এই সব কারণে উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের অধিবাসীরা প্রতিবেশী

হলেও তাদের পরস্পর সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি, যেমন সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তারা নানা জাতীয় বিদেশীর সঙ্গে। ফলে তাদের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত বৈষম্য, আচার অনুষ্ঠানের প্রভেদ প্রকট হয়ে উঠেছিল। এই বিষম পার্থক্যের বিষয় একজন প্রাচীন মিশরীর আক্ষেপোক্তির মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঝোঁকের মাথায় কর্ম ত্যাগ করে তিনি বলেছেন: "কর্ম ছেড়ে কেন যে এমন ছিটকে পড়লাম তা জানি না। এ যেন একটা স্বপ্ন—মনে হয় যেন কোন ব-দ্বীপের মানুষ হঠাৎ উপত্যকাভূমির পার্বত্য অঞ্চলে ('এলিফ্যানটাইন') চালান হয়ে এসেছে।" তিনি এই কথা বলতে চেয়েছেন, দুই অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, একের সঙ্গে অন্যের কোন মিল নেই। দুই অংশের ঐতিহ্য ও কথ্য ভাষা বিভিন্ন, প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তিও ছিল উভয়ের মধ্যে। কিন্তু এই সব প্রভেদ সত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার করতেই হয় যে মিশর এক দেশ এবং সেই দেশের অংশদ্বয়ের মধ্যে আছে মূলগত ঐক্য, যে-ঐক্যের যোগাযোগটি নেই বহির্জগতের সঙ্গে। মিশরের এই বৈশিষ্ট্য তার সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

দক্ষিণখণ্ডে উপত্যকার প্রান্তে সারি-সারি মরুবালুকার ঢিবি দেখা যায়, সেগুলি প্রাগ-রাজবংশীয় (**pre-dynastic**) যুগের মৃতের সমাধি। সেই সব সমাধিমধ্যে শয়ান রয়েছে নরকঙ্কাল, আর তার চার ধারে সযত্নে প্রোথিত গম যব প্রভৃতি শস্য-ভরা মাটির হাঁড়ি এবং নানাবিধ প্রস্তরাস্ত্র। প্রস্তর যুগের মানুষ, এমন সুদর্শন পাথরের অস্ত্র আর কোথাও দেখা যায় না। এই সব হাঁড়ি-কুঁড়ি পরবর্তী কালের মৃৎ-ভাণ্ডের মত কুম্ভকারের চাকায় প্রস্তুত হয় নি, সেগুলি হাতে গড়া, কাদা মাটি আঙুল দিয়ে টিপে-টিপে তৈরি, কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর। প্রাচীন ও নবীন প্রস্তর-যুগের (**palaeolithic and neolithic**) দু' রকম সংস্কৃতিরই অবশেষ রয়েছে মিশরদেশে, সঠিক কাল নির্ণয় সহজ নয়। নব-প্রস্তর যুগের মানুষ, যাদের অবশেষ চিহ্নগুলি চারদিকে ছড়ানো রয়েছে তারাই যে উত্তরকালের সুসভ্য মিশরীদের পূর্বপুরুষ, সে-কথাও নিশ্চয় করে বলা কঠিন। অনেক বিষয়েই এখানকার নব-প্রস্তর যুগের মানুষদের রীতি নীতি পরবর্তীকালের মিশরীদের থেকে বিশেষ রূপে বিভিন্ন। এই সব প্রস্তর যুগের মানুষ মৃতকে গোর দেবার আগে তার দেহ খণ্ড-খণ্ড করে কাটতো এবং মাংসের একটুখানি ভক্ষণও করতো। মৃতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত তার মাংস ভক্ষণ করা হত (**"eaten**

with honour")। সম্ভবত তাদের ধারণা ছিল এই যে মৃত ব্যক্তির মাংস ভক্ষণ দ্বারা তার গুণ ও শক্তি অর্জন সম্ভব হয়।*

মিশরে তাম্রের ব্যবহার সুরু হয়েছিল প্রাগ-রাজবংশীয় কালে। তাম্র কিরূপে সে-যুগের সভ্যতায় ধীরে-ধীরে প্রবেশ করে পাথরের স্থান অধিকার করেছিল, সেই পরিবর্তনের প্রত্যেকটি ধাপের সঙ্গে পরিচয় ঘটে সমাধির পদার্থগুলিকে পরীক্ষা করলে। ধাতু প্রবর্তনের প্রথম অবস্থায় পাথরের উপকরণ বা অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করা হয় নি। প্রস্তর নির্মিত সুন্দর ছুরি ছোরা বর্শা-ফলকের পাশেই রয়েছে তাম্র নির্মিত অলঙ্কার ও অন্যান্য ছোট-খাটো তামার জিনিস। ক্রমে পাথরের জিনিসের ছাঁদে তামার ছোরার ব্লেড, কাঠে ছিদ্র করবার ড্রিল ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছিল, এবং তারই ফলে যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ব্যাপারে পাথরের স্থান সম্পূর্ণভাবে তাম্র অধিকার করে বসলো। তাম্র মিশরে নেই, মিশরের পূর্বদিকে এশিয়ার ভূখণ্ড সিনাই থেকে তামার আমদানি করতে হত। স্পষ্টই দেখা যায় প্রাগ-ঐতিহাসিক কাল থেকেই মিশরীরা তাম্রখনির কাজে দক্ষতা অর্জন করেছিল, এবং এই ধাতু নির্মিত উপকরণাদির ব্যবহার ঐতিহাসিক যুগের সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছিল। নীল নদী ও লোহিত সাগরের মধ্যে স্থানে স্থানে যে-সব টিলা রয়েছে সেগুলি স্বর্ণ-প্রসূ, সেই পাহাড় থেকে সোনা আহরণ সম্ভব হয়েছিল। অন্যান্য কোন-কোন ধাতু ও প্রস্তরের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছিল।

মিশরের আদি সংস্কৃতির কিছু-কিছু উপাদান সুমেরদেশ থেকে আমদানি, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সুমেরের চোঙা শিল-মোহর (**cylinder seals**), গদামুণ্ড (**mace-heads**) এবং খাঁজ-করা দেয়ালের (**crenellated**

---

* গর্ডন চাইল্ড তাঁর The Most Ancient East গ্রন্থে আদিম 'নিলোটিক' মানুষ সম্বন্ধে বলেছেন: নীল নদীর ঊর্ধ্বভাগে এখনও সিললুক (Shilluk) ও ডিনকা (Dinka) নামে আদিম জাতীয় মানুষ বাস করে, তাদের চেহারা করোটি দৈর্ঘ্য ভাষা ও পোশাক অনেকটা মিশরের প্রাচীন অধিবাসীদের অনুরূপ। তারা প্রাগ-বংশীদের মতই বিভিন্ন 'টোটেমিক' সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বৃদ্ধ অকর্মণ্য দলপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বলি দেবার প্রাগ-বংশীয় প্রথা কিছুদিন আগেও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্পষ্টই দেখা যায়, রাজ-বংশ প্রতিষ্ঠার পর মিশরে যে অপরূপ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তার অগ্রগতি সুদূর দক্ষিণে নীল নদীর উৎপত্তি স্থানের কাছাকাছি অঞ্চলে এই সব জাতির বাসভূমি পর্যন্ত পৌঁছোয় নি।

walls) সঙ্গে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে মিশরের অনুরূপ জিনিসের। পাথরের স্থানে ইঁটের ব্যবহার হয়েছে মিশরে সুমেরের অনুকরণে, আর দুই দেশের সেচন প্রণালীও একই ধরনের। নীল নদীর কাছাকাছি কোন স্থানে হাতীর দাঁতের একটি ছুরির হাতল পাওয়া গেছে, তার ওপর উৎকীর্ণ একটি মূর্তির পরণে এমন পোশাক দেখা যায় যে-রকমের পোশাক মিশরবাসী পরিধান করে না, কিন্তু ঐ পোশাকটির অনুরূপ পরিচ্ছদ পরিহিত ব্যক্তির মূর্তি সুমেরদেশের এরেক (Erech) নগরে একটি প্রস্তরস্তম্ভে খোদাই করা রয়েছে। সভ্যতার আদি যুগে পূর্বদেশীয় সেমেটিক জাতিসমূহের সঙ্গে মিশরের ঘনিষ্ট সংযোগ ঘটেছিল, প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় অনেক সেমেটিক শব্দের প্রচলনই তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে এশিয়া থেকে মিশরদেশে সেমেটিক জাতির আক্রমণ ঘটেছিল, সেই অ-মিশরী জাতিগুলির সঙ্গে মিশরবাসীর যোগাযোগের ফলে মিশরীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল, এমনি একটি মতবাদ পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ছিল। সেমেটিক আগন্তুকরাই না কি মিশরীদের ধাতুর ব্যবহার শিখিয়েছিল, হায়রোগ্লাইফিক অর্থাৎ চিত্র-লিখনের প্রবর্তনও না কি তারাই করেছিল। এই মতবাদ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। একদল বলেন যে মিশরে প্রাগ-ঐতিহাসিক সংস্কৃতির পূর্ণ-ছেদের পর একটি নূতন সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছিল রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে বোধ করি এই কথা বলাই যথেষ্ট, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে ডক্টর রাইসনার (Dr. Reisner) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে মিশরে প্রস্তরযুগ ও ধাতুযুগের মধ্যে কোন ছেদ নেই, একটি আর একটিতে পরিণত হয়েছিল কোন বাইরের চাপে নয়, নিতান্তই স্বাভাবিকভাবে। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণাও তাঁর এই সিদ্ধান্তের পূর্ণ সমর্থন করে। নৃতাত্ত্বিক ডক্টর ইলিয়ট স্মিথ (Dr. Elliot Smith) প্রাগৈতিহাসিক মিশর-বাসীর মাথার খুলির সঙ্গে রাজ-বংশোত্তর কালের মিশরীদের করোটির মাপ মিলিয়ে পরীক্ষা করে কোন জাতিবৈষম্য নির্ণয় করতে পারেন নি, অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের মিশরীরা পুরুষানুক্রমে একই জাতির বংশধর, এই হল তাঁর সিদ্ধান্ত। আর যদি তা-ই হয়, তা হলে বাইরে থেকে কোন আক্রমণ ঘটে নি প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে, এবং সুমেরীয় বা সেমেটিক সংস্কৃতির যে-সব নিদর্শন পাওয়া যায় সেকালের মিশরে, সেগুলিকে ব্যবসাক্ষেত্রে

আদান প্রদানের ফল বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। এই যুক্তির সমর্থনে মিশর ও ইরাকের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলা যায় যে সুমের দেশ হানাদার যাযাবর জাতিগুলিকে নিরন্তর প্রলুব্ধ করেছে, এবং সেজন্যে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকার প্রভুত্ব নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ চিরদিন চলে এসেছিল। (পক্ষান্তরে প্রাচীন ঐতিহাসিক কালের মধ্যে মিশরে সর্ব প্রথম বৈদেশিক এশিয়াবাসীর আক্রমণ দেখা যায় খৃঃ পূঃ ১৮০০ অব্দে, দেশটিকে যখন হিকসোসরা (Hyksos) অধিকার করেছিল। মিশরে সুদীর্ঘ কাল ধরে শান্তি উপভোগের একটি ভৌগোলিক কারণ, যাযাবরদের বাসভূমির দূরত্ব)

প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে সুমেরের মত মিশরে কোন নগর-রাজ্য ছিল না, সেখানে ছিল নদীতীরবর্তী অসংখ্য গ্রামের সারি। প্রত্যেকটি গ্রামের অধিবাসীরা সম্ভবত ছিল একই গোষ্ঠীর মানুষ, তাদের বংশের আদি 'টোটেম' জন্তু বা বস্তুও ছিল একই। নিচু কাঁচা ইঁটের ঘর বর্তমান মিশরে যেমন দেখা যায়, তেমনি মাটির ঘরের সমষ্টিরূপে আমরা সে-কালের একটি গ্রামের চিত্র কল্পনা করতে পারি। ছয়-সাত হাজার বছর আগের কথা, তখন ওখানকার প্রত্যেকটি গ্রামে থাকতো একজন মোড়ল বা মুরুব্বি। সেচ জলসরবরাহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করতো সে, তার বিনিময়ে উৎপন্ন শস্যের ভাগ গ্রহণ করতো। এই ব্যবস্থার নামই পরে হয়েছিল 'কর' বা 'ট্যাক্স'। রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে, এমন কি খৃস্ট পূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দেও যে কোন এক রকমের লিখন প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ আছে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর, এই তথ্যটির আবিষ্কারের কৃতিত্ব ব দ্বীপ অঞ্চলের জ্যোতির্বিদগণের। ৪২৪১ খৃস্ট পূর্বাব্দে উষার পূর্বক্ষণে সিরিয়াস নক্ষত্রের আবির্ভাব (heliacal rising of the Sirius) থেকে বৎসর গণনা সুরু করেছিলেন তারাই, এবং সেই গণনা ও বর্ষপঞ্জীর ব্যবহার থেকে এরূপ অনুমান সম্পূর্ণ সঙ্গত যে লিখন পদ্ধতির সঙ্গে সে-যুগের মানুষের পরিচয় ছিল। বিশেষজ্ঞদের আর একটি বিবরণ এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। তাঁরা বলেন, প্রথম রাজবংশের আবির্ভাবের সঙ্গেই যে হায়রো-গ্লাইফিক বা চিত্র-লিখন দেখা দিয়েছে এমন সম্ভব নয়, প্রথম রাজবংশের বহু পূর্বে লিখন প্রচলিত হয়েছিল, এবং সেই রাজবংশের কালের লেখার ধরন দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, এ-লেখায় লিখনের কোন নূতন প্রয়াস করা হয় নি।

প্রাগ-বংশ যুগের অবশেষগুলি প্রায় সবই দক্ষিণ অঞ্চলে পাওয়া গেছে,

উত্তরে ব-দ্বীপের পলি-মাটির নিচে চাপা পড়া নিদর্শনসমূহ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। সম্ভবত শেষোক্ত অঞ্চলের সভ্যতা ছিল অধিক প্রাচীন ও প্রগতিশীল, কিন্তু মিশরের ইতিহাস-কাহিনীর সূত্রপাত দক্ষিণখণ্ড থেকেই বলতে হয়। স্মরণাতীত কালে গ্রামসমূহের সমাহারে মিশরে দুইটি রাজ্য গঠিত হয়েছিল, একটি উর্ধ্বাংশে অপরটি নিম্নাংশে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরস্পরের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার প্রচেষ্টা নিয়ে বিরোধ চলেছিল উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত। সে-যুগের কোন লিখিত বিবরণ নেই, কিন্তু পরবর্তী কালে যে-প্রবাদ চলে এসেছে তাই থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ মিশরের দেবতা "হোরাসের অনুচরেরা" নিম্ন মিশরে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য দেবগণেরও উত্তরদিকে অভিযানের বিবরণ উর্ধ্বাংশ কর্তৃক নিম্নাংশ বিজয়ের সাক্ষ্য দেয়। এই বিবরণ মত প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি রাষ্ট্র—যার দুইটি রাজধানী, উত্তরাংশে মেমফিস (Memphis) আর দক্ষিণাংশে হায়েরাকনপলিশ (Hierakonpolis) বা বাজপক্ষী নগর (Falcon town)।

সে-যুগের হাতীর দাঁত বা স্লেট পাথরের প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতির ওপর নানারূপ কারু-চিত্র দেখা যায়, পশুপক্ষীর যুদ্ধের চিত্র। পশুপক্ষীগুলি গোষ্ঠী টোটেম, চিত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী টোটেমদের যুদ্ধ কাহিনীর, বিশেষত বাজপক্ষী যে গোষ্ঠীর টোটেম সেই গোষ্ঠীর বিজয় গৌরবের পুরাণ-কথার বর্ণনা করা হয়েছে। মেনেস (Menes) নামে বাজপক্ষী গোষ্ঠীর কোন নৃপতি মিশরে প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে সংযুক্ত করেছিলেন, এই কিম্বদন্তী প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল গ্রীকদের মধ্যে। প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন এই জনশ্রুতিকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। মেনেসের অন্য নাম মেনা (Mena) ও নারমার (Narmar)। তিনি গোষ্ঠীর আদিপুরুষ বাজপক্ষীরূপী হোরাসের প্রতিরূপ বলে পূজিত হতেন। "তিনি স্থানীয় গোষ্ঠী টোটেমদের ভক্ষণ করেছিলেন (devoured)," এই অদ্ভুত ধরনের বর্ণনায় এই কথা বলা হয়েছে যে তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীসমূহের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যে-সব গোষ্ঠীর মানুষেরা উপত্যকার জলাভূমিকে উদ্ধার করেছিল, কৃষির প্রবর্তন করেছিল, পুরুষানুক্রমে পরিশ্রম দ্বারা সে-দেশ মনুষ্যবাসের উপযোগী করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন একজন পরাক্রান্ত মহাবীর, দক্ষিণাঞ্চলের আবিডসের নিকটবর্তী থিনিস নামক নগরের অধিবাসী, দক্ষিণ-রাজ্যের সর্বশক্তি সংগ্রহ করে উত্তর-রাজ্য

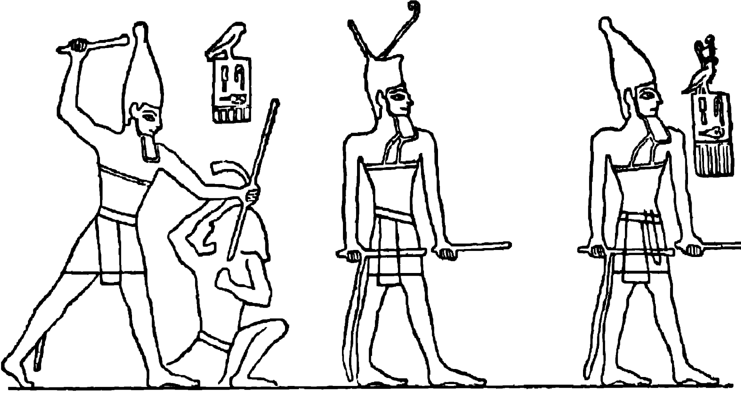
আক্রমণ করেছিলেন। এইরূপে তিনি রাজ্য দুইটি সংযুক্ত করে কেন্দ্রের শাসনাধীনে উভয় অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়ে একটি জাতি গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উভয় দেশের দেবতার প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করতেন তিনি, দক্ষিণ-রাজ্যের শ্বেত মুকুট আর উত্তর-রাজ্যের লোহিত মুকুট, এই দুটি মুকুটই তিনি মাথায় পরতেন, সেজন্য তাকে বলা হত 'ডবল প্রভু' (double lord)। মেনেসের রাজত্বকাল সুরু হয় ৩৪০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে।

মিশরে কোন নগর, নগর-প্রাকার বা রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ নেই যা থেকে আমরা সেই আদিকালের রাজবংশসমূহের এবং সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করতে পারি, কিন্তু সেই অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করছে মরুপ্রান্তের অগভীর কবরগুলি, আবিডসের রাজকীয় সমাধি-কক্ষ এবং পরবর্তী কালের পিরামিড সমাধি-গুহা ও সমাধি-মন্দির। যুগে যুগে সারিবদ্ধভাবে এই যে সমাধির শোভাযাত্রা চলেছে, সেই সমাধিগুলির উপকরণ ও গঠন পদ্ধতির মধ্যে একটি ক্রমিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যে-পরিবর্তন মিশরের বহু শতাব্দীর ইতিহাসেরই প্রতিবিম্ব। যে-সমাধি আমরা দেখেছি বালির ঢিবির তলে, ধাপে ধাপে সেই সমাধি নির্মাণের ধাঁচ উৎকৃষ্টতর হয়েছিল, আর পরলোকগত আত্মার ভোগের জন্য কবর মধ্যে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য বিলাস সামগ্রী ও তৈজসপত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেল। বাজপক্ষীবংশীয়দের বাসভূমি হায়েরাকনপলিশ নগরে একটি কবর আবিষ্কৃত হয়েছে যার অভ্যন্তর ইঁট দিয়ে বাঁধানো, দেয়ালে নানা দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত। পূর্বকার সমাধিগুলি ছিল একই প্রকার সাধারণ ঢিবি, রাজবংশ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ থেকে ধনী ও দরিদ্রের সমাধির মধ্যে প্রভেদ দেখা দিল। ধনীর সমাধি নির্মাণের উপাদান ও বিলাস উপকরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমাজে তখন শ্রেণী বৈষম্যের সূত্রপাত হয়েছিল। প্রাগ-বংশ যুগের কোন রাজার সমাধি আবিষ্কৃত হয় নি, বংশারম্ভ থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে আবিডস নামক স্থানে অনেক রাজকীয় সমাধি নির্মিত হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক কবরগুলির তুলনায় এই সব রাজকীয় সমাধির যে প্রভেদ, কুড়ে ঘরের তুলনায় রাজপ্রাসাদের প্রভেদও সেই মত। প্রত্যেকটি সমাধি একটি ছোট-খাটো প্রাসাদ, ২৬ ফুট লম্বা, ১৫ ফুট চওড়া, ১০½ ফুট উঁচু, ইঁটের তৈরি, সমাধিকক্ষের সঙ্গে রয়েছে ভাণ্ডার। জালাভরা শস্য, সুস্বাদু ফল, সুপেয় মদ্য সবই রয়েছে ভাণ্ডারে। এই অতিপ্রাচীন কালের আসবাব পত্রসমূহে নিপুণ শিল্পের পরিচয়

পাওয়া যায়। বিবিধ রকমের বিচিত্র পাথরের কারুখচিত পাত্র, মহার্ঘ ধাতুর বিলাস উপকরণ, স্বর্ণালঙ্কার এবং মূল্যবান পাথর ও প্রসাধন দ্রব্য, তাম্র ভাণ্ড, এই সব শিল্প-বস্তুর কারিগরি দক্ষতা এতই উচ্চাঙ্গের যে তা-ই থেকে মিশরের সেই অতীত বিস্মৃত যুগের সভ্যতার বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা অনায়াসে করা যায়। পাথর-বসানো স্বর্ণলঙ্কারগুলির নিপুণ সূক্ষ্ম কাজ আজকের দিনেও যে কোন শিল্প-চতুর স্বর্ণকারের গর্বের বিষয় হতে পারে। একদিকে যেমন কারিগরি শিল্পের উৎকর্ষতা দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রাক-বংশ যুগের চিত্রশিল্পীর অনিপুণ রেখাঙ্কনকে ছাপিয়ে সুদক্ষ হস্তে রূপায়িত ভাস্কর্যের আবির্ভাব হয়েছে। এই মানব ও পশুমূর্তিগুলি যেন জীবন্ত, স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিভঙ্গি, শিল্পীর আত্ম-সচেতন ভাব আদিম শিল্প-প্রকৃতিকে বহুদূরে ফেলে এসেছে। কিন্তু ভাস্কর্যের রূপায়ণে এই স্বাধীনতা তৃতীয় রাজবংশের কালেই লুপ্ত হয়েছিল, উৎকীর্ণ রেখাগুলির অপরূপত্ব সত্ত্বেও শৈলী একটি বাঁধা-ধরা পদ্ধতির খাতে গিয়ে পড়েছিল।

ইতিহাসের উষালগ্নে এক প্রকার রাজধর্ম (State Religion) অঙ্কুরিত হয়েছিল, কালক্রমে সেই ধর্ম শাখা-পল্লবিত হয়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল বটে, কিন্তু কোন সময়েই এমন কি উত্তরকালের রাজবংশীদের আমলেও এই ধর্ম সার্বজনীন হয়ে ওঠে নি। সেই কারণে মিশরে যথার্থ গণধর্মের পরিচয় আদৌ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় রাজবংশ থেকেই মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়েছে। এই সময়ের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দেবতা পরবর্তীকালে সুপরিচিত। দেবগণের মধ্যে অসিরিস (Osiris) সেট (Set) হোরাস (Horus) আনুবিস (Anubis) থং (Thoth) আর দেবীগণের মধ্যে হাথর (Hathor) ও নেইট (Neit) প্রসিদ্ধ। অসিরিস সম্ভবত ছিলেন উত্তরাঞ্চলের দেবতা, রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই দক্ষিণদেশে এসেছিলেন। প্রাগ-বংশ যুগে হোরাস ছিলেন সর্বপ্রধান দেবতা, উভয়খণ্ডের দেবতা হয়েছিলেন তিনি, পরে তার স্থান অধিকার করেন 'রে' নামক দেবতা। হায়েরাকনপলিসে হোরাসের একটি মন্দির ছিল। থিনিস-বাসী দক্ষিণদেশীয় প্রথম রাজবংশীরা "হোরাসের উপাসক" ছিলেন, নিজেদের হোরাসের বংশধর বলে দাবী করতেন। তৃতীয় রাজবংশীরা ছিলেন উত্তরাঞ্চলের মেমফিসবাসী পরিবার, তাদের রাজত্বকালে হোরাসের পূজায় অবহেলা দেখা গিয়েছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের চার শো বছর শাসনকালে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে জাতি-গঠন ও বিবৃদ্ধির উদ্যোগও প্রবল হয়ে উঠেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্য সংযুক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের পৃথক সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। উভয়-খণ্ডের অধিবাসীদের সম্পূর্ণ মিলন বা মিশ্রণ দ্বারা কিরূপে একটি জাতি গড়ে তোলা যায়, সেই ছিল সমস্যা। উত্তরদেশ বার বার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। প্রথম বংশের রাজা নারমার অববাহিকা অঞ্চলের পশ্চিমদিকে লিবিয়ানদের বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। তিনি 'এক লক্ষ বিশ হাজার' শত্রুকে বন্দী করেছিলেন এবং অগণিত পশু লুণ্ঠন করেছিলেন। হায়েরাকন-পলিসের মন্দিরে একখানা প্রস্তরফলকের ওপর তাঁর এই কীর্তিকাহিনীর চিত্র খোদিত রয়েছে। স্মৃতি-ফলকগুলি থেকে আরও কয়েকজন রাজার অভিযানের



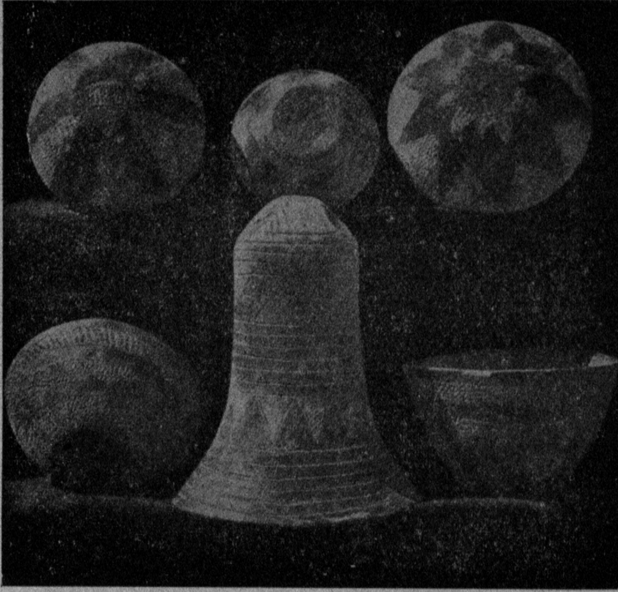
রাজা সেমেরখেটের বেদুইন নিধন—পাশে টোটেম-প্রতীক বাজপক্ষীর প্রতিকৃতি—প্রাচীনতম ভাস্কর্য—সিনাই পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ

বৃত্তান্ত জানা যায়। প্রথম বংশের রাজা উশেফাইস (Usephais) ও সেমেরখেট (Semerkhet) সিনাই উপদ্বীপের পাহাড় থেকে তাম্র সংগ্রহের জন্য অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। প্রথম প্রপাতের দক্ষিণাঞ্চলে 'ট্রোগ্লোডাইট' (Troglodyte) নামক উপজাতির উপদ্রব দূর করবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন প্রথম বংশীয় রাজা মিবিস (Miebis) এবং রাজা উশেফাইস সেই অঞ্চল থেকে প্রস্তরখণ্ড এনেছিলেন আবিডসে তাঁর সমাধিকক্ষ নির্মাণের জন্য।

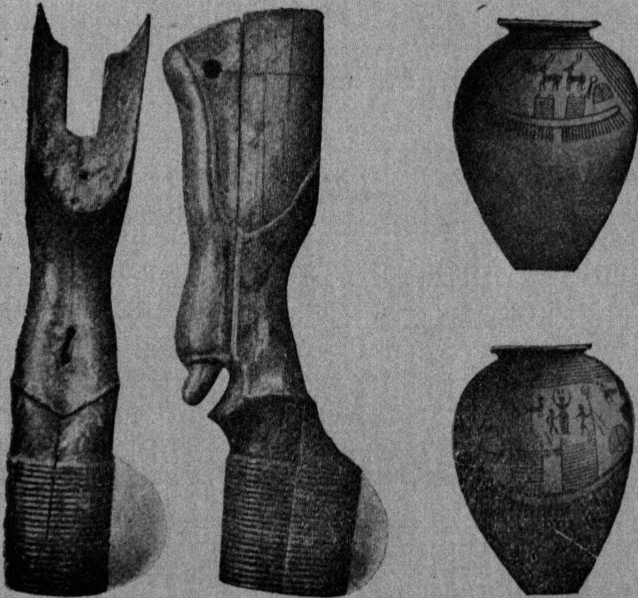
তৃতীয় বংশের রাজা খাসেখেম (Khasekhem) নিজেকে সব চেয়ে কীর্তিমান অভিযাত্রী বলে প্রচার করেছেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষিণদেশীয় দলপতি, দ্বিতীয় বংশের রাজকুমারীকে বিবাহ করে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দেশেরই রাজা হয়েছিলেন। রাজত্বের একটি বৎসরের নাম দিয়েছিলেন তিনি "সংগ্রাম ও উত্তরাঞ্চল ধ্বংস-করণের বৎসর"। এই যুদ্ধে তিনি সাতচল্লিশ হাজার দু' শো নয় জন ব্যক্তিকে বন্দী করেন। হায়েরাকনপলিসে হোরাসের মন্দিরে তার বিজয় অভিযানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেশের উভয়খণ্ডকে দ্বিতীয় বার সংযুক্ত করেছেন, এই দাবী করে তিনি নিজেকে 'দ্বিতীয় মেনেস' রূপে চালাতে চেষ্টা করেছেন। আবিডসে তাঁর একটি সুবৃহৎ সমাধি আছে। পাথরের সমাধি কক্ষ, ইতিপূর্বে এরূপ সৌধ আর কখনো নির্মাণ করা হয় নি। তৃতীয় বংশের আর একজন নৃপতি জোসার (Zoser), তার নাম উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে পিরামিডের অগ্রদূত 'থাক-কাটা পিরামিড' (Step Pyramid) এই রাজারই প্রস্তর-সমাধি।

গিজের সুপ্রসিদ্ধ পিরামিডগুলি নির্মাণ করা হয়েছিল চতুর্থ বংশের রাজত্ব-কালে। পিরামিড প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলাচনা পরে করা হবে। পিরামিড নির্মাতা চতুর্থ রাজবংশীদের কাল থেকে যে-যুগ আরম্ভ হল ইতিহাসে তার নাম দেওয়া হয়েছে "প্রাচীন রাজ্য" (Old Kingdom)। মেনেস থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ বংশের রাজত্বকাল পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ ৩৪০০-২৭০০) সকল নৃপতির নাম ও রাজত্বকাল একখণ্ড প্রস্তরফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেই প্রস্তরখণ্ডটি সিসিলির প্যালারমো শহরের মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে বলে সেটির নাম 'প্যালারমো পাথর' (Palarmo Stone)। প্রতি বছরের বিশেষ ঘটনাগুলি হায়রোগ্লাইফিক অক্ষরে লিখিত, কিন্তু প্রস্তরটির একটি ভগ্নাংশ মাত্র উদ্ধার করা হয়েছে, সেজন্য বিবরণ অসম্পূর্ণ। এখানে কাল নির্ণয়ের একটি পদ্ধতির কথা বলা প্রয়োজন। আমরা কাল স্থির করি খৃস্টাব্দ ধরে। মিশরীরা বৎসরের নামকরণ করেছে প্রথমত বছরের কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে, যেমন ভূমিকম্পের বছর, বন্যার বছর, তারপর প্রত্যেক রাজার রাজত্বের কাল ধরে বছর নির্ণয় বা গণনা করা হয়েছিল। এইরূপে ধারাবাহিকভবে রাজাদের নামের ও রাজত্বকালের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাসে মিশরে অগণিত নৃপতি রাজত্ব করেছেন।



খোদিত সাজসজ্জা সহ প্রাকবংশীয় মৃৎশিল্প



হস্তীদন্ত নির্মিত চেয়ারের পায়া
(প্রাকবংশীয়)

প্রাকবংশীয় চিত্রিত মৃৎপাত্র

প্লেট—২



প্যালারমো প্রস্তর

বংশের সংখ্যাও স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে। প্রত্যেক রাজা কোন একটি বংশের মানুষ, বংশের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা অবতংস। রাজাদের বিভিন্ন বংশের গুচ্ছ বেঁধে সেই বংশ অনুসারে ঐতিহাসিক যুগ গঠন মিশরীয় ইতিবৃত্তের একটি বিশেষত্ব। এই বংশক্রমিক কাল বিভাগের প্রবর্তন করেছিলেন একজন মিশরী ইতিহাস-প্রণেতা, তার নাম মনেথো (Manetho)। তিনি ছিলেন একজন পুরোহিত, তৃতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দে মিশরের গ্রীক রাজা টোলেমি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে গ্রীক ভাষায় ইতিহাস রচনা করেছিলেন। বর্ণনায় তিনি যে ত্রিশটি রাজবংশের অবতারণা করেছেন তাঁর সেই বংশ-বিভাগ ত্রুটিপূর্ণ ও কৃত্রিম। আর বর্ণিত বিষয়গুলি শুধু জনশ্রুতির পুনরাবৃত্তি বলে রচনাটির মূল্য সামান্যই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনেথো যে বংশপঞ্জী প্রস্তুত করেছেন, সেই তালিকাটি ইতিহাসের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

মিশরীয় ইতিহাসের বংশক্রমিক যুগ বিভাগ এইরূপ :

প্রাক-বংশ যুগ—খৃঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দের পূর্বে।

মেনেসের রাজত্বকাল—খৃঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দে আরম্ভ।

প্রাচীন রাজ্য : তৃতীয় বংশ থেকে ষষ্ঠ বংশ (পিরামিড যুগ)—খৃঃ পূঃ ২৯৮০-২৪৭৫

১৮ জন হিরাক্লিওপলিসের রাজা—খৃঃ পূঃ ২৪৪৫-২১৬০

মধ্যম রাজ্য : একাদশ ও দ্বাদশ বংশ—খৃঃ পূঃ ২১৬০-১৭৮৮

সামন্তগণের অন্তর্বিরোধ : হিকসোস রাজত্ব—খৃঃ পূঃ ১৭৮৮-১৫৮০

সাম্রাজ্য যুগ : প্রথম পর্ব—অষ্টাদশ বংশ—খৃঃ পূঃ ১৫৮০-১৩৫০

সাম্রাজ্য যুগ : দ্বিতীয় পর্ব—উনবিংশ ও বিংশ বংশ (কিয়দংশ)—খৃঃ পূঃ ১৩৫০-১১৫০

পতন দশা : বিংশ বংশ থেকে পঞ্চবিংশ বংশ—খৃঃ পূঃ ১১৫০-৬৬৩

অন্তিম শিখা : সাইটে যুগ—ষড়বিংশ বংশ—খৃঃ পূঃ ৬৬৩-৫২৫

পারসিকদের মিশর বিজয় : ইতিহাসের যবনিকা পতন—খৃঃ পূঃ ৫২৫

এই কাল-বিভাগ মোটামুটিভাবে গ্রহনীয়, অল্প পরিবর্তন অন্যত্র দেখা যায়।

২

হায়রোগ্লাইফিক বা চিত্রলেখা ঃ রোজেটা পাথর

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, প্রাগ-বংশ যুগেই লিখন আরম্ভ হয়েছিল, এবং সেই লিখনের পরিণত রূপ 'হায়রোগ্লাইফিক' দেখা দিয়েছিল প্রথম রাজবংশীদের রাজত্বকালে। চিত্রে বিষয় বস্তু প্রকাশের ধারা বিশেষের নাম হায়রোগ্রাইফিক বা বা চিত্র-লেখা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, রেলের টাইম-টেবলে কোন কোন স্টেশনের নামের সঙ্গে ছুরি-কাঁটার ছবি সেখানে পান ভোজনের জন্য রেস্তরা থাকার ইঙ্গিত করে। এই ছবিটিকে এক প্রকার 'পিকটোগ্রাফ' বলা যেতে পারে। এরূপ পিকটোগ্রাফ আমেরিকার লেক স্থপিরিয়ার অঞ্চলের পাহাড়ের গায়ে ইণ্ডিয়ানদের অঙ্কিত প্রাচীন চিত্রসমূহে দেখা যায়—যেমন একটি ছবিতে তিনটি সূর্য আঁকা হয়েছে তিনদিন বোঝাবাব জন্য, নৌকায় যাত্রীর সংখ্যা দাগ কেটে দেখানো হয়েছে, আর একটি কচ্ছপ অঙ্কিত হয়েছে যাত্রীগণের তীরে ওঠার সঙ্কেত রূপে। পিকটোগ্রাফাটির অর্থ এই : তিনদিন পর যাত্রীগণ নৌকা ছেড়ে তীরে উঠেছে। (হায়রোগ্লাইফিকের প্রথম ধাপ 'পিকটোগ্রাফ' আর দ্বিতীয় ধাপ 'আইডিওগ্রাম') কোন জটিল ভাব-বিশেষ চিত্ররূপে প্রকাশ করতে হলে প্রথম প্রয়োজন, ছবিকে কোন পূর্বনির্দিষ্ট ভাব-বিশেষের সঙ্গে যুক্ত করা. তারপর সেই ছবির অর্থ সম্বন্ধে পূর্বাহ্লে শিক্ষালাভ। সিংহের চিত্রে প্রভুত্ব বোঝাতে পারে, বোলতা রাজবংশের ও ব্যাঙাচি সংখ্যার দ্যোতক হতে পারে যদি পূর্ব থেকে প্রত্যেকটি ভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপে গেঁথে দেওয়া হয়। আবার পূর্বপরিকল্পনা মত একটি ছবির সঙ্গে অন্য একটি ছবি জুড়ে দিয়ে যুক্ত ছবিটির কোন বিশেষ অর্থ ব্যঞ্জনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উদাহরণ, মুখের চিহ্নের সঙ্গে বাষ্প ও জিহ্বার চিহ্ন যুক্ত করলে বক্তৃতা বোঝাতে পারে। ছবি বা ছবির সমাহার এরূপ কোন পূর্বনির্দিষ্ট ভাবকে যখন বোঝায় তখন সেটি হয় আইডিওগ্রাম। হায়রো-গ্লাইফিকের শেষ পর্যায় 'ফনোগ্রাম'। অনেক সময় একই শব্দ নানা অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে, তখন শব্দের দ্যোতক চিহ্নের সঙ্গে একটি 'নির্দেশক' (**determinative**) চিহ্ন যোজনা করলে বিশেষ অর্থ-বস্তুটি বোঝাতে পারে। যেমন, একই

শব্দের অর্থ যদি হয় নৌকা, স্থান, বয়ন, তা হলে নৌকার ছবির সঙ্গে পৃথিবীর ছবি জুড়ে দিলে তার অর্থ স্থান, নৌকার সঙ্গে রেশমের চিত্র অঙ্কিত করলে তার অর্থ বয়ন বোঝানো সম্ভবপর।

হায়রোগ্লাইফিকের পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল চীনদেশে, সুমের ও মিশর কিন্তু ভিন্নরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেছিল। সুমেরদেশের চাকতি-লিখন আদিকালেই চিত্ররূপ ছেড়ে শব্দরূপে (phonetic) পরিণত হয়েছিল। কাদামাটির চাকতির ওপর 'বাণ-মুখো' (wedge-shaped) লিখনের নাম 'কিউনিফরম' (cuneiform) লিখন বা কীলকাক্ষর। সুমেরদেশের এই কিউনিফরম লিখনে কোন বর্ণমালা ছিল না, আর তার প্রয়োজনও ছিল না, কেন না সেখানকার ভাষা ছিল শব্দ-সামষ্টিক (syllabic)। তার মানে, 'ক' 'র' বা 'ব' 'ন' বর্ণমালার এই শব্দগুলির প্রত্যেকটি পৃথকভাবে ব্যবহার হত না, 'কর্' 'বন্' এমনি সব শব্দ-সমষ্টি চিহ্নবিশেষ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে, মিশরে স্বরবর্ণের প্রাচুর্য থাকার জন্য ইংরেজি বর্ণমালার a b c-র মত কতগুলি ছাড়া-ছাড়া অক্ষরচিহ্ন (alphabetical signs) দেখা দিয়েছিল। সেই থেকে মিশরে বর্ণমালার সূত্রপাত হয়েছে।

মিশরে হায়রোগ্লাইফিকের প্রথম আমদানি ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকা-ভূমি থেকে, এরূপ মতবাদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই মতবাদের সমর্থকেরা বলেন, মিশরে চিত্র-লিখনের আবির্ভাবের সমসাময়িক কালে সুমেরদেশে যে চিত্রলেখা দেখা যায় তা অধিকতর উন্নত ধরনের লিখন। সে যা-ই হোক, মিশরের নিজস্ব ধারায় বর্ণমালার উদ্ভাবন অল্পকাল মধ্যে হয়েছিল। পিকটোগ্রাফ ছেড়ে লেখা যখন শব্দার্থব্যঞ্জক (phonetic) হতে সুরু করলো, প্রত্যেকটি চিত্র হয়েছিল তখন এক একটি শব্দ-সমষ্টির সঙ্কেত। এরূপ চিত্র-চিহ্নের সংখ্যা ছিল ছয় শো'রও অধিক। কিন্তু সেই চিত্রগুলি যখন শব্দ-সমষ্টি ছেড়ে অক্ষর বা বর্ণ বোঝাতে লাগলো, তখন সৃষ্টি হল বর্ণমালার, এবং সেই সঙ্গে চিহ্নগুলির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাত্র চব্বিশটি অক্ষরে গিয়ে দাঁড়ালো। এই চব্বিশটি অক্ষরের বর্ণমালায় মিশরীরা তাদের ভাষাকে ব্যক্ত করতে পারতো হয়ত, কিন্তু তারা তা করে নি। অভ্যাসবশেই যেন তারা চিহ্ন-সমষ্টির (sign-group) ব্যবহার করতো। ঠিক এমনি অভ্যাস ইংরেজি ভাষায় অক্ষর-সমষ্টির (letter-group) ব্যবহার পদ্ধতির মধ্যে দেখা যায়। আমাদের

লিখনে অনাবশ্যক অক্ষর ব্যবহারের অভ্যাস থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে।

সুমেরীয়রা লিখতো মৃৎ-চাকতির ওপর, কিন্তু মিশরীরা নূতন লিখন উপকরণ কালি কলম কাগজের আবিষ্কার করেছিল। উদ্ভিদের আঠার সঙ্গে হাঁড়ির গায়ের কালো ঝুল জল দিয়ে গুলে সেই গাঢ় তরল পদার্থকে আগুনে জ্বাল দিয়ে কালি প্রস্তুত করা হত। খাগের কলম কেটে কালিতে ডুবিয়ে কাগজের ওপর লিখতো মিশরীরা। 'প্যাপিরাস' (papyrus) নামে নলখাগড়া জাতীয় কোন জলজ উদ্ভিদকে থেঁতো করে তারা এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করতে শিখেছিল। সেই উদ্ভিদের পাতলা স্তরগুলিকে বিস্তার করে, জোড়া দিয়ে, রৌদ্রে শুকিয়ে, মসৃণ শক্ত হলদে রং-এর লম্বা এক তাড়া কাগজ তৈরি করা হত যা স্বচ্ছন্দে মুড়ে রাখা চলে। এইরূপে হয়েছিল জগতে প্রথম কাগজ প্রস্তুত। কাগজের ইংরাজি শব্দ 'পেপাব' মিশরীয় 'প্যাপিরাস' থেকেই উদ্ভূত।

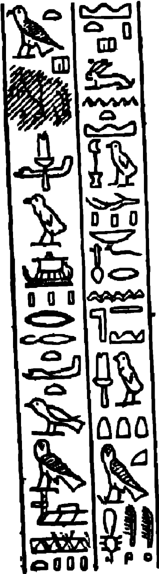
আদিম রেখা-চিত্র থেকে লিখনের উদ্ভব হতে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছিল, সে-কথা বলাই বাহুল্য। লিখন প্রবর্তনের পর লিখনপঠনের অভ্যাস প্রথমে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রেখা-চিত্র সকলেবই বোধগম্য, খোলাখুলি ভাবে বিষয়বস্তু অঙ্কিত করে। কিন্তু ব্যবসায়ীর প্রয়োজন গোপনীয়তা, পবস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের বিষয়গুলি সাধারণের কাছে গোপন রাখাই তাব স্বার্থের অনুকূল। সোজাসুজি চিত্র-লিপিব বদলে সাংকেতিক চিহ্ন প্রবর্তনের এ-ও একটি কারণ বলতে হয়। মিশরে আদিকালেব লেখার অনেকগুলিই গোপনীয় তথ্য—যেমন বৈদ্যদের ঔষধের ফরমুলা, যাদুর মন্ত্র-তন্ত্র। লেখাব প্রয়োজন হয়েছিল হিসাব নিকাশ, রাজাদের নামের তালিকা প্রভৃতি তৈরি আর পত্র ব্যবহারের জন্য। মানুষের স্মৃতিশক্তি যত প্রখরই হোক না কেন, অনেক জিনিসই তাকে ভুলে যেতে হয়, কিন্তু পূর্বস্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে পারে সে লিখন থেকে, যে-লিখন বুঝতে পারবে কেবল সে আর কয়েকজন পঠন-ক্ষম ব্যক্তি। তা ছাড়া, লিখন আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল, যেমন সুমেরদেশে তেমনি মিশরে। নিজেকে সমাজে প্রচার করবার একটি প্রবণতা আছে মানুষের মনে। সেই সঙ্গে সে চায় তার কীর্তি যেন কখনো লোপ না পায়। কীর্তির্যস্য স জীবতি —এমনি আকাঙ্খা মিশরীয় ফারাও (pharaoh) ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমাধি প্রাচীরের লিখনগুলির ছত্রে-ছত্রে পরিস্ফুট। লিখনগুলিতে আছে আত্মপ্রচার, উত্তর

কালের কাছে নিজেদের সুকৃতির বিজ্ঞাপন। এই দুর্বলতা সুমেরীয়দেরও ছিল, তবে আত্মপ্রচার কার্যে তারা কখনো মিশরীদের সমান হতে পারে নি।

কিন্তু লিখনের যে মহত্তম উদ্দেশ্য, আত্মপ্রকাশ—তার পথও সেই সঙ্গেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। লেখক চেয়েছে তার মনোভাব প্রকাশ করতে, ঐতিহ্যসূত্রে সমাজ যা পেয়েছে তার বিবরণকে স্থায়ী আকার দান করতে। এতকাল যে ঐতিহ্যের কথা মানুষ পুরুষানুক্রমে শুনে এসেছে, হয়ত বা তা চারণমুখেও প্রচারিত হয়েছে, এখন সেই মৌখিক বৃত্তান্তগুলি লিখিত আকারে দানা বেঁধে উঠেছিল। মৌখিক বর্ণনাকে বিকৃত করা চলে, মানুষ শোনে এক জিনিস বোঝে আর এক জিনিস, এবং শোনা কথার আবৃত্তি করে ভিন্নরূপ। বৃত্তান্তটি লিখিত রূপ গ্রহণ করলে আর তার নড়চড় হয় না। লিখন দ্বারা পূর্ব-পুরুষের অভিজ্ঞতা উত্তর-পুরুষের কাছে অক্ষুণ্ণভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে। ব্যক্তির অল্পকালের জীবনে শুধু নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে হলে জ্ঞান বিজ্ঞানের গভীর চর্চা সম্ভব হত না তার পক্ষে, আবার সে নানা জটিল সমস্যার সমাধানও করতে পারতো না। শিক্ষা ও জ্ঞানের পথে লিখন প্রণালীর উদ্ভব মানুষকে যতখানি এগিয়ে দিয়েছে, সে-দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে, যুদ্ধ জয় বা রাষ্ট্রগঠন জাতির কাছে যে-সমৃদ্ধি বহন করে এনেছে, লিখন বিশ্বমানবকে দান করেছে তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পদ—মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান।

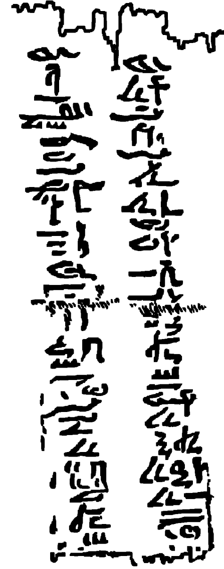
মিশরে হায়রোগ্লাইফিক অর্থাৎ লেখার চিত্ররূপ দেখা দিয়েছিল হয়ত মিশরীয় রাজ্যের সূত্রপাত থেকেই, কিন্তু মিশরীয় বর্ণমালার সাক্ষাৎ পাই আমরা সিনাই উপদ্বীপে খনির মধ্যে। খৃঃ পূঃ ২৫০০ থেকে খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের মধ্যে খনির কাজে এসে মিশরীরা সেখানে যে-সব লিখন খোদাই করে গেছে, সেগুলি বর্ণমালা (alphabetical writing)। এই বর্ণমালার প্রত্যেকটি অক্ষরই একটি ছবি, যেমন নানাবিধ পক্ষী, সর্প, মানুষের পদ, জলের ঢেউ ইত্যাদি। এ-রকম ছবি সমাধির প্রাচীরে সযত্নে আঁকা চলতে পারে—সে হল অনেকটা সাইন-বোর্ড লেখার মত। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের হিসাবের ফর্দ, চিঠিপত্র কাগজের ওপর কালি কলমে লিখতে বসে কেউ যদি সুন্দর ছবি অঙ্কনে মন দেন তাহলে তাকে অনেক পণ্ডশ্রম করতে হয়। তাই ছবির হরফগুলিকে টানা হাতে লিখবার প্রয়োজন হয়েছিল, তাড়াতাড়ি লিখে সময় বাঁচাবার জন্য। এই টানা লেখার নাম 'হায়রেটিক' (hieratic)। হায়রোগ্লাইফিক অর্থাৎ ছবির বর্ণ-

মালাকে ছাপার অক্ষর বলে মনে করলে, হায়রেটিককে সেই ছাপার অক্ষরেরই অনুরূপ টানা হাতের লেখা বলে ধরা যেতে পারে। লিখনের উদ্ভবের অনেক পরে খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দে এই 'হায়রেটিক' লিখনও একটি সংক্ষিপ্ত লিখনের (short-hand) আকার ধারণ করেছিল, সেই লেখার নাম 'ডিমোটিক' (demotic)। গ্রীক রাজাদের আমলে এই ডিমোটিক ছিল চলিত লিখন।



(বাঁ দিকে)
হায়রোগ্লাইফিক লিখন
বা চিত্রলেখা

(ডান দিকে)
হায়রেটিক লিখন
বা টানা লেখা



মিশরের তিন প্রকার লিখন—হায়রোগ্লাইফিক, হায়রেটিক ও ডিমোটিক, কালক্রমে সবগুলি লিখনের প্রচলন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। হায়রোগ্লাইফিক লিখন অন্তর্ধান করেছিল পূর্বেই, হায়রেটিকও গিয়েছিল ষষ্ঠ খৃস্ট পূর্বাব্দে পারস্য আক্রমণের পর, পরিশেষে রোমানদের সময়ে ডিমোটিক লিখনেরও অবসান ঘটলো। গ্রীক রোমান আরব তুর্কী মেমলুক সকলেই মিশরকে পদানত করেছে। মিশরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ভাষার বিলোপ এমন সম্পূর্ণভাবে ঘটেছিল যে আধুনিক কালে তার চিহ্ন মাত্র ছিল না, যদিও বিস্মৃত যুগের একটি অপরূপ জগতের ইঙ্গিত করতো স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিরাট নিদর্শনগুলি আর সেই সমাধি মন্দিরসমূহের গাত্রে বিচিত্র চিত্র-লিখন। যেখানে ভাষার নেই অস্তিত্ব আর লিখনও অপরিজ্ঞাত, সেখানে লিখনের পাঠোদ্ধার করে লুপ্ত ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত

করা সত্যই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা এখন সেই বিস্ময়কর ব্যাপার বর্ণনা করবো, কিরূপে একখণ্ড শিলালিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছিল, আর তারই ফলে যুগ-যুগান্তের ঘনান্ধকার কেটে গিয়ে প্রাচীন মিশরের ইতিহাসের বিবরণ ও সাংস্কৃতিক রূপের পরিচয় ব্যক্ত হয়ে পড়েছিল।

এই শিলালিপির নাম রোজেটা পাথর। নীল নদীর রোজেটা নামক সঙ্গম-মুখে পাওয়া গিয়েছিল বলে পাথরখানা ঐ নামে পরিচিত। কালো মুগনী (basalt) পাথর, ২ ফুট ৪½ ইঞ্চি প্রশস্ত, ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা। তিন রকমের লিখন খোদাই করা ছিল ওই পাথরটিতে, মাথায় 'হায়রোগ্লাইফিক', মাঝে 'ডিমোটিক' এবং তলায় 'গ্রীক'। খৃঃ পূঃ ১৯৫ অব্দে গ্রীক টোলেমি (Ptolemy) রাজাদের রাজত্বকালে এই প্রস্তরখণ্ডে উপরোক্ত তিন প্রকার লিখন উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। এই শিলালিপি টোলেমি বংশীয় কোন রাজার উদ্দেশে মিশরী পুরোহিতদের প্রশস্তিপত্র, রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। নৃপতি ও শাসকবৃন্দ গ্রীক, তাই গ্রীক ভাষার ব্যবহার, কিন্তু সাধারণ মিশরীর পক্ষে গ্রীক ভাষা দুর্বোধ্য, তাই মিশরীয় ভাষায় ডিমোটিক অক্ষরে শিলালিপি লিখিত হয়েছে। আর হায়রো-গ্লাইফিক ছিল তখন দেবাক্ষর, প্রশস্তিপত্র দেবাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে পুরোহিতরা তাদের শ্রদ্ধাকে পবিত্র আকার দেবার চেষ্টা করেছেন।

রোজেটা পাথর আবিষ্কৃত হয় ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন মিশর আক্রমণ করেছিলেন। আবিষ্কারক একজন ফরাসী সামরিক কর্মচারী। পাথর আবিষ্কৃত হবার পরেও তার পাঠোদ্ধার করতে দীর্ঘকাল লেগেছিল। শাঁপোলিয়ঁ (Champollion) নামে জনৈক ফরাসী মনীষী আর একখানা দোভাষী শিলালিপি থেকে 'টোলেমি' ও 'ক্লিওপেট্রা' এই দুটি পরিচিত নামের গ্রীক ও হায়েরোগ্লাইফিক অক্ষরগুলিকে মিলিয়ে বারোটি হায়রোগ্লাইফিক অক্ষর পাঠ করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রচুর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে। ১৮২২ খৃস্টাব্দে ফরাসী একাডেমি নামক বিদ্বৎসমাজকে তিনি একখানা পত্রে জানিয়েছিলেন যে উপরোক্ত নাম দুটি ছাড়া আরও কয়েকজন রাজার নাম পাঠ করা সম্ভব হয়েছে। রোজেটা পাথরের পাঠোদ্ধারের সময় এসেছিল তখনই, তৎপূর্বে নয়। অল্প যে কয়টি হায়রোগ্লাইফিক অক্ষরের পরিচয় পেয়েছিলেন শাঁপোলিয়ঁ সেই অক্ষরগুলি হল তার চাবিকাঠি, এবং তাই দিয়ে তিনি রোজেটা পাথর থেকে আরও কতগুলি অক্ষর-চিহ্নের পাঠোদ্ধার করেছিলেন, আর সেই সঙ্গে

বর্ণ-যোজনার মর্ম ও শব্দের অর্থ বুঝতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে তিনি মিশরীয় ভাষার একটি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ এবং হায়রোগ্লাইফিকের একটি অভিধান রচনা করেছিলেন। মিশরীয় ভাষা লুপ্ত হয়েছিল দেড় হাজার বছর পূর্বে, হায়রোগ্লাইফিক পঠনক্ষম শেষ ব্যক্তিটিও অন্তর্ধান করেছিল হাজার বছর পূর্বে, দেড় শো বছর পূর্বেও সেই চিত্র-লিখন জগতের কাছে ছিল প্রহেলিকাময়। সেই লুপ্ত ভাষাকে পুনরাবিষ্কার করে যে নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এই প্রাজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত, সেই বিজ্ঞান এখন 'ইজিপ্টলজি' বা মিশর-তত্ত্ব নামে সুপরিচিত। মিশরের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের জন্য মিশর-তত্ত্বের কাছে আমরা গভীরভাবে ঋণী।

৩

পিরামিড ও মামি

মিশরের সব চেয়ে প্রাচীন লিখিত বিবরণের কাল খৃঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দ—ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে সেই থেকে। ইরাকের ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকায় দেখা যায়, সুমেরীয় নগররাজ্যগুলির মধ্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ। মরু অঞ্চলের যাযাবর জাতিদের ক্রমাগত আক্রমণ সেখানকার ইতিহাসকে করে তুলেছিল বিক্ষুব্ধ চঞ্চল, চলন্ত ছবির মতই পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া চলেছিল যেন সেই উপত্যকাভূমির উদ্দাম প্রকৃতি, ঝঞ্ঝা বন্যার সঙ্গে সঙ্গত মিলিয়ে। মিশরে নেই উত্তাল তরঙ্গ, নেই ঘূর্ণীবাত্যা, নেই সুমেরদেশের এই-আছে এই-নেই ভাব। নীল নদীর বদ্ধ জলাভূমির মতই মিশরের ইতিহাস নিথর নিষ্কম্প। বাইরে থেকে কোন আক্রমণই ঘটে না এখানে, বাইরের এমন কোন চ্যালেঞ্জ দেখা দেয় না মিশরের সামনে যার প্রতিরোধের জন্য জীবনী-শক্তিকে দ্রুত সঞ্চালিত করতে হয়। স্বচ্ছন্দ অনুদ্বেল জীবন যেখানে, সেখানে মানুষ স্বভাবতই নিশ্চেষ্ট মন্থর নিরুদ্যম হয়ে পড়ে। সভ্যতার সমৃদ্ধির পরিপন্থী বলেই মনে হয় এই অবস্থাকে। অথচ এমনি অবস্থার মধ্যেই মিশর একদিন অকস্মাৎ ইতিহাসের আলোকে বেরিয়ে পড়েছিল। সেদিন যে বিরাট প্রস্তর-সৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল, তার পরিকল্পনায় বিশালত্ব, শিল্পচাতুর্য ও শৈলী এমনই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছে, যা যুগে যুগে মানুষকে করেছে বিস্ময়াবিষ্ট।

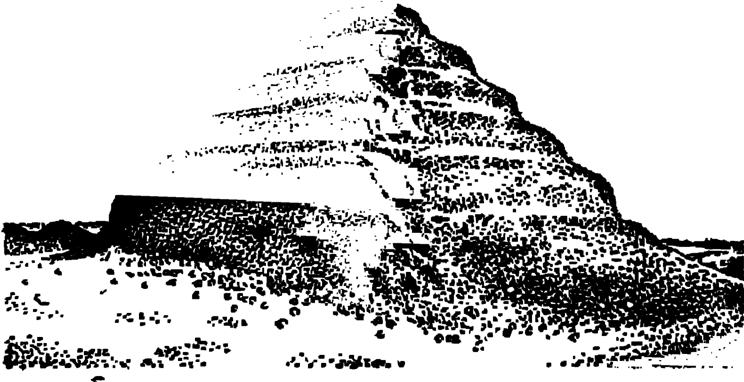
কোথা থেকে এল এই উদ্যম উৎসাহ? মরু-বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ উপত্যকাভূমির উষ্ণ ক্লান্তিকর পরিবেশের মধ্যে মিশরীরা কেমন করে অর্জন করেছিল সেই আসুরিক শক্তি যা দিয়ে বিরাট নির্মাণ কার্যগুলির অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল? স্মরণ থাকতে পারে, পূর্বে যে-কথা বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ও সংযমই মিশরীদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলেছিল। প্রকৃতি কৃপণা ছিলেন না, কিন্তু শস্যাদি জন্মাতে পরিশ্রম করতে হ'ত বিস্তর, তাই মিশরীরা কথনো পরিশ্রম বিমুখ হয় নি। কিন্তু আত্মনির্ভরের প্রবণতা মানুষের যেমনই হোক, কোন বিপুল কাজে আত্মনিয়োগ করতে হলে শুধু আত্ম-প্রত্যয়ই যথেষ্ট নয়—চাই প্রেরণা, চাই লক্ষ্য,

চাই উপায় উদ্ভাবন। সেই উপায়ের সন্ধান মিশরীরা পেয়েছিল ধাতুর আবিষ্কার আর ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা করে। পশ্চিম এশিয়ার সিনাই উপদ্বীপে ছিল তাম্র, সেখান থেকে মিশরীরা তাম্র সংগ্রহ করতো। ধাতু তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছিল—না অন্য কোন আগন্তুক ব্যবসায়ী জাতির কাছে শিক্ষা করেছিল ধাতুর ব্যবহার, সে-বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নি। যেমন করেই হোক, পাথর-কাটা ধাতু-যন্ত্রের ব্যবহার যখন অভ্যাস করতে পেরেছিল তারা তখনই তাদের মনে জেগেছিল প্রস্তর-সৌধ তৈরি করবার উচ্চাভিলাষ। নূতন অবস্থার মধ্যে মানুষের মনে প্রেরণা জাগে এমনি করেই। ধীর মন্থর গতির ছন্দ, আমাদের কাছে যা স্বাভাবিক মনে হয়, চলতি-পথের সেই ছুলকি চালকে অতিক্রম করে মন তখন উধাও হয়ে ছোটে কোন আদর্শের নাগাল ধরতে—মিশরে দেখা দিয়েছিল ঠিক তেমনি অবস্থা। হয়তো সুমেরীয় সভ্যতার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত মিশরকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু তা' হলেও স্থানীয় উদ্যম উৎসাহই যে বিরাট কর্ম-শক্তিকে জাগ্রত করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পিরামিড তৈরির মাত্র দেড় শো বছর আগেও রাজাদের সমাধিগুলি ছিল রৌদ্রে শুখানো ইঁট দিয়ে গাঁথা—ভূগর্ভে একটি কক্ষ বালু দিয়ে চাপা। অল্প সময়ের মধ্যে নির্মাণ-শিল্পের এতদূর উন্নতি হয়েছিল যে, পিরামিডের মত অতি বৃহৎ প্রস্তর-সৌধও তৈরি করতে পেরেছিল মিশরীরা। কাল অল্প হলেও, উন্নতির পথে শিল্প অগ্রসর হয়েছিল ধাপে ধাপে, তার নিদর্শন আছে। ভূগর্ভের সমাধি-কক্ষটি ইঁটের বদলে পাথর দিয়ে তৈরি হল—এইটেই প্রথম ধাপ। পরের ধাপে সমাধির উপরকার স্তূপটি গাঁথা হল প্রস্তরখণ্ড দিয়ে। পৃথিবীর সর্ব প্রথম প্রস্তর-সৌধ খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে তৈরি হয়েছিল তৃতীয় রাজবংশের রাজা জোসারের (Zoser) সমাধির উপর। স্তূপটি ২০০ ফিট উঁচু, আকৃতি মন্দির-চূড়ার মত থাক-থাক, যার জন্য এটিকে বলা হয় 'থাক-কাটা পিরামিড' (**Step Pyramid**)। এই সমাধিস্তূপের নির্মাণকর্তা রাজা জোসারের প্রধান অমাত্য ইম্‌হটেপ (**Imhotep**)। রাজ-বৈদ্যও ছিলেন তিনি, পরম জ্ঞানী পুরুষ, মৃত্যুর পর দেবতার আসন লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমানদের আয়ুর্বিদ্যার দেবতা 'এসকালাপিয়াস (Aesculapius) রূপে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর একটি ছোট ব্রঞ্জের মূর্তি রক্ষিত আছে বার্লিন মিউজিয়ামে—চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায়

একখানি প্যাপিরাস কাগজ পাঠে মগ্ন রয়েছেন তিনি। জগতের সর্বপ্রথম প্রস্তর-সৌধ নির্মাতার উচ্চ মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য।

'থাক-কাটা পিরামিডে'র পরেই এক শতাব্দীর মধ্যে (খৃঃ পূঃ ২৯০০) গিজে (Gizeh) নগরের 'অতি-বৃহৎ পিরামিড' (**The Great Pyramid**) তৈরি করেছিলেন চতুর্থ বংশীয় রাজা খুফু (**Khufu, Gk. Cheops**)। পিরামিড সমাধিসৌধ—এখানে খুফুর মৃতদেহ বা 'মামি' রাখা হয়েছিল। গিজে কায়রো থেকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত। আরও দুটি বৃহদাকার পিরামিড—রাজা খুফরু (**Khufru, Gk. Chepron**) ও রাজা মেনকরে (**Menkaure,**



সাক্কারায় রাজা জোসারের 'থাক-কাটা পিরামিড'

Gk. Myoerinus) নির্মিত পিরামিডও দেখা যায় সেখানে। খুফুর অতি-বৃহৎ পিরামিড তের একর জমির ওপর দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটি ধার ৭৫৫ ফিট লম্বা। ৪৮১ ফিট উঁচু, ২৩ লক্ষ অতি-বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে এই সৌধটিতে, প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডের ওজন আড়াই টন। ওয়ালিস বাজ বলেন, এই বিরাট সৌধের ওজন ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার টন। এই পিরামিডের আকার সকলেই জানেন। পাথরে গাঁথা সুপ্রশস্ত বৃহৎ চতুর্ভুজ, উপর দিকে ক্রমেই সরু হয়ে চার ধার একটি চূড়ায় গিয়ে মিশেছে। কষ্টসাধ্য হলেও চূড়া পর্যন্ত ওঠা যায়—২০২টি সিঁড়ি এখনও বিদ্যমান, প্রত্যেকটি ২ ফিট উঁচু। পূর্বে সিঁড়িগুলি পালিশ-করা সুন্দর সুন্দর পাথর দিয়ে সুচারুরূপে বাঁধানো ছিল। এখন সেগুলি

নেই, স্থানীয় লোকেরা বহু যুগ আগেই সরিয়ে ফেলেছে। পিরামিডের অভ্যন্তরে আছে রাজার কক্ষ (King's Chamber), রানীর কক্ষ (Queen's Chamber), একটি বৃহৎ গ্যালারী (Grand gallery)। এ-ছাড়া একটি ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ (Subterranean Chamber) আছে। সৌধের ঠিক মাঝখানে রাজার কক্ষের ছাদটিতে ৫৬টি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বসানো রয়েছে, তার প্রত্যেকটির ওজন ৫৪ টন। ভিতরে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা সুনিপুণভাবেই করা হয়েছে।

খুফুর বৃহৎ পিরামিডের চেয়ে আয়তনে ছোট খুফরুর পিরামিড, কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে দ্বারপালরূপ স্ফিন্‌কস্ (Sphinx), আর তাই থেকেই এই সমাধি-সৌধটির খ্যাতি। রাজা খুফরুরই প্রতিমূর্তি স্ফিন্‌কস্, দেহটি সিংহের। দেহ ১৮০ ফিট উঁচু, মাথা ৬৬ ফিট। পিরামিডের সঙ্গেই একটি মন্দির, সেই মন্দিরের সঙ্গে রাজধানীর সংযোগ করা হয়েছিল একটি আবৃত করিডর পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে। পিরামিড থেকে খাড়া নেমে গেছে ঝুলি-পথ স্ফিন্‌কসের পাশের উপত্যকাভূমির মন্দিরে। সেখানে রয়েছে শহর থেকে ঝুলিপথে ঢুকবার প্রস্তরনির্মিত ফটক।

প্রত্যেকটি পিরামিডের পূর্বদিকে সংলগ্ন একটি মন্দির আছে। সেখানে নানাপ্রকার খাদ্য, আচ্ছাদন, পানীয় রাখা হত, পিরামিডের মধ্যে শায়িত মৃত রাজার সাজসজ্জা পানভোজনের জন্য। পিরামিডের গায়ে একটি নকল দরজা তৈরি করে মৃত রাজার মন্দিরে বেরিয়ে আসবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পিরামিড, মন্দির ও স্ফিন্‌কসের মুখ পূর্বদিকে—সূর্যের উদয়াস্ত, গ্রহ-তারার রাশিচক্র মধ্যে সূর্যের অবস্থিতি, এই বিষয়গুলিকে লক্ষ্য করেই সকল মন্দির বিশেষ কোন দিকে—সাধারণতঃ পূর্বদিকে মুখ করে তৈরি করা হত। এই পদ্ধতির নাম 'ওরিয়েনটেশন' (Orientation)। দক্ষিণাঞ্চলের পিরামিড-গুলির 'ওরিয়েনটেশন' কিন্তু ঠিক পূর্বদিকে নয়, নীল নদী স্ফীত হয়ে উঠবার পূর্বক্ষণে সূর্য যে-স্থানটিতে উদিত হন, সেই দিকে—কোনটির বা উত্তর দিকে অথবা 'সিরিয়াস্' নক্ষত্রের দিকে মুখ করে'।

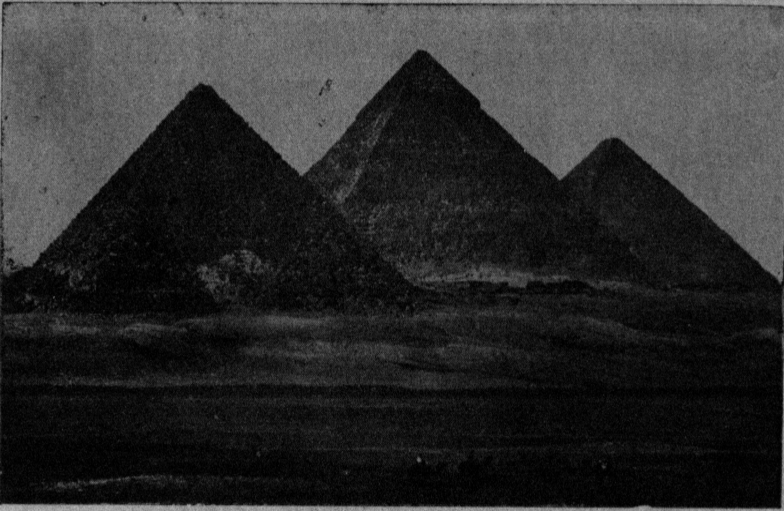
পিরামিডগুলি নদী থেকে কিছু দূরে মরুকান্তারে অবস্থিত, আর রাজধানী ছিল নীল নদীর উপরেই। পিরামিডের চারদিকে রানী ও রাজপারিষদদের সমাধি তৈরি হয়েছে, কেন না পানাহারের যেমন প্রয়োজন হয় মৃত রাজার, গৃহসজ্জার যেমন দরকার, আত্মীয় অনুগতজনের আবশ্যকও তেমনি। বহু যোজন বিস্তৃত ভূমি জুড়ে শুধু মৃতেরই সমাধি, ৬০ মাইল দীর্ঘ ভূখণ্ডে অসংখ্য পিরামিড—

প্রত্যেকটি কোন-না-কোন রাজার সমাধি। বৃহৎ পিরামিডের চূড়া থেকে আজ আমরা সমাধি-স্তূপের একটানা দৃশ্য দেখিতে পাই, যেখানে প্রাণের স্পন্দন নেই এতটুকু। সেই অতীত যুগে কিন্তু পিরামিডের অনতিদূরে বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ, প্রমোদ-কুঞ্জ, উদ্যান-বাটিকা, শান বাঁধানো নদীর ঘাট, বিলাসীর ময়ূরপঙ্খী, এ-সব সেই মৃত্যুর একঘেয়ে দৃশ্যকে ভঙ্গ করে জীবন্ত বৈচিত্র্যে ভরে তুলেছিল। সৌধ, হর্ম্য, প্রাসাদ, সবই ছিল রৌদ্রে শুকানো ইঁটে তৈরি, সেগুলির চিহ্নমাত্র নেই এখন। কিন্তু প্রস্তরীভূত কালের অক্ষয়-কীর্তি পিরামিডগুলি মৃত্যুর অমরত্বের সাক্ষ্য চিরকাল বহন করছে।

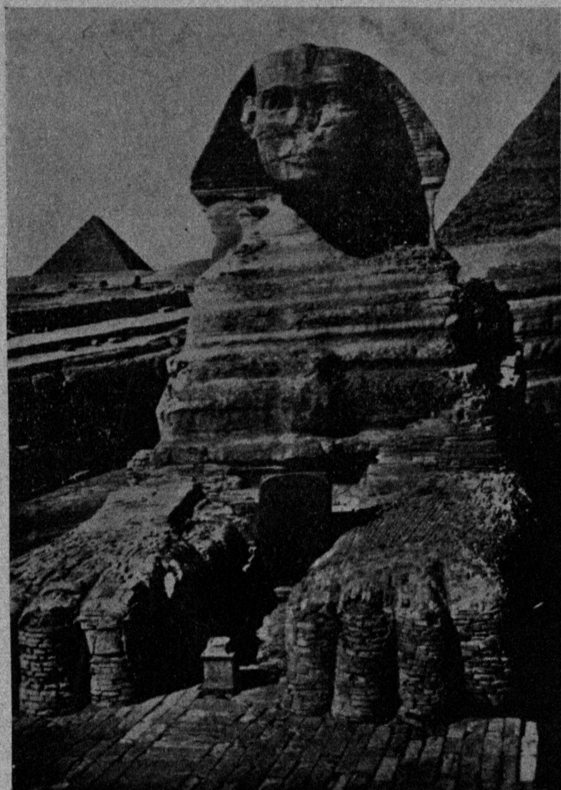
'পিরামিড' কথাটার উৎপত্তি হয়েছে মিশরীয় শব্দ 'পি-রে-মাস' (Pi-re-mus) থেকে, শব্দটির অর্থ 'উচ্চতা' (altitude)। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস একটি জনশ্রুতির উল্লেখ করে বলেছেন,—এক লক্ষ ব্যক্তি বিশ বছর ধরে পরিশ্রম করে খুফুর বৃহৎ পিরামিড নির্মাণ করেছিল। প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ডগুলি দক্ষিণ অঞ্চলের পাহাড় থেকে কেটে বের করে নৌকায় বয়ে আনা হয়েছে, তারপর খাড়া পাড়ের ওপর স্লেজের মত কোন চক্রহীন যানে চাপিয়ে মরু-প্রান্তরে ১০০ ফিট ঊর্ধ্বে টেনে তোলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার তখন শৈশব অবস্থা, প্রত্যেকটি কাজ করা হয়েছে যন্ত্রের সাহায্যে নয়, মানুষের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা। আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এই সব বিরাটাকার প্রস্তর-স্তূপ নির্মাণ পণ্ডশ্রম। যে-কাজে জনসাধারণের কোন হিতসাধন হয় নি, নিরীহ দুর্বল প্রজাদের যে-কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন 'নৃপতিরা অমরতা-লাভের ভুয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য', এমন কাজ শুধু যে নীতিবিগর্হিত তা নয়—যত বৃহৎ সেই কাজ, তত বড় তার অপকীর্তি। এমনি ধারা কথা বলেই হিরোডোটাস খুফুকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, মন্দিরগুলিকে বন্ধ করে প্রজাদের তিনি নিজের কাজে লাগিয়েছিলেন সেইজন্য। কিন্তু এই নির্মাণ ব্যাপারের একটা অন্যদিকও আছে। প্রাচীনকালকে প্রচলিত মানদণ্ডে ওজন করা একটি মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতি। ভাবতে হবে, সে-কালের চিন্তাধারা, বিশ্বাসের কথা—দেখতে হবে, সভ্যতার আদিযুগে বিরাট পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার এই যে অফুরন্ত শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, সে শক্তি কি মানব প্রগতির পথ মুক্ত করে দেয় নি? এই প্রসঙ্গে ব্রেস্টেডের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"The Great Pyramid of Gizeh is a document

in the history of human mind. It clearly discloses man's sense of sovereign power in his triumph over material forces."—অর্থাৎ, গিজের বৃহৎ পিরামিড মানব-চিত্তের ইতিহাসের সূচি, বস্তুশক্তির ওপর আধিপত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী। যুগে যুগে সভ্যতা চলেছে প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ব করে। ফারাওর মৃত্যুঞ্জয়ী হবার বাসনা আর যা-ই করুক, মানব-মনের বিরাট কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে অশেষ কর্মশক্তির প্রেরণা যুগিয়েছিল, যার জন্য বস্তু-শক্তিকে আয়ত্ব করতে সমর্থ হয়েছিল মানুষ। এ-কথা সত্য যে, এই সুমহান কর্মশক্তিকে সমগ্র সমাজের হিতকল্পে প্রয়োগ করলে দেশের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হত। এ-ও ঠিক যে, শক্তি ও সম্পদের অযথা অপব্যয়ের ফলেই পিরামিড নির্মাণ কালের 'প্রাচীন রাজ্যে'র পতন ঘটেছিল। কিন্তু কোন কাজের কোন ফল তা বোঝা যায় অভিজ্ঞতা, পরিণত বুদ্ধির বিবেচনা থেকে, যে-অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি সভ্যতার প্রত্যুষে মানব-জাতি সবেমাত্র অর্জন করতে আরম্ভ করেছিল। এ-ক্ষেত্রে মানবের অন্তর্নিহিত কর্ম-শক্তির যে-উৎসমুখটিকে মুক্ত করে দিয়েছিল মিশর সেই দিকে চাইলে বোঝা যায়, বিশ্বমানবের দৃষ্টি চিরদিন কেন আকৃষ্ট হয়েছে পিরামিডের দিকে, আর আরবদের মধ্যেই বা কেন এই কথাটির চলন হয়েছিল—জগত কালকে ভয় করে, কিন্তু কাল ভয় করে পিরামিডকে!

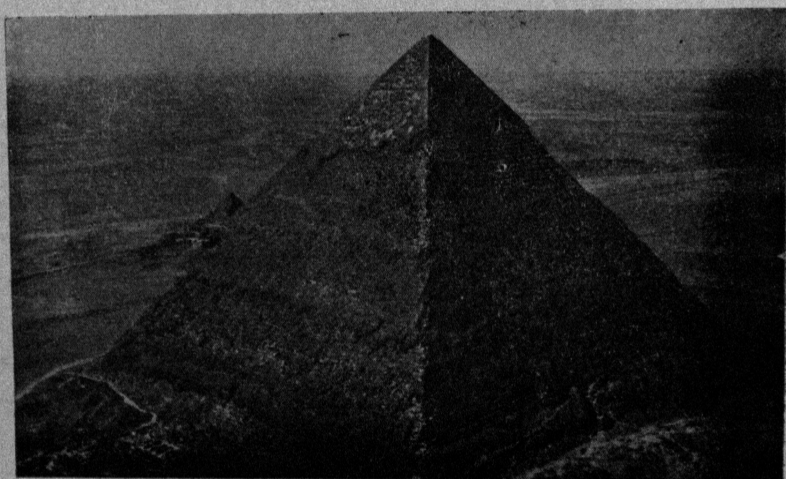
খুফুর উত্তরাধিকারী খুফ্রু, তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে কতকটা অপরোক্ষই বলা চলে, যে-হেতু তার একটি সুন্দর প্রতিমূর্তি কায়রো মিউজিয়ামে রাখা আছে। মাথার উপর রাজকীয় শক্তির প্রতীক বাজপক্ষী পক্ষপুট দিয়ে রক্ষা করছে তাকে। তেজস্বী মুখাকৃতি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি চক্ষু, বলদৃপ্ত উন্নত নাসিকা, মূর্তিটি যে রাজার সে বিষয়ে ভুল হবার জো নেই। ছাপ্পান্ন বছর রাজত্ব করেছিলেন খুফ্রু। স্ফিনক্সের শিরোভাগ তারই প্রতিকৃতি—একটি পাহাড়ের আস্ত পাথর খোদাই করে তৈরি। স্ফিনক্সের পাশেই যে পাথরের মন্দির তার মধ্যে স্থাপত্য পদ্ধতিই প্রধান লক্ষ্যের বস্তু। বৃহৎ চৌকা স্তম্ভ প্রকাণ্ড হলঘরের ছাদটিকে ধারণ করছে, তেরছাভাবে-কাটা জানালা (**clerestory windows**) দিয়ে সূর্যের বাঁকা রশ্মিগুলি প্রবেশ করে। স্তম্ভ নির্মাণের দৃষ্টান্ত জগতে এই প্রথম, পাথরের তৈরি এত বড় হলঘরও পূর্বে কখনো তৈরি হয় নি।



গিজের পিরামিডগুলি



গিজের বিরাট স্ফিংক্স



খুফুর বিরাট পিরামিড

পূর্বে বলা হয়েছে, পিরামিড নির্মাণের বিপুল পরিশ্রমের মূলে রয়েছে, সে-যুগের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা। কি সেই বিশ্বাস, চিন্তাধারাই বা কি, তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে না করেও বলা যায় যে, প্রস্তরযুগের মানুষের মত প্রাচীন মিশরীরা বিশ্বাস করেছে, পরকাল ইহকালেরই সম্প্রসারণ, আহার বিহার নিদ্রা জাগরণ এখানে যেমন সেখানেও তেমনি। কায়া ছাড়াও মানুষের আর একটি রূপ আছে, সেটি ছায়ারূপ—মিশরীরা তাকে বলতো 'কা' (Ka)। কায়াকেই আশ্রয় করে থাকে এই ছায়ারূপ। মৃত্যুর পর শরীরকে যদি ধ্বংসের অর্থাৎ পচাগলার হাত থেকে বাঁচানো যায়, তা হলে ছায়ারূপী 'কা'রও অমরত্ব লাভ সহজ হয়ে আসে। রাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃতদেহকে 'মামি' করে রাখা হত সেই জন্য পিরামিড তৈরি করে তারই ভেতর। ইমারত যত উঁচু, বড় ও পোক্ত, তার স্থিতিস্থাপকতা ও স্থায়ীত্ব তত বেশী। সেই পরিমাণে ছায়ারূপী 'কা'রও অমরতা যায় বেড়ে, কেননা মামির সঙ্গে সে-ও থাকে সেই সৌধকে আশ্রয় করে। অনুচর ও ভৃত্যদের মৃত রাজাদের সঙ্গেই গোর দেওয়া হত প্রথম বংশের রাজত্বকালে এবং এই প্রথাটি দ্বিতীয় আমেনহটেপের রাজত্বকাল পর্যন্ত চলে এসেছিল, ঐতিহাসিক হল সাহেব এইরূপই মনে করেন। তিনি বলেন,

"In the time of the first dynasty courtiers and slaves seem to have been killed and buried with the kings; and the custom was at least occasionally carried out as late as the time of Amenhotep II."

কিন্তু সমাধি-প্রাচীরের গায়ে চিত্রকর এঁকেছে পত্নীর ছবি, দাসদাসীর ছবি। ভাস্করও নানা মূর্তি খোদাই করে রেখেছে। সেই ছবি ও মূর্তি দেখে মনে হয় ওগুলি বিকল্প ব্যবস্থা—অর্থাৎ পত্নী দাসদাসীকে জীবন্ত কবর না দিয়ে তাদের চিত্র ও মূর্তিগুলিকেই করা হয়েছে মৃতের সহচর। মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা পুরোহিত সেই চিত্রমূর্তির মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা (consecration) করতো, তখন তারা জীবন্ত হয়েই পরলোকে প্রভুর সেবা করতে পারতো। তা ছাড়া, প্রাচীরগাত্রের চিত্রাঙ্কন আর একটি আপদের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করতো রাজার 'কা'কে। মৃতের ভোগ দেবার জন্য সম্পত্তি উৎসর্গ করা থাকতো বটে, কিন্তু সে-কাজে গাফিলতি হতে পারে। হালচাষ করে ক্ষেতে শস্য ফলানো, দুগ্ধ দোহন প্রভৃতি নানান্ রকম চিত্র আঁকা থাকতো, যাতে করে কোন রকম খাদ্যের বা সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব না ঘটে। এই ছবিগুলি হল খাদ্যের বিকল্প। রাজা রাহটেপের (Rahotep) সমাধি-মন্দিরে পাথরে খোদাই-করা (bas-relief) একটি দৃশ্যে মৃত ব্যক্তিকে টেবিলের ওপর রক্ষিত নানাবিধ খাদ্য ভোজন করতে দেখা যায়। সত্যকার চাষবাস গৃহস্থালীর আর একটি বিকল্প ব্যবস্থা ছিল কাঠ পাথর বা মাটির মূর্তি, সেগুলিকে রাখা হত মৃতের কক্ষে, যাতে মন্ত্র দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে তাদের চাষের কাজে লাগাতে পারেন মৃত ব্যক্তি। এই সব মূর্তিকে বলা হত 'উশবটি' (Ushabti) বা 'উত্তরদাতা' (answerer)। সঙ্গে রাখা হত চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ঝুড়ি খুন্তি ইত্যাদি। কোন কোন সমাধিমন্দিরে রুটি-ওয়ালা, মদ্য প্রস্তুতকারক নৌকার মাঝি প্রভৃতিরও কাষ্ঠমূর্তি দেখা যায়।*

মিশরের 'মামি' (mummy) অনেক মিউজিয়মেই আছে। হাজার হাজার বছর ধরে এই সব মানুষের দেহ পচা-গলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে আপন আকৃতিকে পূর্বাপর সমানভাবে বজায় রাখতে পেরেছে কেমন করে, এই ভেবে অনেকেই বিস্ময় বোধ করেন। অথচ ঔষধি প্রলেপ (embalming) দ্বারা মামি তৈরি করার পদ্ধতিটি মোটামুটিভাবে বেশ সরলই বলতে হয়। প্রথমেই শরীরকে ন্যাট্রোন (Natron) মাখিয়ে আর্দ্রতা দূর করা হত। ন্যাট্রোন স্বভাবজাত রাসায়নিক পদার্থ (Carbonate of Sodium)। তারপর ক্ষয়ের বীজ নষ্ট করবার জন্য বিটুমেন দিয়ে দেহটিকে সিক্ত করা হয়েছে। বিটুমেন (Bitumen) খনিজ ধাতব বস্তু, যেমন নাপ্থা, পেট্রোলিয়াম, আসফল্ট্ প্রভৃতি। মামি তৈরি করবার প্রক্রিয়ার (Embalmers art) বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন হিরোডোটাস : প্রথমেই মাথার ঘিলু বের করে ফেলা হয় নাকের ভেতর লৌহশলাকা চালিয়ে ছিদ্র করে। তীক্ষ্ণ পাথর টুকুরো দিয়ে পেটের পার্শ্বদেশ সাবধানে কেটে অন্ত্রগুলি বের করে অভ্যন্তর তালের তাড়ি

---

*প্রাগ্-বংশীয় সমাধি গর্ভে পাওয়া গেছে সুবেশা নারীর ও মাথায় কলসী বহনকারী ভৃত্যের মৃৎ-মূর্তি। জীবন্ত পত্নী, দাসদাসীর পরিবর্তে তাদের মৃন্ময় মূর্তি প্রোথিত করা হয়েছিল। পিরামিড যুগের 'উশবটি' এই প্রাগৈতিহাসিক বিকল্প ব্যবস্থার জের মাত্র। প্রসঙ্গত রাজবংশীয় মিশরে সমাধি-প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রাবলী সম্বন্ধে গর্ডন চাইল্ডের মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন : "Such scenes were not painted merely to delight the eye of the soul but to secure to the defunct by the inherent magic virtue the actual enjoyment of such services and delights."

(palm wine) দিয়ে ধৌত করা হয়। তারপর পেটের মধ্যে নানারূপ সুগন্ধি দ্রব্য (myrrh, cassia and other perfumes) ভরে সেলাই করে দেহটিকে সত্তর দিনের জন্য ন্যাট্রোনে ডুবিয়ে রাখা হয়। সত্তর দিন পরে মৃতদেহ ধুয়ে পরিষ্কার করে আঠার প্রলেপ দিয়ে সেটিকে মোম-মাখানো কাপড়ে জড়ানো হয়। এমনি করে মামি যখন তৈরি হত, তখন সেই মামিকে একটি কাঠের কফিনে ভরে সমাধিমন্দিরে নিয়ে যেতেন মৃতের আত্মীয়েরা। মামি প্রস্তুতের এই প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য।

চতুর্থ রাজবংশের দেড় শো বছর রাজত্বকাল (২৯০০-২৭৫০ খৃঃপূঃ) মিশরের ইতিহাসকে পিরামিডের আকাশস্পর্শী গৌরব দান করেছে। সেই গৌরবের চূড়াদেশে খুফুর স্থান, তার একটু নিচে খুফক্কর। মেনকরের পিরামিড অপেক্ষা-কৃত খর্বাকৃতি, আকারে আয়তনে অপর দুটির অর্ধেক। এতকাল এই রাজবংশ যে প্রভূত শক্তি পরিচালনা করে এসেছিলেন, সেই কেন্দ্র-শক্তি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বংশটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বার আগে আরও কয়েকজন রাজা পিরামিড তৈরি করেছিলেন, সেগুলি ক্ষুদ্র অসার বালিপাথরের স্তূপ। এই বংশের পতনের কারণ বিশদভাবে কোথাও বর্ণিত না হলেও বেশ বোঝা যায়, পিরামিড নির্মাণে অযথা রক্তমোক্ষণের জন্য পাণ্ডুর দেশটির উৎপাদন-শক্তি হ্রাস পেয়েছিল, এবং তারই অনিবার্য ফল হয়েছিল রাজশক্তির অন্তর্ধান।

৪

প্রাচীন রাজ্য : পিরামিড যুগে রাজা রাষ্ট্র ও রাজধর্ম

মিশর কৃষিপ্রধান দেশ। প্রাচীনযুগে এ-দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আভাস কিছুটা পাওয়া যায় যখন আমরা দেখতে পাই যে আধুনিক মিশরে শতকরা ৩·৫ ভাগ জমি মাত্র আবাদের ও বসবাসের যোগ্য আর বাকি শতকরা ৯৬·৫ পরিমাণ ভূমি অনুর্বর মরু। নদী উপত্যকা গ্রামাঞ্চল হলেও ঘন-বসতি, জনসমষ্টির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ১২০০। শিল্পপ্রধান দেশগুলির তুলনায় মিশরে জনসংখ্যা মোটেই অল্প নয়, অবশ্য প্রাচীনকালে এখানে এত অধিক লোকের বাস না থাকবারই কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয়, মরুবেষ্টনীর মধ্যে অনুস্যূত সূত্রের মত দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ এই উপত্যকাভূমি জনাকীর্ণ ছিল। জনবহুল দেশ, বহিঃসম্পর্ক বর্জিত, মানুষের স্বভাব প্রকৃতি সেখানে অদ্ভুত কৃত্রিমতায় জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু কৃত্রিম হলেও মিশরীয় প্রকৃতি ছিল উদার ও মিশ্রণধর্মী। বিদেশ থেকে নূতন কোন বস্তুর আগমন-পথ বন্ধ করা হয় নি, বরঞ্চ নূতনকে সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু নিজেদের প্রাচীন জরাজীর্ণ চিন্তাধারাকে বর্জন করে নি মিশরীরা, নবীনকে যে-কোন প্রকারে প্রাচীনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বিদেশী বস্তু বা ভাবকে গ্রহণ আর বিদেশীর প্রতি সহনশীলতা এক জিনিস নয়। বিভিন্ন ভাবধারা বিষয়ে পরম সহিষ্ণু হলেও মিশরীদের জাতীয় অভিমান ছিল অত্যধিক, বিদেশীকে তারা কখনো ভালো চোখে দেখতে পারতো না। স্বদেশকে তারা পৃথিবী থেকে আলাদা করে রাখতো, 'মানুষ' বলতে বুঝতো কেবল তাদেরই যারা বাস করে মিশরদেশে, বাকি লোকেরা ছিল 'এশিয়াবাসী' 'সিরিয়াবাসী' বা 'আফ্রিকাবাসী'। এশিয়াবাসী সম্বন্ধে মিশরীদের বিরূপ মনোভাব, তার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এই কথা-চিত্রটিতে দিব্যি ফুটে বেরিয়েছে : "এশিয়াবাসী কোন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না, তার পা কেবল 'ঘুর-ঘুর' করে (**his feet wander**)। হোরাসের কাল থেকেই সে যুদ্ধ করছে, কিন্তু জয়ও করে না সে, বিজিতও হয় না (**he conquers not, nor is conquered**), যুদ্ধের দিন পূর্বাহ্নে ঘোষণা করে না। ছোট জায়গায় বসতবাড়ি লুঠ করে, জনাকীর্ণ শহরে যায় না। এশিয়াবাসীকে নিয়ে

ব্যস্ত হবার কারণ নেই। সে যে মাত্র এশিয়াবাসী!" মিশরের জাতীয় দুর্গতি যখন চরমে উঠেছে, রাজ্য ও সমাজ-শৃঙ্খলা যখন ধ্বংসন্মুখ, তখন এইরূপ অভিযোগ শোনা গেছে বিদেশীদের সম্বন্ধে: "বিদেশী আগন্তুকে দেশ ছেয়ে গেছে ……সব জায়গায় বিদেশীরা দেশের জন হয়ে বসেছে (**Foreigners have become people everywhere**)।" মনুষ্যত্বের মাপে নিজেদের চেয়ে বিদেশীদের ছোট করে দেখা মানুষের একটা স্বভাব-দোষ। কিন্তু আধুনিক জগতে, বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সেই ভাবটা যেমন উগ্র জাতি-বৈষম্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ জাতি বা বর্ণের প্রাধান্য রক্ষার কি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অথবা পরজাতি-বিদ্বেষ (**xenophobia**) যেমন বীভৎস রূপ ধারণ করেছে কোন কোন পাশ্চাত্য সমাজে, তেমনটি কোনদিন মিশরে দেখা দেয় নি। মিশরের বাসিন্দা—তা যে-জাতিই হোক না তারা সকলেই 'দেশের জন'। বিদেশী যদি মিশরে এসে বসবাস করে, মিশরীয় ভাষায় কথা বলে, মিশরীয় পোশাক পরিধান করে তবে সে আর বিদেশী থাকে না—মিশরী বলেই তাকে গ্রহণ করা হয়। এমনি করে এশিয়াবাসী, লিবিয়ান এমন কি কৃষ্ণকায় নিগ্রো পর্যন্ত মিশরবাসী হতে পারতো। বিদেশের প্রতি এই যে অবজ্ঞা অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতো মিশরীরা, বিদেশ বিষয়ে তাদের অজ্ঞতাই বোধ করি তার কারণ। সুসভ্য ব্যাবিলোনিয়া অনেক দূর, মিশরের নিকটবর্তী স্থানগুলিতে থাকতো লিবিয়ান, নিউবিয়ান আর বেদুইন জাতি, যাদের সংস্কৃতি নিকৃষ্ট ধরনের। ব্যাবিলোনিয়ার মত কোন বণিক শ্রেণীর অভ্যুদয় হয় নি মিশরে, যারা বাণিজ্য উপলক্ষে দূরদেশে গিয়ে বৈদেশিক সংস্কৃতির বার্তা নিয়ে দেশে ফিরেছে। দীর্ঘকাল পরে বহু ভাগ্যবিপর্যয় অন্তে মিশর সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছিল বটে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া অঞ্চলে, কিন্তু এই দুটি দেশের সংস্পর্শে এসে মিশরের সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের গর্ব কিছুমাত্র খর্ব হয় নি। দর্পচূর্ণ হয়েছিল তার তখনই যখন আসিরিয়া পারস্য ও সর্বশেষে গ্রীস দখল করে বসেছিল মিশরকে—কিন্তু সে ত দুই সহস্র বছর পর সে-দেশের পতনকালীন অবস্থার কথা।

মিশরের জাতীয়তাবাদ যে-রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্থা গড়ে তুলেছিল পিরামিড যুগে এবং যে-সাংস্কৃতিক ধারা বয়ে চলেছিল তারপরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত, তাকে পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক বলতে হয়—অর্থাৎ রাষ্ট্র সমাজ সংস্কৃতি সব কিছু

আবর্তিত হত দেশকে পৃথিবীর আর নৃপতিকে দেশের কেন্দ্র করে। মিশরীয় ভাষায় যে-শব্দটি 'পৃথিবী' অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই শব্দেরই অর্থ 'মিশরভূমি'। সকল দেশের সেরা মিশর, আর সকল মানুষের সেরা মিশরবাসী। এমন যে মিশর, তার অধিপতি যিনি তিনি মানুষ নন, দেবতা—'মহতী দেবতা হেবা' (মনু)। নৃপতির প্রকৃত নাম মুখে আনা নিষিদ্ধ, এত পবিত্র সেই নাম। 'ফারাও' শব্দটির অর্থ 'বড় গৃহ' (The Great House), তাই 'ফারাও' নামেই রাজা প্রসিদ্ধ। দেবাদিদেব রে'র পুত্র ফারাও (Son of Re), কন্যা মিশর—সূর্য-দেবতা রে কন্যা মিশরকে পুত্র ফারাওর হাতে সঁপে দিয়েছেন। মিশরের দেব-সমাজে ভ্রাতার সঙ্গে হত ভগ্নীর বিবাহ—অসিরিসের (Osiris) স্ত্রী আইসিস্ (Isis) ছিলেন অসিরিসেরই ভগ্নী। তেমনি মিশরভূমির সঙ্গে ফারাও বিবাহ বন্ধনে জড়িত। নীতির আদেশ এই যে স্বামী করবে স্ত্রীর যত্ন—কেন না স্ত্রী 'তার প্রভুর সাহায্যকারিণী ভূমি বিশেষ' ('a field advantageous to her Lord')। ভূমির ওপর রাজার আছে স্বত্ব ও কর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভূমি সম্বন্ধে দায়িত্বও আছে রাজার। এ-কথা বার বার জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, সূর্যদেবতা রে'র দেহ থেকেই রাজার উৎপত্তি—অবশ্য রাজারও পার্থিব মাতা আছে কিন্তু যে-পিতার ঔরসে তার জন্ম তিনিও একজন দেবতা। পঞ্চম রাজ-বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কথিকা আছে। সেই কথিকায় ভবিষ্যৎ রাজাদের মাতার বিষয় উল্লেখ করে এই কথাটি বলা হয়েছে: "রাজ-মাতা সাখেবু নামক স্থানের দেবাদিদেব রে'র একজন সাধারণ পুরোহিতের স্ত্রী। রে'র তিনটি পুত্রকে তিনি গর্ভে ধারণ করেন। রে তাদের সম্বন্ধে এই আদেশ দিলেন যে তারা সমগ্র দেশে নৃপতির জনহিতকর মহৎ পদ গ্রহণ করবেন।" মানবীর গর্ভে দেব-সন্তানের জন্ম মহাভারতের কুন্তী উপাখ্যানে পাওয়া যায়—প্রভেদ এই যে কুন্তী-পুত্র কর্ণ সূর্যের ঔরস জাত সন্তান হলেও মানুষ ছিলেন, আর সূর্য নন্দন ফারাও স্বয়ং একজন দেবতা। যে-দেবতা থেকে ফারাওর উৎপত্তি, মৃত্যুর পর সেই দেবতার দেহ মধ্যেই বিলীন হয়ে যান তিনি। কোন ফারাওর মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বিবরণে বলা হয়েছে: "বৎসর ৩০, প্রথম ঋতুর তৃতীয় মাস, দিবস ৯। দেবতা (ফারাও) দ্যুলোকে প্রবেশ করলেন। মিশরের অধিপতি সেহেটেপিব্রে (Sehetepibre) স্বর্গে গিয়ে সূর্যের জ্যোতির্মণ্ডলের সঙ্গে মিলিত হলেন, যাতে তার দেবদেহটি উৎপত্তির

কারণ পিতৃ-শরীরে বিলীন হয়ে যায়।” এমনি করে যে-ক্ষেত্র থেকে উৎপত্তি সেখানেই লয়ের কল্পনা করা হয়েছে।

সূর্য-নন্দন ফারাও ছিলেন রে ছাড়াও অন্য দেবতার প্রতীক। মৃত্যুর পর তিনি প্রেতরাজ্যের অধীশ্বর হয়ে থাকেন। তখন তিনি মৃত্যুর দেবতা অসিরিস (Osiris), জীবিতকালে তিনি অসিরিসপুত্র হোরাস (Horus) যার চিহ্ন বাজপক্ষী। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, উত্তর ও দক্ষিণ অংশের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার কথা—তা সত্ত্বেও উভয় অংশকেই মিলিত করেছিলেন রাজা মেনেস সংযুক্ত মিশর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। তিনি ছিলেন বাজপক্ষী গোষ্ঠীর অধিপতি—অর্থাৎ যে-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত তিনি, সেই গোষ্ঠীর ‘টোটেম’-প্রতীক ছিল বাজপক্ষী। এই গোষ্ঠীর বাসস্থান মিশরের মধ্যমাংশে ছিল, উত্তরাংশের ওপর গোষ্ঠীর আধিপত্য গোষ্ঠী-দেবতা হোরাসেরই প্রতিষ্ঠার সংপ্রসারণ। এই ঐতিহাসিক ব্যাপার থেকেই হোরাস ও ফারাওর একত্ব কল্পনার উৎপত্তি, এ-কথা ঠিক। হোরাসের পিতা অসিরিস মৃতের দেবতা হলেন কেমন করে, আর মৃত রাজাই যে অসিরিস এ-কল্পনাই বা এল কোথা থেকে, এই জিনিসটি ভাল করে বোঝা যাবে যখন আমরা ‘অসিরিস মিথ’ (Osiris myth) আলোচনা করবো।

ফারাও সূর্যদেবতা রে’র পুত্র, জীবনকালে হোরাস আর মৃত্যুর পর অসিরিস তিনি—দেবতা-ত্রয় বিভিন্ন, কিন্তু রাজা একাধারে ত্রয়ী হলেন কেমন করে এ-প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে তার জবাব পাওয়া যাবে না, কেননা সে যুগ প্রাগ্-দার্শনিক যুগ। দর্শন-চিন্তার উদয় হয় নি তখনো, আর সঙ্গতিকে দেখতে পাই আমরা দর্শন চিন্তার মধ্যেই। তবে এ-রকম একটা কিছু কল্পনা করতে বাধা নেই যে সূর্যের সঙ্গে রাজার যোগ দৈহিক, যেমন পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, আর যে-হোরাস মিশরের উভয় অংশেরই আরাধ্য দেবতা, রাজা তারই প্রতীক—সুতরাং রাজ-শাসন দেব-শাসনেরই নামান্তর। রাজার কল্পনায় আরও একটি ভাব স্থান পেয়েছে। রাজা ‘দুই ভূখণ্ডের অধিস্বামী’—মিশরের ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশ—দুই অংশের দেবতা হোরাস ও সেট (Seth) তারই দেহে অবস্থান করে একত্ব লাভ করেছেন, রাষ্ট্রদ্বয়ও মিলিত হয়েছে তারই মধ্যে, আর তিনি সেই সঙ্গমেরই প্রতীক বা চিহ্ন স্বরূপ। দুই দেশের এক রাজা কিছুকাল আগে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে দেখা গেছে, অস্ট্রিয়ার রাজাই ছিলেন হাঙ্গেরির

রাজা—মিশরেরও তেমনই দুই অংশের রাজা এক, কিন্তু মন্ত্রী কোষাধ্যক্ষ ছিল বিভিন্ন, এমন কি রাজধানীও ছিল বিভিন্ন। জাতীয় সংহতির প্রতীকরূপেই ফারাওকে মনে করা চলে, যেমন এখন ইংরেজেরা তাদের রাজাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্য কল্পনারই প্রকাশ স্বরূপে চিন্তা করেন।

স্বর্গে দেবতা, মর্তে মানুষ উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন নৃপতি, এবং সেই কারণেই রাজাকে মনুষ্য সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে হয়। এ-যুগের মন্দিরের চিত্রে দেখা যায়, রাজাই দেবতার একমাত্র পূজারী, যদিও পরবর্তীকালে পুরোহিত-তন্ত্র প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেবতার মন্ত্রে বলা হয়েছে, "হে দেব, তোমার ঐশী শক্তি একমাত্র রাজাই জানেন আর কেউ নয়।" রাজা মন্দির ও নগর নির্মাণ করেন, যুদ্ধ জয় করেন, বিধান রচনা করেন, কর সংগ্রহ করেন। চিত্রে দেখানো হয়েছে এ-সব কাজ তিনি নিজে করছেন, আসলে কিন্তু কাজগুলি করেন কর্মচারীর দল—অনেক কাজের খবরও তিনি রাখেন না। এমনটিও দেখা গেছে যে, সেনাপতি যুদ্ধে লিপ্ত সে-কথা জানতে পারেন নি রাজা যুদ্ধ শেষ হবার আগে, কিন্তু লেখকের কলম আর চিত্রশিল্পীর তুলি যুদ্ধজয়ের সবখানি কৃতিত্ব একা রাজাকেই দিয়েছে। রাজা প্রজাপালক (**herdsman of the people**), প্রজাকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। অতিপ্রাচীন কল্পনা একটি এইরূপ: "সূর্যদেবতা রাজাকে দেশের রাখাল (**shepherd**) নিযুক্ত করেছেন প্রজাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্র তিনি জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করেন।" শাসনকার্যের চিহ্ন স্বরূপ রাজার হাতে দেওয়া হয়েছে একটি রাখালের যষ্টি। দণ্ডধারী পালকের এই রূপকল্পনায় স্বভাবত মনে হয় প্রজাদের পশুর আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা নিম্ন-স্তরের জীব ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ ভাব কিন্তু কোথাও লিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় নি, তবে এ-কথা ঠিক যে ফারাওর প্রভুত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবেই মেনে নেওয়া হয়েছে। বিত্তের ওপর প্রভুর থাকে স্বত্ব, তেমনই স্বত্ব প্রজাদের ওপর ফারাওর থাকলেও সেই স্বত্বের ওপর জোর দেওয়া হয় নি কোথাও—জোর দেওয়া হয়েছে বিত্তের যত্ন ও রক্ষার ওপর। অর্থাৎ, প্রজা রাজার অনুগৃহীত জীব সেটাই বড় কথা নয়, আসল কথা,—রাজা করবে প্রজাকে যত্ন, প্রজাকে রক্ষা, প্রজার হিতসাধন। একটি কথিকায় কোন দরিদ্র কৃষকের ওপর অবিচারের প্রতিবাদ করে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, যে-সব ব্যক্তির ওপর ন্যায়শাসনের

তার অর্পিত রয়েছে তারা যে শুধু প্রজাদের পক্ষে অনিষ্টকর কার্য থেকে বিরত থাকবে তা নয়, সক্রিয়ভাবে জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান তাদের কর্তব্য। ফলকথা মিশরীয় রাজধর্মে ব্যক্তির প্রতি ন্যায়বিচার (justice) একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এই ন্যায়-বুদ্ধির মিশরীয় নাম 'মা-আট' (maāt) যা শুধু একটা নীরস রাজনীতি মাত্র নয়। ব্যক্তির প্রতি সুবিচার করতে হয় তার সত্যিকার প্রয়োজন বিবেচনা করে, চাই কি প্রয়োজনের অধিকও দিতে হয় তাকে অনেক ক্ষেত্রে। তেমনি আবার জাতির মঙ্গলের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করবার গুরু দায়িত্বও রাষ্ট্রের। অবশ্য ফারাও নিজেই ছিলেন রাষ্ট্র—রাষ্ট্র বলতে তিনি ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। তিনি যেমন দেবতার প্রতীক তেমনই আবার রাষ্ট্রেরও প্রতিভূ। দেবতার প্রতীক রূপে তিনি এনে দেন বৃষ্টি নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা, আর রাষ্ট্রের প্রতিভূরূপে পূর্তকার্য করে প্রজার জমিসেচের ব্যবস্থা করেন। ন্যায়বিচার ছাড়াও আরও কয়েকটি গুণের আধার বলে কীর্তিত হয়েছেন ফারাও কতগুলি লেখনে: "প্রভুর আদেশবাণী দূরদৃষ্টি ও ন্যায়নিষ্ঠা আছে তোমার মধ্যে (authorative utterance, perception and justice are with thee)। আদেশবাণী রয়েছে তোমার কণ্ঠে, দূরদৃষ্টি অন্তরে আর ন্যায়বিচার জিহ্বাগ্রে।" ন্যায় ও সত্যের প্রতীকরূপী একটি হায়রোগ্লাইফিক অক্ষর অঙ্কিত করে প্রতিদিন ফারাও ঋত-সত্যের দেবতা মা-আটকে অর্ঘ্যদান করতেন। কালক্রমে এই অর্ঘ্যদান প্রথা অনুষ্ঠানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যায়ের বিধানকে দৈব অনুশাসনের (divine order) প্রতিরূপ বলে মনে করে এসেছে মিশর চিরদিন। সে-কালের একজন মিশরীয় লেখক যে-নীতিকথা বলে গেছেন তার মধ্যে খৃস্টধর্মের একটি মহানীতিরই পূর্বাভাস পাই। তিনি বলেছেন, "অন্যের প্রতি সেই ব্যবহার করবে যাতে সে-ও তোমার প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করে।"

রাজার নিঃসঙ্গ একক জীবন যে কুসুমাকীর্ণ ছিল না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। কারু সঙ্গে তার মেলামেশা চলতো না। রাজবংশের বাইরে সাধারণ রক্তমাংসের মানব-দুহিতাকে বিবাহ করলে দেবত্বের মর্যাদা নষ্ট হয়, তাই সগোত্রে নিষিদ্ধ পর্যায়ে এমন কি ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে বিবাহের চলন ছিল। সাম্রাজ্যকালে দেখতে পাই, দ্বিতীয় রামেসিস (Rameses II) তাঁর কতিপয় কন্যাকেও বিবাহ করেছিলেন, কৃতী সন্তান উৎপাদনের জন্য। মানবিক

কোমল বৃত্তিগুলিকে বিসর্জন দিয়েই রাজাকে দেবতার মহিমামঞ্চে আরোহণ করতে হয়েছে। একজন বৃদ্ধ রাজা যুবরাজকে উপদেশ দিয়েছেন: "তোমার হৃদয়ে যেন কোন ভাই বন্ধু বা অন্তরঙ্গ সুহৃদ স্থান না পায়। আমি দরিদ্রকে অন্ন দিয়েছি, মাতৃহীনকে সাহায্য করেছি। কিন্তু যারাই আমার অন্ন ভক্ষণ করেছে, আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে তারাই।" মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই রাজার, তিনি যেন মনুষ্যজাতীয়ই নন, এই শিক্ষা তাঁকে দেওয়া হত।

ডিওডোরাস (Diodorus) নামক জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিক ফারাওর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার যে চিত্রটি এঁকেছেন তাতে দেখা যায় যে, আনুষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থার দাস ছিলেন তিনি, ইচ্ছা অভিরুচি মত কোন কাজই তার করা চলতো না। "দিবারাত্রের প্রতিটি দণ্ড নির্দিষ্ট কর্মের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল, সেই সময়টিতে রাজাকে সেই কাজ করতেই হত।" রাজার ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর এই যে হস্তক্ষেপ তা শুধু প্রজাশাসন ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্নান ভ্রমণ, আহার বিহার এমন কি স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপও করতে হত তাঁকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম মত, যে-নিয়মের কোন নড-চড় সম্ভব ছিল না। নিয়মের শৃঙ্খলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা নৃপতি, স্বভাবত আমাদের মনে হতে পারে, তিনি ছিলেন একজন অসুখী জীব। এ-কথা কিন্তু ঠিক নয়। ডিওডোরাস বলেছেন, ফারাওরা সত্যই সুখী ছিলেন, কেননা তাঁরা বিশ্বাস করতেন, প্রবৃত্তির তাড়নায় ইচ্ছা অভিরুচি মত কাজ করতে গেলে মানুষ ভ্রমে পতিত হয়, কিন্তু সে যদি নিয়মানুগ হয়ে বিধান অনুসারে কর্তব্য পালন করে, তবে কুকার্য করবার দায়িত্ব থেকে রক্ষা পায়। ডিওডোরাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ-কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে, মিশরের ইতিহাস তিন সহস্র বৎসরের সুদীর্ঘ কাহিনী, এবং যে-সব ফারাওর বিষয় তিনি বলেছেন তারা পরবর্তী কালের মানুষ। পিরামিড যুগের ফারাওদের কথা স্বতন্ত্র। কি নির্মাণকার্যের বিরাটত্ব, কি শিল্পশৈলী, এই সব ব্যাপারে যে আত্মনির্ভর-শীলতার পরিচয় দিয়েছে সে-যুগের মিশর, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আইন-কানুনের কাঠামোর মধ্যেও কর্মের ও চিন্তার যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল সে-কালের ফারাওদের। পরবর্তী কালে স্বাধীন চিন্তা বিসর্জন দিয়ে 'দেবতার রচিত' বিধিসমূহ নির্বিচারে পালন করাই হয়ে উঠেছিল ক্ষয়িষ্ণু মিশরের নৃপতিদের একমাত্র কর্তব্য।

রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্যও সুনির্দিষ্ট। রাজভক্তি জাতির অন্তরে

জীবনশক্তির সঞ্চার করে, যেহেতু রাজা জীবন-শক্তির প্রাণ-স্বরূপ—মিশরীরা যাকে বলে 'কা' (Ka)। এই 'কা'-ই হলেন জীবনের ধারক ও আশ্রয়—রাজদ্রোহ জীবনের মূল 'কা'-কেই আঘাত করে। স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, "রাজার সুনামের জন্য যুদ্ধ কর, রাজার উদ্দেশে পবিত্র জীবন যাপন কর। তাহলেই সব পাপ থেকে মুক্ত হবে। রাজা যাকে স্নেহ করেন সে শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু রাজদ্রোহীর জন্য কোন সমাধি তৈরী করা হয় না, তার মৃতদেহ জলে নিক্ষিপ্ত হয়।" অপরাধের শাস্তিবিধান প্রসঙ্গে উপদেশ এইরূপ: "সাবধান, অন্যায় ভাবে শাস্তি কখনো দিও না। প্রাণদণ্ড দিও না। প্রহার ও ধরপাকড় করে সাজা দেওয়াই বিধেয়। কিন্তু এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম করতে হয় রাজদ্রোহীর বেলায়। দেবতা টের পান তার দুরভিসন্ধিমূলক বিশ্বাসঘাতকতার কথা। তখন তাকে নির্মমভাবে আঘাত করে রক্ত দিয়ে তার মনের পাপ ধুয়ে ফেলেন তিনি।"

রাজার ওপর দেবত্বের আরোপ সত্ত্বেও কার্যত তিনি যে রাজধর্মের অনুশাসন যথাযথ পালন করতে পারতেন, এরূপ সম্ভবনা আদৌ ছিল না। আমলাতন্ত্র (bureaucracy) গড়ে উঠেছিল একটি, কর্মভার ন্যস্ত ছিল আমলাদেরই ওপর। অতিপ্রাচীনকাল থেকেই উজিরের কাজ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জগতের সর্বপ্রথম প্রস্তর-সৌধ 'থাক-কাটা পিরামিডে'র নির্মাতা ইমহটেপ ছিলেন রাজার প্রধান মন্ত্রী। প্রশাসনের সর্বময় কর্তা উজির, তিনি ছিলেন একাধারে প্রধান মন্ত্রী, প্রধান বিচারক, রাজকোষের প্রধান অধ্যক্ষ। একটি সমাধি প্রাচীরের গায়ে খোদাই-করা চিত্র ও লেখন থেকে জানা যায়, উজির সকালে বেরিয়েছেন গরীব প্রজাদের আরজি নিবেদন শুনবার জন্য—লেখনের ভাষায়, "লোকেরা তাদের দাবি বিষয়ে কি কথা বলে তাই শুনবার জন্য, আর বড়-ছোটর মধ্যে কোন প্রভেদ করা না হয় তাই দেখবার জন্য।" প্রধান অমাত্য নিযুক্ত করবার সময় সাম্রাজ্যযুগের কোন ফারাওর আদেশ-বাণী লেখা রয়েছে একতাড়া প্যাপিরাস কাগজে। সম্ভবত নিয়োগকালে রাজার এরূপ আদেশ দেবার প্রথা আদিকাল থেকেই চলে এসেছে: "উজিরের কর্তব্য-কর্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখো। উজির সারা দেশের স্তম্ভ-স্বরূপ। উজিরি পদ মিঠা নয়, তিক্ত। দেখ, শুধু রাজপুরুষ প্রভৃতি অভিজাতবর্গকে খাতির আর অন্যান্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞা, এমন যেন কখনো না হয়। দেখ যেন সব কাজ

আইন মত নজির দেখে করা হয়, ন্যায় বিচার যেন সকলেই পায়। দেবতারা পক্ষপাতিত্বকে ঘৃণা করেন।"

আদিযুগে আমরা দেখতে পাই, পারিষদদের কবর দেওয়া হত রাজ-সমাধির পাশে। তারা ছিল রাজারই অনুচর, তার জীবন-মরণের সাথী। কিন্তু প্রশাসনের ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হতে লাগলো, খুদে শাসকেরা তখন ক্রমেই প্রধান হয়ে উঠেছিল, ফারাওর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতাও আর তেমন রইল না। বড় বড় রাজকর্মচারী ও ভূস্বামীরা তখন রাজাদের মতই নিজেদের পছন্দ মত স্থানে সমাধিস্তূপ প্রস্তুত করতেন। রাজকর্মচারী বা কেরানী হওয়াই মিশরীয় যুবকদের একটি সাধনার বস্তু হয়ে উঠেছিল। কর্মচারীর কাজে ছিল প্রচুর সম্মান, কায়িক পরিশ্রমের অমর্যাদা থেকে রক্ষা পেত লেখকশ্রেণীর ব্যক্তি। লেখকের উপরি পাওনা কিছু যে ছিল না, তা নয়। বিচারপ্রার্থী কোন ব্যক্তি রাজপুরুষদের হাতে নির্যাতন ভোগ করে এই তিক্ত অভিযোগ করেছেন,—"বিচারালয়ে কেরানীদের দিতে হয় সোনা রূপা, কাপড়চোপড় দিতে হয় প্রতিহারদের। চোর ডাকাত লুণ্ঠনকারীর দল এই রাজপুরুষেরা, আর তারাই নিযুক্ত হয়েছে দুর্বৃত্তকে দমন করবার জন্য—আশ্চর্য!" উৎপীড়িত, করভারপীড়িত প্রজাকুলের আর্তকণ্ঠ ফুকরে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত উচ্ছ্বাসোক্তির মধ্যে: "আবাদি জমির পরিমাণ যত কমছে, শাসকের সংখ্যা বেড়ে যায় ততই। জমি অনুর্বর কিন্তু ট্যাক্স সাংঘাতিক। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অল্প, কিন্তু রাজপুরুষেরা তাদের বৃহৎ কুনকে ভরে শস্য মেপে নিতে কসুর করেন না।"

বর্তমান কালেও এ-রকম অভিযোগ আমাদের বিশেষ পরিচিত এবং সব ক্ষেত্রে তা অতিশয়োক্তিবর্জিতও নয়। আসলে নীতিকথার প্রস্তাব যত সহজ, ন্যায়-ধর্মের আদর্শ পালন তেমনি দুঃসাধ্য। আর সব দেশের মত মিশর সম্পূর্ণভাবে ভাল বা সম্পূর্ণভাবে মন্দ কোনদিনই ছিল না। ভাল মন্দ কর্মচারী অল্পবিস্তর সকল যুগেই ছিল, কোন যুগে ছিল ভালর সংখ্যা অধিক আর কোন যুগের অবস্থা ছিল তার বিপরীত। ন্যায়বিচারের ধারণাও বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্নরূপ। তাছাড়া রাজনৈতিক বিরোধ বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষও অভিযোগের বা কুৎসার কারণ, যেমন পারিষদবর্গের তোষামোদ রাজার অযথা প্রশংসার কারণ। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, কোন সাধারণ লোকের পক্ষে শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র সমালোচনা সুদূর অতীতের ইতিহাসে অল্পই দেখা গেছে।

পিরামিড যুগের একটি প্রাচীন চিত্রে ট্যাক্স আদায় প্রণালী দেখানো হয়েছে। দুই সারি কেরানী বসে আছে, তাদের হাতে প্যাপিরাস কাগজে লেখা ট্যাক্সের তালিকা আর কলম, সামনে ডেস্ক। তিন জন গ্রাম্য আদায়কারী কর্মচারীকে পাকড়াও করে আনা হয়েছে তাদের কাছে, ট্যাক্স আদায়ে গাফিলতি করেছে বলে। ছবির শিরোনামায় লেখা আছে: কৈফিয়ত তলবের জন্য পাকড়ে আনা হয়েছে গ্রামণীদের। কার কাছে কত টাকা পাওনা তার দস্তুরমত তালিকা প্রস্তুত করা হত এবং ট্যাক্স সংগ্রহ করে রসিদ দেবারও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা



ট্যাক্স অনাদায়ের দায়ে ধৃত তিনজন আদায়কারী গ্রামমুখ্য:
দুই সারি কেরানী হিসাব লিখছেন

ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের এমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ইউরোপে কখনো দেখা যায় নি। প্রজা ট্যাক্স দিত টাকা নয়, কেননা মুদ্রার প্রচলন মিশরে কখনো ছিল না, যদিও দ্রব্যক্রয়ের জন্য পরবর্তী কালে নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণ বা তাম্র নির্মিত অঙ্গুরীয়ের ব্যবহার দেখা যায়। ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য পশু মদ্য মধু বস্ত্র প্রভৃতি বস্তু ট্যাক্সরূপে জমা দেওয়া হত। শস্য সঞ্চয়ের জন্য রাজপ্রাসাদে ছিল বড় বড় গোলাঘর, অন্যান্য জিনিস রাজভাণ্ডারে রাখা হত।

স্থানীয় প্রশাসনের জন্য মিশরের উর্ধ্বাংশ পঁচিশটি খণ্ডে বা জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল এই জেলাগুলিকে মিশরীরা বলতো 'সা-পুট' (hsaput), জেলার নাম গ্রীকরা দিয়েছিল 'নোম' (nome)। প্রত্যেক জেলায় একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী (nomarch) নিযুক্ত হতেন, তিনি ছিলেন শাসক ও বিচারক। উত্তরাংশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নি, কিন্তু ব্যবস্থা

বোধ করি একই রকম ছিল, যদিও স্থানীয় শাসকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প থাকারই সম্ভাবনা। জেলা ছিল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বিশেষ, সেখানে বিচার বিভাগ, ভূমি বিভাগ, পূর্ত বিভাগ, তোষাখানা, সৈন্য বাহিনী, ভাণ্ডার প্রভৃতি প্রশাসনের বিবিধ অঙ্গ নিয়মিতরূপে কাজ করতো। একদল কেরানী ছিল যারা হিসাব প্রস্তুত করতো, বিভাগীয় খাতাপত্র লিখতো। ফারাও ও তাঁর অমাত্যের সঙ্গে এই জেলাগুলির সংযোগ ঘটতো কেন্দ্রীয় অর্থবিভাগের মাধ্যমে। এই অর্থবিভাগের কর্তা ছিলেন 'প্রধান খাজাঞ্চি', তিনি ও তাঁর সহকারীরা জেলা-গুলি থেকে শস্য পশু পক্ষী শিল্পজাতদ্রব্য খাজনা স্বরূপে আদায় করতেন। এ-যুগের শ্রমসংগঠন ব্যাপারের জলন্ত দৃষ্টান্ত পিরামিড ও প্রস্তর মন্দিরগুলি। খনিজ ধাতু ও পাথর সংগ্রহ এবং সেই জিনিসগুলির পরিবহনের কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্য এক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ছিল। রাজধানীতে কেন্দ্রীয় ভূমি বিভাগ, ভূমি রেজিস্ট্রী বিভাগ, পূর্ত বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু জেলাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বিষয়ে সর্বাধিক প্রাধান্য ছিল অর্থ বিভাগের। জেলায় বিচারকার্য করতেন শাসকেরা, এবং প্রতি জেলায় বিচারকদের ওপর ছিলেন একজন প্রধান বিচারপতি। আইনের বিধানসমূহ বিস্তারিত ভাবে লিখিত হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস পেয়েছে। আদালতে বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার ব্যবস্থা ছিল। একটি বিবরণে দেখা যায়, রাজ-অন্তঃপুরে রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে দুই জন বিচারকের কাছে একজন রানীর বিচার হয়েছিল। অভিযুক্ত রানীর সদ্য কোতলের হুকুম না দিয়ে বিচারের মানদণ্ডে শান্তভাবে অভিযোগটিকে যাচাই করবার প্রবৃত্তি সভ্যতার উষাক্ষণের সেই ফারাওদের অসাধারণ স্থৈর্য ও বুদ্ধির পরিচায়ক।

এইরূপ রাষ্ট্রসংস্থা 'প্রাচীন রাজ্যে'র প্রথম অবস্থার বিশেষ উপযোগী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু পরে এই আমলাতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির কুফল ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। জেলাপতিরা ছিলেন কর্মচারী, কিন্তু ক্রমে তাঁরা ইজারাদার বা জমিদার হয়ে উঠেছিলেন, এবং আমাদের দেশের জমিদারের মতই কর্মচারী দিয়ে বিষয়কার্য পরিচালনা করতেন, আর নিজেরা উদ্যান-বাটিকায় আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাতেন। ফারাও যখন প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, এই সব 'নোমার্ক'গণের নিয়োগ ও বরখাস্ত তখন তিনিই করতেন,

এমন কি তাদের আত্মার সদ্‌গতিও নির্ভর করতো তাঁর সদিচ্ছার উপর, কারণ তাদের সমাধি-মন্দির নির্মাণ করবার অনুমতি দানের কর্তা ছিলেন তিনি। কিন্তু কালক্রমে ফারাওরা যখন দুর্বল হয়ে পড়লেন, কেন্দ্রশক্তির প্রয়োগ যখন কঠিন হয়ে উঠলো, তখন থেকে রাষ্ট্রসংস্থায় বিষম ফাটল ধরতে সুরু করেছিল। 'নোমার্ক'রা স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠলেন, কেন্দ্রের সঙ্গে বন্ধনও শিথিল হয়ে পড়লো। এইরূপে পিরামিডযুগে একটি সামন্ত (feudal) সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, এবং সেই সম্প্রদায় কেন্দ্রীয় দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপন শক্তিবৃদ্ধি করতে লাগলো।

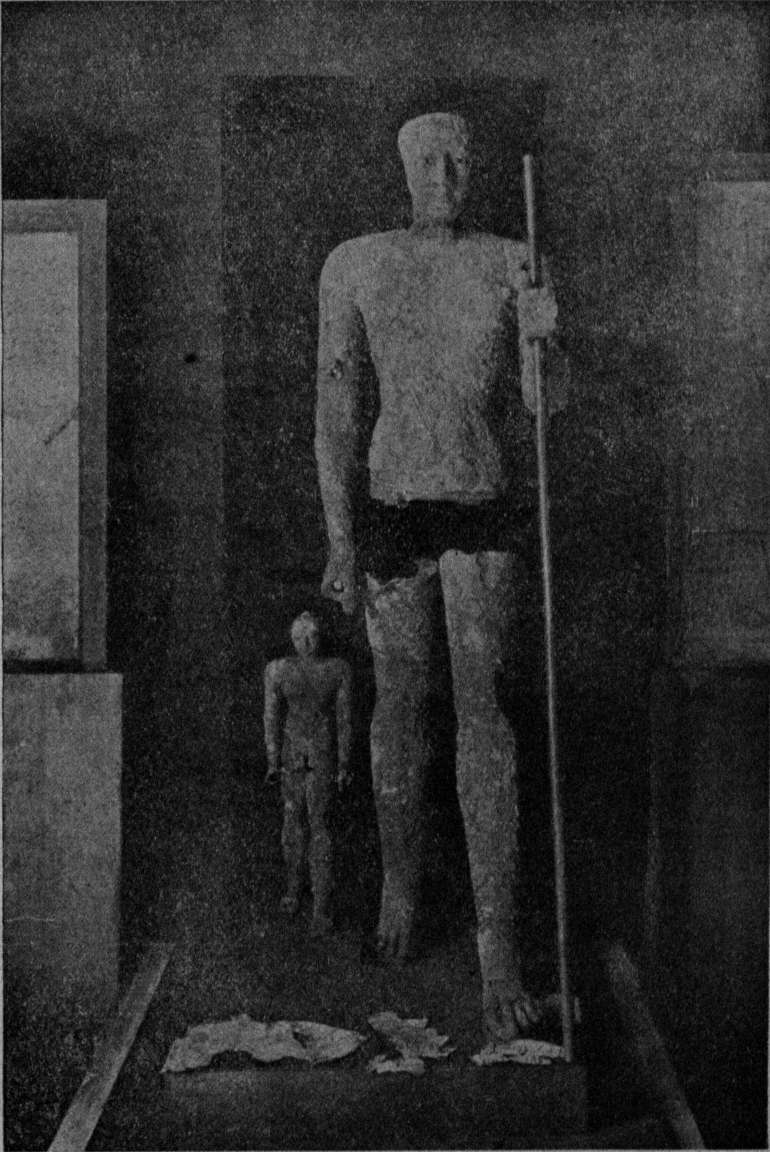
ইজারার উপস্বত্বভোগী এই প্রবল পরাক্রান্ত সামন্তরাই কালক্রমে ক্ষীণবীর্ষ ফারাওকে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করে একটি সামান্তযুগের প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু তার পূর্বে আরও দুটি রাজবংশ — পঞ্চম ও ষষ্ঠ বংশ রাজত্ব করেছিল। পঞ্চম বংশের উৎপত্তিকাহিনীর উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। সেই বিবরণে দেখা যায় ঐ বংশের প্রথম রাজার মাতা ছিলেন সূর্যদেব রে'র মন্দিরের পুরোহিত-পত্নী। বস্তুত হোলিওপলিসের পুরোহিতকুলের প্রভাবে পঞ্চম রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজা সাহুরে (Sahure)। একটি চিত্রে তাঁর প্রেরিত সমুদ্র অভিযান অঙ্কিত হয়েছে, তার বিবরণ একটু পরে দেওয়া হবে। এই অভিযানটি পাঠানো হয়েছিল ফিনিসিয়ায়। দ্বিতীয় একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন তিনি পুন্‌ট্ (Punt) অর্থাৎ লোহিত সমুদ্রতীরে সোমালিল্যাণ্ড অঞ্চলে। সেই দেশ থেকে সুগন্ধ দ্রব্য, আঠা জাতীয় পদার্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য মিশ্রিত ধাতু, মূল্যবান ইবনি কাষ্ঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করে জলপথে দেশে আনা হত। পঞ্চম বংশের শেষ রাজা উনিস (Unis)। তাঁর পিরামিড বৃহৎ না হলেও বিখ্যাত ও মূল্যবান এই কারণে যে, পিরামিড গাত্রে সে-কালের ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানগুলির বিশদ বিবরণ উৎকীর্ণ রয়েছে। এই বিবরণ-সংগ্রহের নাম 'পিরামিড টেকস্‌ট্' (Pyramid Text)। মৃতের পরলোকে সুখভোগ, অসিরিসত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে মিশরীদের যে-সব বিশ্বাস তার অধিকাংশই পঞ্চম ও ষষ্ঠ বংশের পিরামিড-গাত্রে লিখিত বিবরণ বা 'পিরামিড টেকস্‌ট্' থেকে আমরা জানতে পেরেছি।

পঞ্চম বংশ প্রতিষ্ঠার মূল যেমন পুরোহিতকুল, ষষ্ঠ বংশের আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি সামন্তকুলের প্রভাবে। এই সামন্তদের প্রভূত প্রতিপত্তি কিন্তু

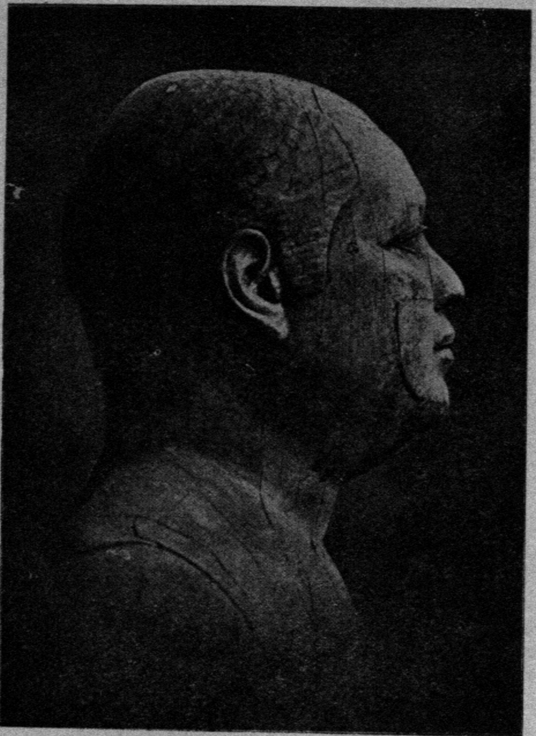
ষষ্ঠ রাজ-বংশী প্রথম পেপি'র (Pepi I) অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও উদ্যমকে দমন করতে পারে নি। মিশরের সর্বত্র তাঁর কীর্তির নিশানরূপে ছড়িয়ে রয়েছে বৃহৎ ক্ষুদ্র বিবিধ প্রস্তরনির্মিত ধর্ম-মন্দির। যোগ্যতার মর্যাদা বুঝে উপযুক্ত গুণী কর্মীদের রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছেন তিনি প্রশাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্য। দক্ষিণে নিউবিয়া অঞ্চলে নিগ্রোদের বিরুদ্ধে, উত্তরে প্যালেস্টাইন উপকূলে বেদুইনদের বিরুদ্ধে, এমনি আরও কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করে উপজাতিগণের উপদ্রবের শাস্তি করেছিলেন। প্রাচীনযুগের মিশরীরা ছিল একান্ত শান্তিপ্রিয় জাতি, কোন ফারাও ইতিপূর্বে তাঁর মত সামরিক মনোবৃত্তি প্রদর্শন করেন নি। ১৮৯৬ সালে হায়রোকনপলিসের ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রথম পেপি ও তাঁর পুত্রের প্রকাণ্ড তাম্রমূর্তি উদ্ধার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক কুইবেল। রাজার মূর্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে দীর্ঘাকৃতি, শিশুপুত্রটি দুই ফুট লম্বা। মুখের চেহারা অশ্চর্য রকম স্বাভাবিক, চোখ দুটি যেন জীবন্ত।

শক্তিমান রাজা প্রথম পেপির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মেরনেরে (Mernere) পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সচেষ্ট হলেন বটে, কিন্তু তাঁর রাজত্বের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র চার বৎসর। এই অল্পকালের মধ্যে তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করেছিলেন। পিতার মত তিনিও উপজাতিগণের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং প্রথম প্রপাতের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে প্রধানগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করেছিলেন। নিউবিয়ার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য প্রপাতের বাধা কাটিয়ে পাঁচটি খাল খনন করেছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য পরিকল্পনা মত কাজগুলি অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে নি।

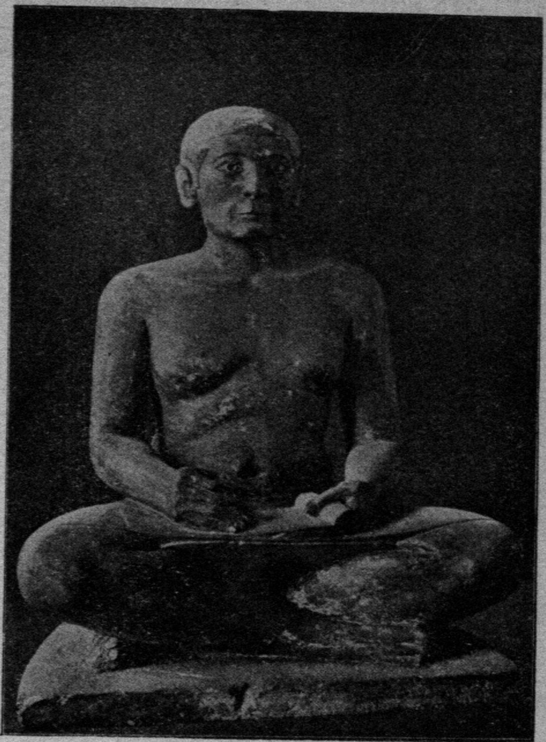
মেরনেরের বৈমাত্র ভ্রাতা দ্বিতীয় পেপি (Pepi II) যখন রাজসিংহাসনে আরোহণ করলেন তিনি তখন ছয় বছরের বালক, তাঁর মাতুল হয়েছিলেন অভিভাবক। দক্ষিণাঞ্চলের অভিযান পূর্ববৎ চলতে লাগলো, এবং সেখান থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে নূতন আমদানি হয়েছিল একপ্রকার বামন-জাতীয় মানুষ। নাচ দেখিয়ে রাজার চিত্ত-বিনোদন করা ছিল তাদের কাজ। এদিকে সামন্তরা তখন স্ব স্ব প্রধান হয়ে পড়েছিল, অতিমাত্র স্বার্থবোধ তাদের আত্ম-কেন্দ্রিক করে তুলেছিল। তার ওপর তারা থাকতো আত্ম-কলহে মগ্ন, ফারাওর দুর্বল শক্তি তাদের সংযত করে রাখতে পারে নি। ফলে পেপির মৃত্যুর এক বছর পরেই 'প্রাচীন রাজ্য' তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়লো।



সম্রাট প্রথম পেপির পুত্র সহ পূর্ণাবয়ব তাম্র মূর্তি
কায়রো মিউজিয়াম



সেখ্-এল-বেলেদের একটি দারুমূর্তির মস্তক
কায়রো মিউজিয়াম



প্রাচীন রাজ্যের একজন লিপিকারের মূর্তি (চুনা প্রস্তরের)
লুভার মিউজিয়াম

মিশরের ইতিহাসকে বর্বরতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল পথে প্রথম চালিয়ে এনেছিল যে 'প্রাচীন রাজ্য', সেই রাজ্যের শেষ রাজা রূপে অকৃতার্থতার দুরপনেয় কলঙ্ক দ্বিতীয় পেপিকে মাথায় বহন করতে হয় বটে, কিন্তু অন্য একটি বিষয়ে তাঁর অসাধারণত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ৯৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন, এত দীর্ঘকাল জগতের কোন নৃপতি রাজ্যশাসন করেন নি।

৫

পিরামিড যুগের সমাজ ও শিল্প

আমরা দেখেছি আদিকাল থেকেই মৃত ব্যক্তির সমাধিগর্ভে তার নিত্য ব্যবহার্য জিনিস-পত্র পান ভোজনের সামগ্রী রাখা হত, পরলোকেও যেন সেই ব্যক্তি ইহলোকের মত স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে। পরলোক যে ইহলোকেরই সম্প্রসারণ, এ-বিশ্বাস মানুষ সভ্য হবার পরও বর্জন করে নি। অসভ্য মানুষের হাঁড়ি কুঁড়ি প্রস্তরাস্ত্র অস্থিখণ্ডের পরিবর্তে সভ্য মানব সমাধিমধ্যে রেখেছে সোনারূপার পাত্র, রত্নালঙ্কার, ধাতুনির্মিত প্রহরণ, নানাবিধ তৈজস-পত্র। সুমেরীয়রা মৃত রাজারানীর সঙ্গে দাস-দাসীকেও জীবন্ত কবর দিয়েছে পরলোকে পরিচর্যার জন্য। এরূপ কোন নৃশংস প্রথা প্রাগৈতিহাসিক কালে মিশরেও হয়ত প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরে একটি বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছিল। ব্যবস্থাটি এই, অনুচরগণকে জীবন্ত সমাধি না দিয়ে 'মামি'র কক্ষে প্রাচীরগাত্রে তাদের ছবি এঁকে রাখা হত। সেই সঙ্গে রাজার জীবন বৃত্তান্তও সুনিপুণ ভাবে সারি সারি রঙিন চিত্রে ফলাও করে আঁকা হয়েছে। হায়রোগ্লাইফিক অক্ষরে শিরোনামাও দেওয়া হয়েছে অনেক স্থলে। পিরামিডযুগের সমাজ ও শিল্পের কথা আমরা জানতে পারি প্রধানত প্রাচীরচিত্র (fresco-painting), হায়রোগ্লাইফিকসে লিখিত বিবরণ, শিল্পবস্তু ও স্থাপত্যের নিদর্শন থেকে। সে-কালের শিল্পজাত নানা দ্রব্য দেখা যায়,— যেমন পাথর বাটি, অলঙ্কার, মাটির ভাণ্ড, কাঁচের জিনিস, বস্ত্র ইত্যাদি। এ-সব জিনিস কিরূপে প্রস্তুত করা হত ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে। কারিগরি শিল্পের অবস্থা এই চিত্রগুলি থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। এখানে কয়েকটি চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হল :

(১) সমুদ্রগামী জাহাজের সর্বপ্রথম প্রতিকৃতি খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দের একটি সমাধিমন্দিরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে। পঞ্চম বংশীয় রাজা সাহুরের সমাধি। লোহিত সমুদ্রে নৌ-অভিযান পাঠিয়েছিলেন তিনি সিনাই থেকে কড়ি (turquois) আনবার জন্য। ছবিতে দেখা যায় রাজা তীরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর জাহাজের লোকেরা হাত তুলে তাঁকে অভিবাদন

করছে। হায়রোগ্লাইফিক অক্ষরে লেখা আছে: "নমস্তে রাজা সাহুরে। তুমি জীবিতের রাজা। আমরা তোমার সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করি।" আটটি জাহাজ ভূমধ্যসাগরের নানা বন্দর ঘুরে ফিরে এসেছে মিশরে। দাড়িওয়ালা ফিনিসীয় বন্দীও দেখা যায় একটি জাহাজে। গঠনের ধাঁচ, মাস্তুল প্রভৃতি দেখে বেশ মনে হয় যে ইতালী থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সর্বত্রই এই ধরনের জাহাজের চলন হয়েছিল পরবর্তীকালে। একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। মিশরীয় অভিযান সুরু হয়েছিল প্রথম বংশীয়দের আমল থেকে, সিনাই উপদ্বীপে তাম্র সংগ্রহের জন্য। সেই অভিযানের স্বরূপ পঞ্চম বংশীয়দের রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চলের প্যালেস্টাইনদেশে হানাদারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি ছবিতে দেখা যায়, প্যালেস্টাইনের দক্ষিণাংশের কোন শহরে হানা দিচ্ছে মিশরীয় বাহিনী।

(২) গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস খৃঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে মিশরে কৃষিকার্য সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন এইরূপ: "উৎপন্ন ফসল সংগ্রহের জন্য এখানকার কৃষকদের অন্যদেশের চাষীদের চেয়ে ঢের কম পরিশ্রম করতে হয়। লাঙল দিয়ে জমি ভাঙবার জন্য পরিশ্রম করতে হয় না এখানে, মইও দিতে হয় না জমিতে অথবা ফসল উৎপাদনের জন্য অন্য দেশের লোকদের যত পরিশ্রম করতে হয়, তাও করতে হয় না তাদের। নদী আপনা থেকেই ফেঁপে উঠে মাঠকে জলসিক্ত করে দেয়, এবং সেচের পর নদীর জল নেমেও যায় আপনা থেকে। তখন প্রত্যেকটি লোক বপনকার্য আরম্ভ করে বীজ ছড়িয়ে, এবং মাঠে ছেড়ে দেয় শুয়োরের দল। শুয়োরগুলি কাদায় ছুটোছুটি করে সেই ছড়ানো বীজগুলিকে পায়ে মাড়িয়ে বোনার কাজ শেষ করে। তখন চাষীর আর কোন কাজ থাকে না, শস্য কাটার সময় পর্যন্ত।" শূকর দিয়ে যেমন চলতো বীজ বোনার কাজ, তেমনি বানরকেও শিক্ষা দেওয়া হত গাছ থেকে ফল পাড়তে।

এই বিবরণটিতে যেমন আরামপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের ছবি ফুটে উঠেছে, আসলে কৃষকের জীবন ঠিক সে-রকমটি ছিল কি না সন্দেহ। জমি ফারাওর সম্পত্তি, প্রজাকে খাজনা দিতে হত উৎপন্ন শস্যের দশ থেকে কুড়ি ভাগ। ফারাওর অধীনে উপস্বত্বভোগী বড় বড় জোতদার ছিল। একজন জোতদারের ছিল পনের শো গরু, এই থেকেই বোঝা যায় ইজারা মহলটি কত বড়। প্রাচীন মিশরের কোন লেখক কৃষকের অবস্থার যে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছে সংক্ষেপে

তা হল এই : উৎপন্ন গমের অর্ধেক খেয়েছে পোকায় আর বাকিটা ধ্বংস করেছে জল-হস্তী। তাছাড়া আছে ইঁদুর ফড়িং পশুপক্ষী — এরা যদি বা কিছু রেখে যায়, তার ওপর পড়ে চোরের দৃষ্টি। এই যখন কৃষকের অবস্থা, তখন এসে দেখা দেন তহশিলদার মহাশয় ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে, হাতে লাঠি নিয়ে। কাফ্রী পাইক বরকন্দাজ হাঁকে, খাজনা দাও। কৃষক নীরব, কিছু নেই যে দেবে। তখন তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বাঁধে তারা, তারপর টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে নদীতে চুবোন দেয়। স্ত্রী ও ছেলেদেরও বেঁধে রাখা হয়। ইতিমধ্যে কৃষকের প্রতিবেশীরা বাড়ি ছেড়ে পালায়।…এই বর্ণনায় কিছু সাহিত্যিক অতিশয়োক্তি থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু লেখক এখানে এটুকুও হয়ত যোগ করে দিতে পারতেন যে খাল কাটা, রাস্তা তৈরি, পিরামিডের পাথর টানা প্রভৃতি কাজের জন্য বেগার খাটতে হত প্রজাদের। অবশ্য এ সব কায়িক পরিশ্রম করবার জন্য ক্রীতদাসদেরও নিযুক্ত করা হত। যুদ্ধে বন্দী অথবা ঋণদায়ে আবদ্ধ ব্যক্তিদের ক্রীতদাস করে রাখবার বিধান ছিল। কখনো বা বিদেশে হানা দিয়ে মানুষ ধরে এনে নিলামে বিক্রি করা হত। লিডেন মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি পাথরে খোদাই করা চিত্রে দেখা যায় এক সারি এশিয়াবাসী বন্দী, হাত বাঁধা মাথা বা পিঠের পিছনে, বিষণ্ণ মুখে হতাশভাবে এগিয়ে চলেছে সেই দেশের দিকে যেখানে রয়েছে জীবনব্যাপী দাসত্ব তাদের জন্যে অপেক্ষা করে।



কৃষিকার্য—হাল লাঙল কাঠের— এক জোড়া বলদের শিং-এর সঙ্গে জোয়াল বাঁধা

আর একখানা চিত্রে দেখি আমরা, কোন অভিজাত-বংশীয় দীর্ঘাকৃতি পুরুষ তিন সারি হালের গরু আর এক সারি হাঁস পরিদর্শন করছেন, হাতে একটি লম্বা লাঠি নিয়ে। মাঝে দু' লাইনে দুজন ক'রে মুন্সী প্যাপিরাসের ওপর হিসাব লিখছেন, একজনের কানে কলম গোঁজা। এই আমীর ব্যক্তিটির শস্যক্ষেত্রে

কোন্ প্রণালীতে চাষ করা হত, তাই দেখিয়ে সমাধিমন্দিরে আরও একটি ছবি আছে। চাষ ও বপন কাজ চলছে। লাঙল কাঠের, ফালও কাঠের। এক জোড়া বলদের শিং-এর সঙ্গে জোয়ালটি জোড়া। একজন লোক লাঙল চেপে ধরে আছে, একজন মাটির চাপ ভেঙে দিচ্ছে, আর একজন বীজ ছড়াচ্ছে। এক জন মুন্সী আছেন এখানেও হিসাবনিকাশের জন্য। চাষের প্রণালী বিষয়ে হিরোডোটাস যা বলেছেন এই চিত্রটি তার সমর্থন করে না। কোথায় বা শূকর আর কোথায় বাঁদর। আজকের মিশরে যে প্রণালী মত কৃষিকার্য হয়ে থাকে, সুদূর অতীতে কৃষকেরা চাষবাস করতো এমনিভাবেই — চমকপ্রদ অভিনবত্বের অবকাশ বড় একটা ছিল না তাদের কাজের মধ্যে।

আমীরের গোশালায় দুগ্ধদোহন দেখানো হয়েছে একটি চিত্রে। গরুর পিছনের পা দু'টি বাঁধা, দুরন্ত গাভী যেন পা ছুড়তে না পারে। পিছনে একটি লোক বসে আছে গো-বৎসটিকে ধরে। গোমাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে লাফাচ্ছে বাছুর। আর একটি চিত্রে গর্দ্দভকে দেখা যায় শস্যের গোছা বয়ে নিয়ে যেতে। এই মন্দিরটির সবগুলি চিত্রই ভূম্যধিকারীর কৃষিকার্যের বিবরণ। তাই থেকে ইজারাদার সামন্তদের জীবনধারা, আর্থিক অবস্থা ও কাজকর্মের সঙ্গে আমাদের বিলক্ষণ পরিচয় ঘটে।

(৩) জহুরী ও মণিকারদের নির্মিত অলঙ্কার ও স্বর্ণপাত্রের নমুনা পিরামিডের সমাধিগর্ভে পাওয়া গেছে। পাথর-বসানো স্বর্ণপাত্র দেখতে খুবই চমৎকার, জগতের কোন জহুরীর শিল্প এই বস্তুগুলির সৌন্দর্যকে অতিক্রম করতে পারে নি। বহুমূল্য রত্নখচিত একটি সোনার টায়েরা পিরামিডে শায়িত সামন্তযুগের কোন রাজকুমারীর মাথায় পরানো ছিল। দেখতে মালার মতন, স্বর্ণপুষ্প দিয়ে গাঁথা—মিশরীয় মণিকারের শিল্পসৃষ্টির সুন্দর নমুনা। আমরা যে শুধু মণিকার-শিল্পের নমুনাই পেয়েছি, তা নয়। মণিকারেরা তাদের কর্মশালায় কিরূপে এই সব সুন্দর শিল্পবস্তু প্রস্তুত করতো তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাই মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত চিত্র থেকে। চিত্রটিতে আছে তিনটি সারি। প্রথম সারি: বাম দিকে দেখা যায়, জহুরি নিক্তিতে জহর ওজন করছে, আর মুহুরি ওজন টুকে নিচ্ছে। নিক্তি দেখতে ঠিক আধুনিক 'ব্যালেন্স্'-এর মত। ছয় জন লোক পাশাপাশি বসে চোঙা দিয়ে মাটির উনানের আগুনে ফুঁ দিচ্ছে। একটি কারিগর গলিত ধাতু ঢেলে দিচ্ছে, আর চারজন সোনা ঠুকে পাত তৈরি করছে। দ্বিতীয়

সারি : প্রস্তুত গহনার নানা রকমের নমুনা দেখা যায়। নিচের সারি : কারিগরেরা বসে গহনার কারুকার্য করছে আর অংশগুলিকে জোড়া দিচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকজন আছে বামন।

সোনার কাজের মত তামার কাজেও পিরামিডযুগের মিশরীরা পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। নানা প্রকার অস্ত্র ও মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি তাম্র দিয়ে প্রস্তুত করা হত — পাচ ছয় ফুট লম্বা করাত তৈরী করতো তারা কাঠ চিরবার জন্য। মনে রাখতে হবে, লৌহ তখনো আবিষ্কৃত হয় নি। এই যে বৃহৎ পিরামিড, যা জগতের বিস্ময় উৎপাদন করে এখনো, সেই পিরামিডের পাথরগুলি পাহাড় থেকে কাটা



ধাতুশিল্পীর কর্মশালা—নিচের সারিতে অলঙ্কারের কারুকার্যে রত কয়েকজন বামন বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়

হয়েছিল তাম্র অস্ত্র দিয়ে। ধাতুশিল্পী যে তাম্রের কত বড় কাজ করতে পারতো তার দৃষ্টান্ত,—একটি পিরামিড-মন্দিরে ১৩০০ফুট অর্থাৎ ¼ মাইল লম্বা তাম্রের পাইপ বসানো হয়েছিল জল-নিঃসারনের জন্য। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান — ড্রেন ও প্লাম্বিং উৎকর্ষতা লাভ করেছিল পিরামিডযুগে কতখানি, তা এই থেকেই বোঝা যায়।

মিশরে কোন ধাতুর খনি নেই, ধাতুর সন্ধান করা হত আরব ও নিউবিয়ায়। দূরদেশ থেকে ধাতুর আমদানি ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত উদ্যমে বড় একটা হত না, তাই এই আমদানি কার্যটি ছিল সরকারের একচেটিয়া বহু শতাব্দী ধরে। সিনাইর তাম্রখনিতে কিছু কাজ করা হত, সোনার আমদানি করা হত ভূমধ্য-

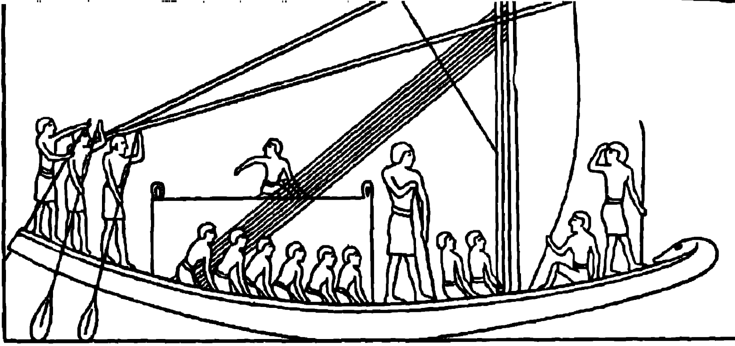
সাগরের পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল ও নিউবিয়া থেকে। ব্রেস্টেড বলেন, পিরামিডযুগে ব্রঞ্জ ধাতুর ব্যবহার চলিত ছিল না, কিন্তু মোসো প্রথম রাজ-বংশের আমলে (খৃ: পূ: ৩৪০০) ব্যবহৃত ব্রঞ্জ নির্মিত কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন। এ-কথা সত্য হলে বলতে হয়, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মিশরে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রঞ্জ তৈরি করবার পদ্ধতি জানা ছিল। এখানে প্রশ্ন এই যে, মিশর টিন পেল কোথায়? মিশরের ধারে-কাছে কোথাও টিন নেই। সমস্যাটির সমাধান করেছেন কোন পণ্ডিত এই বলে যে, প্রাচীন পারস্যে দ্রাঙ্গিয়ানা নামক স্থানটিতে টিনের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন গ্রীক ঐতিহাসিক স্ট্রাবো, সেখান থেকে টিন আমদানি করা হত। এই প্রসঙ্গে বৃটেনের কর্নওয়াল থেকে ফিনিসীয় বণিক মারফত টিন আমদানির কথাও বলা হয়েছে। আবার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন, বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল ব্রঞ্জ ধাতু নয়, ব্রঞ্জ নির্মিত জিনিস যে-গুলি পাওয়া গেছে সমাধিগর্ভে। প্রকৃতপক্ষে মিশরে ব্রঞ্জশিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল অষ্টাদশ রাজবংশের আমল থেকে (১৫৮০ খৃ: পূ:)। প্রথমে তৈরি হত ব্রঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র যেমন তলোয়ার শিরস্ত্রাণ ঢাল, তারপর ব্রঞ্জের যন্ত্রপাতি যেমন চাকা চাকি (**roller**) লিভার (**lever**) কপিকল (**pulley**) স্ক্রু করাত পাথর ছিদ্র করবার যন্ত্র (**drill**) ইত্যাদি।

(৪) কুম্ভকারের কাজেও মিশরীদের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। নব-প্রস্তর যুগে মাটির পাত্র নির্মাণ করা হত, আঙুল দিয়ে কাদা টিপে-টিপে, পাত্রের আকারও দেওয়া হত তেমনি করে। কিন্তু পিরামিডযুগের মৃৎপাত্র তৈরি করা হত কুম্ভকারের চাকার সাহায্যে। একটি চিত্রে দেখা যায়,—ভূতলে বসানো একটি চাকা, কুম্ভকার এক হাতে সেটিকে ঘোরোচ্ছে, অন্য হাতে চাকার ওপর বসানো কাদার পিণ্ডকে টিপে-টিপে মৃৎপাত্রের আকার দান করছে। কুম্ভকারের চক্র দেখা দিয়েছে এ-যুগে তা বেশ বোঝা গেল, — আর দেখা দিয়েছে লম্বা আবৃত চুল্লী। ছবিতে দেখা যায় সদ্য প্রস্তুত কাঁচা ঘটগুলিকে উঁচু আবৃত চুল্লীর মধ্যে বসিয়ে পোড়াবার পদ্ধতি। চক্‌-চকে পালিস-করা (**glazed**) নানা রং-এর মাটির ভাণ্ডও তৈরি করা হত।

(৫) ইট সিমেণ্ট প্ল্যাসটার (**plaster of Paris**) তৈরি করতো মিশরীরা। সে-যুগের কাজ-করা কাঁচের বোতল পাওয়া গেছে। একটি প্রাচীর-গাত্রে কাঁচের প্রস্তুতপ্রণালী প্রদর্শিত হয়েছে। দ্রবীভূত কাঁচ মাখিয়ে টালিকে

চকচকে (glazed tiles) করা হত। এই শিল্প পরবর্তীকালে আসিরিয়ায় বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। রঙীন কাঁচের বোতল পাত্র প্রভৃতি অতিপ্রাচীন কালেও মিশর থেকে বিদেশে রপ্তানি হয়েছে।

(৬) ছুতারের কর্মশালার চিত্র: করাত দিয়ে কাঠ চেরা, বাটালি দিয়ে ছোলা, ড্রিল দিয়ে গর্ত করা ইত্যাদি সবই দেখা যায় চিত্রটিতে। একটি বসবার কৌচ তৈরি করা হচ্ছে। কাঠের কাজের ওস্তাদ করিগর এরা, জাহাজ নৌকা থেকে আরম্ভ করে চেয়ার খাট পালঙ্ক — মায় কফিন পর্যন্ত তৈরি করতো, এমন সুদৃশ্য কফিন যা দেখলে সত্যই মানুষের যেন মরতে ইচ্ছা হত। পিরামিড যুগের কাঠের তৈজস-পত্র পাওয়া যায় নি. তবে সাম্রাজ্যযুগের অতিসুন্দর দারুশিল্পের নমুনা থিবিসের সমাধিগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ছুতারের কর্মশালায় তৈরি হত বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ।



নদীবক্ষে ভাসমান নৌকা
(২৫০০ খৃ: পূ:)

(৭) কাপড় বোনার ছবিও দেখা যায়। কিন্তু ছবি থেকে কাপড়ের জমিন কেমন সূক্ষ্ম তা বুঝবার উপায় নেই। সৌভাগ্যক্রমে বোনা কাপড়ের নমুনা পাই আমরা চার পাঁচ হাজার বছর আগের মামির অঙ্গে পরিহিত রাজকীয় পরিচ্ছদে। কাপড়ের জমিন এতই সূক্ষ্ম যে ম্যাগনিফাইং কাঁচ ছাড়া বোঝাই যায় না যে কাপড়টি সুতোর, রেশমের নয়। মিশরের তাঁতে-বোনা কাপড়ের মত মিহি জমিন আধুনিক যন্ত্রশিল্প এখনও তৈরি করতে পারে নি।

(৮) সমাধির দেয়াল-চিত্রে চর্মকারের চামড়া প্রস্তুতের প্রণালীও দেখানো

হয়েছে। ছবিতে যে-রকম বাঁকা ছুরি আছে চর্ম প্রস্তুত-কারকের হাতে, সে-রকম ছুরি চর্মকারদের ব্যবহার করতে আজও দেখা যায়। প্রস্তুত-করা (**tanned**) চামড়া দিয়ে তৈরি হত — পরিধেয় বসন, তূন, ঢাল, আসন।

(৯) সর্বশেষে প্যাপিরাস-শিল্পসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে। মিশরে নদীপ্রান্তের জলাভূমিতে এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মাতো তার নাম প্যাপিরাস। সেই উদ্ভিদকে থেঁতো করে বিছিয়ে, রোদে শুকিয়ে একরকম কাগজ তৈরি করা হত। কালক্রমে এই কাগজের প্রচলন মিশরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন মিশর থেকে জাহাজে কাগজ রপ্তানি করা হত বিদেশে, এমন কি ইউরোপে পর্যন্ত। কাগজ ছাড়াও প্যাপিরাস দিয়ে দড়ি, মাদুর ও স্যাণ্ডেল তৈরি করতো মিশরীয় কারিগরেরা।

যে-সব চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়াও অনেক ছবি আছে যাতে সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রত্যেকটি দিক সুষ্ঠুভাবেই প্রতিফলিত রয়েছে। যেমন, রুটি তৈরি, বৃষ বলি ও মাংস কাটা, হাঁসের পালক ছাড়ানো, আঙুর পিষে মদ তৈরি, নানান্ রকম বাসন প্রস্তুত। নীল নদীর জলাভূমিতে পাখী, মাছ ও জলহস্তী শিকারের দৃশ্য দেখা যায়। খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদের ছবিও আছে, যেমন — বল খেলা, নাচ, জিমন্যাসটিক। মিশরের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে উচ্চনীচের প্রভেদ ও দরিদ্রের কর্মক্লান্ত জীবন সত্ত্বেও, মোটামুটিভাবে এ-কথা বলা বোধ করি অসঙ্গত নয় যে, সে-যুগের মিশরীরা ছিল কর্মপটু আনন্দপ্রিয় ভোগবিলাসী জাতি।

সেই আদিযুগেও শ্রেণীবিভাগ একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল। রাজ পুরুষ ও সামন্তবর্গ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল একটি অভিজাতকুল — অর্থনীতি ও সমাজক্ষেত্রে এক-নায়কত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই অভিজাতকুলের জমি চাষ করতো এক শ্রেণীর দাস (**serfs**) যাদের স্বাধীনতা ছিল সীমাবদ্ধ। রাজা ও অভিজাতবর্গের ব্যক্তিস্বার্থের প্রয়োজনে অসংখ্য দাসশ্রেণীর লোক বাধ্যতা-মূলক পরিশ্রম করে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছে, সমাধিস্তূপ ও মন্দিরগুলি দেখলে অনায়াসে বোঝা যায়। অভিজাতবর্গ শিবিকায় ভ্রমণ করতেন, আর সেই পালকি স্কন্ধে বহন করতো দাসশ্রেণীর বেহারারা। একটি চিত্রে দেখা যায়, অতিবৃহৎ প্রস্তরমূর্তি স্লেজের ওপর বসিয়ে উত্তমরূপে বাঁধা হয়েছে, আর সেই স্লেজটিকে টেনে নিয়ে চলেছে সারি সারি দাসের দল। অভিজাত ও দাসশ্রেণী

ছাড়া আরও ছুটি শ্রেণী ছিল, তারা কারিগরশ্রেণী ও ব্যবসায়ীশ্রেণী। সাধারণত কারিগরি কাজ ও ব্যবসায় ছিল বংশক্রমিক বৃত্তি, এবং কর্ম অনুসারে বিভিন্ন জাত বা বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল, যেমনটি দেখা যায় ভারতবর্ষে। ব্যাবিলোনিয়ার মত মিশরদেশ বণিক প্রধান ছিল না। বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে নানা দেশ পর্যটন করতো ব্যাবিলোনীয় বণিকেরা, তারা ছিল একটি স্বাধীন সম্প্রদায়, রাজার সমর্থনপুষ্ট। পক্ষান্তরে মিশরী বণিকেরা ছিল ফারাওর কর্মচারী বিশেষ। ফারাওর নির্দেশে তাঁরই জাহাজে জলপথে যাত্রা করতো বণিকের দল, দূরদেশে পণ্যের বিনিময়ে ধাতু হস্তীদন্ত ইবনিকাষ্ঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করে দেশে ফিরতো। কিন্তু বিদেশের প্রতি মিশরীদের দারুণ অশ্রদ্ধার জন্য সে-কালের বিদেশী বাণিজ্য তেমন বিস্তার লাভ করে নি। দেশের আভ্যন্তরীন



প্রাচীন রাজ্যে বাজারের দৃশ্য

বাণিজ্য চলতো নদীপথে, প্রাচীর-গাত্রের ছবিগুলিতে বজরায় বা নৌকায় শিল্পদ্রব্য বহনের অনেক দৃশ্য দেখা যায়। হাট বাজারের চিত্রও আছে—রুটিওয়ালা চর্মকারের কাছ থেকে রুটির বদলে একজোড়া স্যাণ্ডেল গ্রহণ করেছে, সূত্রধারের স্ত্রী মাছের বিনিময়ে ধীবরকে দিয়েছে একটি কাঠের বাক্স। সাধারণত ক্রয়বিক্রয় চলতো দ্রব্যবিনিময়ের মাধ্যমে, মুদ্রার প্রচলন ছিল না। তবে নির্দিষ্ট ওজনের এক প্রকার সোনা ও তামার আংটি চলিত হয়েছিল, সেই আংটিগুলি জিনিস কিনবার জন্য ব্যবহার হত। এই অঙ্গুরীয়কে ধাতু-মুদ্রার আদিরূপ বলা যেতে পারে।

কারিগরি শিল্পের যে-সব নমুনার সাক্ষাৎ পেয়েছি, সেগুলি থেকে আমরা বেশ অনুমান করতে পারি শ্রেষ্ঠত্বের কোন উচ্চ পর্যায়ে সে-কালের মিশরীয় শিল্পবিদ্যা গিয়ে পৌচেছিল। এই প্রসঙ্গে পেস্‌কেলের (Peschel) উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন "If we compare the technical inventory of the Egyptians with our own, it is evident that before the invention of the steam-engine, we scarcely excelled them in anything." আধুনিক বাষ্পযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে কোন দেশের কারিগর মিশরীয় কারিগরি শিল্পকে অতিক্রম করতে পারে নি।

৬

সামন্তযুগ বা মধ্যম রাজ্য ঃ হিকসোস আক্রমণ

মিশরের ইতিহাসকে প্রধানত তিনটি কালবিভাগে বিভক্ত করা হয় : (১) প্রাচীন রাজ্য, (২) সামন্তযুগ বা মধ্যম রাজ্য, (৩) সাম্রাজ্য। প্রত্যেক যুগের রাজ্য বিশেষ বিশেষ কীর্তি রেখে গেছে ভাবীকালের উত্তরাধিকার রূপে। প্রাচীন রাজ্যের কীর্তি পিরামিড নির্মাণ, মধ্যম রাজ্যের কীর্তি পাহাড় কেটে সমাধি-মন্দির (cliff tombs) নির্মাণ, আর সাম্রাজ্যের কীর্তি বিরাট মন্দির ও প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করে রাজধানী কারনাক ও লাকসার নগরের শোভাবর্ধন। ভূমিসম্প্রসারণ মিশরের ব্যাধি হয়ে উঠেছিল শুধু সাম্রাজ্যযুগেই, কিন্তু সমাধি মধ্যে 'মামি'কে শায়িত রেখে ইহজীবনকে পরকালে সম্প্রসারণের কাজ চলেছিল সকল কালে সমভাবে।

ফারাওদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হ্রাসের ফলে প্রাদেশিক নোমার্কগণ স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছিল, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ফারাওকে কর প্রদান পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় পূর্তবিভাগের কৃষিব্যবস্থাগুলি ভেঙে পড়েছিল এবং সেজন্য অনেক কর্ষণযোগ্য ভূমি পতিত পড়ে রইলো। ফিনিসিয়া নিউবিয়া প্রভৃতি বহির্দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্তর্বিরোধ দ্বন্দ্ববিবাদ দেশে এমনি অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল যে ফারাও বা সামন্তগণের পক্ষে এ-যুগের কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার সুযোগ ঘটে নি। এই প্রকার মাৎস্যন্যায় অবস্থার মধ্যে রাজধানী মেমফিস নগরে সপ্তম ও অষ্টম রাজবংশের আবির্ভাব হয়েছিল।

অষ্টম বংশের দুর্বল রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সেই সিংহাসন অধিকার করেছিলেন হিরাক্লিওপলিসের একজন নোমার্ক। মেমফিসে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভবত তৃতীয় রাজবংশীদের রাজত্বকালে। প্রায় পাঁচ শো বছর পরে রাজধানী এখন হিরাক্লিওপলিস নগরে স্থানান্তরিত হল। এই নগর ফায়ুম হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত, আদিকাল থেকে হোরাসের পীঠস্থান। এখানকার নোমার্কদেরই ঐতিহাসিক মনেথো নবম ও দশম রাজবংশীয় বলে বর্ণিত করেছেন। সম্ভবত

ওই রাজারা ছিলেন দুর্বল ও নগণ্য, কোন স্মৃতি-চিহ্ন রেখে যেতে পারেন নি। তবে শেষ তিন পুরুষের রাজত্বকালে সিউট (Siut) নামক স্থানের নোমার্কগণ কয়েকটি পাহাড়ে পাথর কেটে সমাধিমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরগাত্রে লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, হিরাক্লিওপলিসের রাজাদের শাসনে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই কৃতিত্বের বহুলাংশ সামন্তদের প্রাপ্য। সিউট সামন্তের সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বহর ছিল, তাঁর শাসিত প্রদেশটি ছিল শস্যসমৃদ্ধ, এবং হিরাক্লিওপলিসের সামন্তদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল সৌহার্দপূর্ণ।

মেমফিস থেকে ৪৪০ মাইল দক্ষিণে এবং প্রথম প্রপাত থেকে একশ চল্লিশ মাইল উত্তরে থিবিস নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, প্রাচীন সভ্যতার এমন বিরাট ভগ্নস্তূপ বুঝি জগতে আর নেই। সামন্তযুগের প্রথম ভাগে এই নগর ছিল একটি ক্ষুদ্র জেলা শহর, কোন প্রতিপত্তিহীন অজ্ঞাত নোমার্ক ছিলেন শাসন-কর্তা। হিরাক্লিওপলিটান রাজাদের রাজত্বের শেষ দিকে থিবিস দাক্ষিণাঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করেছিল, এবং সেজন্য আঞ্চলিক প্রদেশপাল ইনটেফ (Intef) 'দক্ষিণ দেশের দ্বার-রক্ষক' এই নামে অভিহিত হয়েছিলেন। প্রপাত থেকে থিবিস পর্যন্ত শক্তিবলে সংগঠিত সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলকে হিরাক্লিওপলিসের প্রভাব মুক্ত করে তিনি একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করলেন। সেই রাজ্যের রাজধানী হয়েছিল থিবিস। সেই সময় থেকে থিবিস ক্রমশ পরাক্রান্ত হয়ে উঠতে লাগলো। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের পুনর্মিলনের পর সারা মিশর রাজ্যের রাজধানীরূপে থিবিস যে একাধিপত্য স্থাপন করেছিল, সেই প্রভুত্ব স্থায়ী হয়েছিল পনর শো বছর।

দ্বাবিংশ খৃস্ট পূর্বাব্দে অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর থিবিস-রাজ একাদশ রাজবংশী দ্বিতীয় মেনটুহটেপ (Mentuhotep II) হিরাক্লিওপলিটান শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে দক্ষিণখণ্ডের সঙ্গে উত্তরখণ্ডকে সংযুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বংশের আর একজন রাজা নেব-হটেপ-রা (Nebhotep-Ra) শিল্পানুষ্ঠান বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীনরাজ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বংশের রাজত্বকালে 'মেমফিসের শিল্প' (Memphite Art) বিলক্ষণ উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, দক্ষিণদেশেও সেই শিল্পের অনুকরণ চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। কিন্তু গৃহযুদ্ধ শিল্পকে এমন অধোদিকে ঠেলে দিয়েছিল যে একাদশ বংশীয় নৃপতিদের কাল পর্যন্ত থিবিসে শিল্পের একরকম স্থূলবর্বর অদ্ভুত রূপের সাক্ষাৎ মেলে। এই

অধোগতি বন্ধ হয়ে শিল্প আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছিল নেব-হটেপ-রা'র রাজত্বকালে। এই রাজা পাহাড় কেটে সমাধিকক্ষ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর কফিন বা 'কা'র প্রস্তরমূর্তি রাখবার জন্য। সমাধিকক্ষের উপরিভাগে ঝুলি-পথ দিয়ে একটি মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। প্রাচীরগাত্রে রাজার যুদ্ধবিগ্রহ ও শিকারের চিত্রাবলী, সেগুলি মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে গেছে। বহির্দিকে মার্বল পাথরে মোড়া একটি ইষ্টক নির্মিত পিরামিড স্মৃতি-সৌধ রূপে নির্মাণ করা হয়েছে, তারই নিকট হাথর-দেবীর কয়েকজন পূজারিণীর সমাধি। ঐতিহাসিক হল সাহেব মনে করেন, রাজার পরলোকের সঙ্গিনী হবার জন্য তাদেব বোধ করি সহমরণে যেতে হয়েছিল।

এই যুগের একজন প্রখ্যাত শিল্পীর পরিচয় পাই আমরা, যিনি ছিলেন রাজ-শিল্পী, নবসৃষ্টির পুরোধা, তার নাম মার্টিসেন (**Mertisen**)। সমাধিস্তম্ভে তিনি যে আত্ম-কাহিনী লিখে গেছেন তাই থেকে জানা যায়, সে-কালের শিল্পীর বিদ্যা ছিল গুপ্ত-বিদ্যা, আর সে-বিদ্যা জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া কাউকে দান করা হত না। মার্টিসেন ও তার শিল্পী পুত্রের সহায়তায় রাজা নেব-হটেপ-রা শিল্পকে পঙ্ক থেকে উদ্ধার কবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতকরতে পেরেছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। এই রাজার কীর্তি শুধু শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, লিবিয়ান নিউবিয়ান ও সেমাইটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তী রাজা সাংখারা মেনটুহটেপ (**Sankhara Mentuhotep**) পুন্‌ট্ বা সোমালিল্যাণ্ডে নৌ-অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। সাংখারার এই নৌ-অভিযানটি পরবর্তী সাম্রাজ্য যুগের রানী হাটসেপস্থটের বিরাট নৌ-অভিযানসমূহেরই পূর্বাভাস।

একাদশ বংশীয়দেব রাজত্বের অবসানে থিবিসবাসী শক্তিশালী আমেনেমহেট পরিবারের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই পরিবারের কর্তা প্রথম আমেনেমহেট (**Amenemhet I**) দ্বাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজবংশসম্ভূত এমন কি ইনটেফের একজন বংশধর বলে দাবী করেছেন তিনি, সম্ভবত একাদশ বংশের শেষ রাজার মন্ত্রী ছিলেন, তাকে অপহৃত করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন খৃঃ পূঃ ২২১২ অব্দে। প্রথমেই তাঁকে প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নীল নদীর একটি জল-যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায়, তিনি শত্রুকে পরাজিত করে মিশরদেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। রাজত্বে আর একটি প্রবল বাধা হয়ে উঠেছিল পরাক্রান্ত সামন্তদের বিরোধিতা। প্রাচীন রাজ্যের পতনের পর থেকে

এই সামন্তকুল স্বাতন্ত্র্যের মনোবৃত্তি নিয়ে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে এসেছিল। একাদশ বংশীয় কয়েকজন শক্তিশালী রাজা সামন্তদের স্বাধীনতা বা বিকেন্দ্রীকরণের প্রবৃত্তিকে যথাসম্ভব সংযত করে রেখেছিল বটে, কিন্তু তাদের বিষদন্ত কোনদিন ভাঙে নি, এখন তারা আমেনেমহেটকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছিল। সুকৌশলে আমেনেমহেট কয়েকজন সামন্তকে অর্থ ও সম্মান দানে বশে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়কার তিক্ত অভিজ্ঞতা তার মনে যে বিষের সঞ্চার করেছিল সেই বিষ তীব্রভাবে ফুটে উঠেছিল মৃত্যুকালে তিনি যখন পুত্র সেনুসার্টকে (Senusert) দীর্ঘ উপদেশ দান করেছিলেন। এই উপদেশ-মালা স্বৈরাচারের একটি প্রামাণিক দলিল, যা কোন কোন রাজবংশের জপমালা হয়ে উঠেছিল।

শোন কথা মন দিয়ে—
ধরণীর অধীশ্বর হও যেন তুমি,
ইষ্ট বৃদ্ধি হয় যেন তোমার শাসনে।
কঠোর হবে অধীন জনের প্রতি,
ভয় যে দেখায় তার আদেশ লোকে নেয় মাথা পেতে,
কারু সঙ্গে একা থাকা নয়কো উচিত,
ভ্রাতাকে দিও না মনে স্থান,
বন্ধু প্রতি ফিরেও চেয়ো না,
নিদ্রাকালে সতর্ক পাহারা যেন থাকে হৃদয়ের 'পরে,
কারণ সুসময়ের বন্ধু থাকে না আপদকালে।

পুত্র সেনুসার্ট বা সিসোস্ট্রেস তখন লিবিয়াদেশে যুদ্ধে ব্যাপৃত, এমন সময় কারাও আমেনেমহেটের মৃত্যু হয়। সেই সংবাদ পেয়ে তিনি তড়িৎ-পদে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং কোন দাবীদারের আবির্ভাবের পূর্বেই সিংহাসন অধিকার করেন (২১৯২ খৃঃ পূঃ)। গোলযোগের ভয়ে পিতার মৃত্যু সংবাদটি তিনি গোপন রেখেছিলেন, দেখা যায় সে যুগেও সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ির প্রবৃত্তির কিছু অভাব ছিল না। প্রথম সিসোস্ট্রেস ও তার পুত্র দ্বিতীয় আমেনেমহেট তাদের উত্তরাধিকারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণই রেখেছিলেন। এই বংশের কল্যাণকর শাসনে শুধু যে মিশর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা নয়, মিশরের বহির্দেশেও তাদের

নানা সাফল্যমণ্ডিত উদ্যোগ অনুষ্ঠানের লিখিত বিবরণ দেখা যায়। দ্বিতীয় সিসোস্ট্রেসের আমলেই প্রথম ও দ্বিতীয় প্রপাতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে মিশরের অধিকার বিস্তারের পথ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

আমেনেমহেট সামন্তদের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন বটে, দেশের পুনর্গঠন কার্যও সম্পন্ন করেছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল প্রচলিত সামন্ততন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করতে পারেন নি। প্রদেশগুলিতে সামন্তরা ছিল এক একজন খুদে ফারাও, রাজস্ব সংগ্রহ বিচার প্রভৃতি শাসন সংক্রান্ত সকল রকম কাজ করতো তারাই, পূর্তকার্য খাল-কাটা কৃষির ব্যবস্থাও করতো, আর ফারাওর প্রাপ্য কর রাজকোষে প্রদত্ত হত তাদের মারফতে। পূর্বকালে সমাধি-মন্দির নির্মাণের অধিকার ছিল একমাত্র ফারাওর, তাঁর অনুমতি ব্যতীত অমাত্য বা রাজকর্মচারীদেরও স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করা হয় নি। সামন্তরা এখন স্বাধীনভাবে আপন খুশী মত নূতন পদ্ধতি অনুসারে উৎকৃষ্ট সামাধি নির্মাণ করতে আরম্ভ কবেছিল। এই সমাধি পিবামিড নয়, পর্বতগুহা-মন্দির। বেনিহাসান নামক স্থানে নোমার্ক বা সামন্তদের সমাধি-গুলি স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন, এখানে সমাধিগাত্রের শিলালিপি থেকে আমরা নোমার্কদের জীবনযাত্রা শাসন-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হই। বেনিহাসানের পর্বতগাত্রের সমাধিকক্ষগুলি ছাড়াও এ-কালে মরুপ্রান্তের আবিডস নামক স্থানে অনেক রাজকীয় সমাধি নির্মাণ করা হয়েছিল, যে-সব সমাধির কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। আবিডস আসিরিস-দেবের পীঠস্থান, এখানে না কি তাঁর দেহকে সমাধিদান করা হয়েছিল, সেজন্য আবিডস মিশরের পবিত্রতম তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। এখানকার মন্দিরপ্রাঙ্গণে উজির থেকে চামার সকল শ্রেণীর মানুষের মৃতদেহ প্রোথিত করা হত। রাজকীয় কর্মচাবীরা কার্যোপলক্ষে এখানে এসে তাদের কর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলি ফলকে লিপিবদ্ধ করতে ক্রটি করতেন না। বেনিহাসান ও আবিডসের শিলালিপিতে দেখা যায়, স্থানীয় শাসন রাজস্বসংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে ফারাওদের সার্বভৌম অধিকার কার্যত অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়েছিল, এবং সেই ক্ষতিপূরণের জন্য দ্বাদশ বংশীয় নৃপতিরা নিউবিয়ায় স্বর্ণখনি এবং পুন্ট্ সিনাই হামমাট প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসা এবং ধাতু ও পাথর সংগ্রহের কাজ থেকে নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই আয়ের একচেটিয়া অধিকার ছিল ফারাওর, সে-অধিকার তাদের কখনো লুপ্ত হয় নি।

এইরূপ শাসন-পদ্ধতি অর্ধ সহস্রাব্দ কাল ধরে চলেছিল। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের ফলে

যে নির্জীব ঔদাসীন্য জাতিকে মৃতের আচ্ছাদন-বস্ত্র দিয়ে আবৃত করে রেখেছিল, দ্বাদশ-বংশীয়দের রাজত্ব কালে সেই জীবন্মৃত ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছিল। নিউবিয়া সিনাই পুন্ট্‌ প্রভৃতি স্থানে অভিযান পাঠানো হলো, প্রদেশগুলির (nomes) চৌহদ্দি জরিপ করে নির্দিষ্ট করা হল, আর সেই সঙ্গে নোমার্ক-গণের অপরিমেয় ক্ষমতা একটি সুপরিকল্পিত খাতের মধ্যে প্রবাহিত করা হয়েছিল। দেশের সম্পদ যেমন বৃদ্ধি পেল, শিল্পেরও তেমনি উন্নতি দেখা দিল। প্রথম সেনুসার্ট নানান্‌ স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নিজের দশটি প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তি কায়রো মিউজিয়ামকে অলঙ্কৃত করছে। এই যুগের শিল্প-জাগৃতির কথা চিরস্মরণীয়। অল্পকালের জন্য শিল্পে এমন একটি স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাব দেখা দিয়েছিল যা সাম্রাজ্যযুগের রাজা ইখনাটনের পূর্বে পুনরায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। বস্তুত রুচি ও যোজনায় উত্তরকালের জাপানী আর্টের সঙ্গে, আর সঙ্গতি ও সৌষ্ঠবে ভাবী গ্রীক শিল্পের সঙ্গে তুলনীয় এ-সময়কার শিল্প-সৃষ্টি।

শিল্পের মত সাহিত্যেরও বিকাশ দেখা যায় এই যুগে। নানা কথিকা পদ্য ভ্রমণ-কাহিনী লেখা হয়েছিল প্যাপিরাস কাগজের উপর। সেই কাগজগুলিকে তাড়া বেঁধে জালাব মধ্যে ভরে লেবেল মেরে রাখা হত। পৃথিবীর সর্ব প্রথম গ্রন্থাগারের সাক্ষাৎ পাই আমরা সামন্তদের গৃহে। সেখান থেকে কিছু কিছু প্যাপিরাসের তাড়া সমাধিমন্দিরে মৃতের কক্ষে এনে রাখা হয়েছিল, দেখা যায়। এই প্যাপিরাসগুলিই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। ৬৬ ফুট লম্বা এক তাড়া কাগজে চিকিৎসা প্রণালী, রোগ ও ঔষধের কথা লেখা রয়েছে। অঙ্ক পাটিগণিত জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা কাগজও পাওয়া গেছে। ফল কথা, পিরামিডযুগের তুলনায় এ-কালের চিন্তা ও জ্ঞান অধিকতর পরিণত ও প্রগতিশীল। তখন সামন্ত-প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব হয় নি বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শাসন-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন মধ্যম রাজ্যের ফারাওরা। কয়েক বছর অন্তর একটি আদম-সুমারি (census) গ্রহণ করা হত করধার্যের জন্য। লোকগণনার কয়েকটি তালিকাও পাওয়া গেছে।

এ-যুগের সব চেয়ে বড় কীর্তি—পূর্তকার্য ও বৃহৎ খাল-কাটা। তৃতীয় সেনুসার্ট বা সিসোসস্ট্রেস (Sesostres III) সাতাশ মাইল দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণ করে ফায়ুমের জলাভূমির জল মেওরিস হ্রদে (Lake Maoris) এনে জমা করেছিলেন। এইরূপে জলাভূমি উদ্ধার ও সেচ ব্যবস্থার ফলে পঁচিশ হাজার

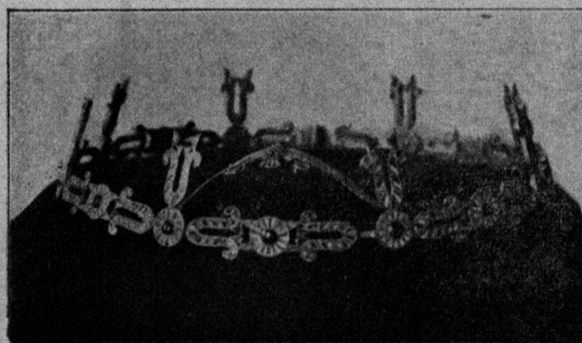
একর জমি আবাদযোগ্য হয়েছিল। দ্বাদশ বংশীয় নৃপতিরা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের দিকেও মন দিয়েছিলেন। আধুনিক যুগের মত সে কালেও জলপথে বিদেশী বাণিজ্য চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে লোহিত সমুদ্রের যোগ স্থাপন করা হয়েছে এখন সুয়েজ খাল খনন করে। চার হাজার বছর পূর্বে ফারাওরাও তখন নীল নদীর অববাহিকা অঞ্চলের পূর্বভাগে একটি শাখার সঙ্গে লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছিলেন একটি কাটা খালের সূত্রে। এমনি করে মিশরের মধ্য দিয়ে এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে বাণিজ্য-তরী যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গম কাপড় শিল্পদ্রব্য ছিল প্রধান রপ্তানির বস্তু, আর আমদানি করা হত উটপাখীর পালক, সোনা রূপা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য, মশলা।

তৃতীয় সিসোসস্ট্রেস (২০৯৯ খৃঃ পূঃ) তাঁর রাজ্য দ্বিতীয় জলপ্রপাত পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। সেখানে কুসাইট উপজাতিদের হানা প্রতিরোধের জন্য যে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন তিনি তার ভগ্নাবশেষ এখনো বিদ্যমান। সীমান্তদেশে তিনি নিজের একটি প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করেছিলেন সম্ভবত বর্বর জাতিদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে। তাঁর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল বলেই মনে হয়, কেননা কুস অঞ্চলের অভিযানগুলি সেখানকার অধিবাসীদের মনে এমন ভীতি-মিশ্রিত সম্ভ্রম জাগ্রত করেছিল যে পরবর্তীকালে তাঁকে এখানে দেবতারূপে পূজা করা হত। তৃতীয় সিসোসস্ট্রেসের রাজত্বকালেই আমরা সর্বপ্রথম মিশর কর্তৃক এশিয়া ভূখণ্ডের আক্রমণ দেখতে পাই। ফারাও স্বয়ং সিরিয়ায় সৈন্যবাহিনীর অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এই সময় থেকে তিন শতাব্দ পরে মিশরের সাম্রাজ্যযুগের রণভেরী পশ্চিম এশিয়ায় আবার বেজে উঠেছিল, সিসোসস্ট্রেসের এই যুদ্ধোদ্যমকে সেই সাম্রাজ্যযুগেরই অগ্রদূত বলা যেতে পারে। অবশ্য সিসোসস্ট্রেসের যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্য লুঠ-তরাজ ছাড়া আর কিছু না হওয়াই সম্ভব, কিন্তু অভিযানের ফলে মিশরের প্রথম দিগ্বিজয়ী বীর রূপে তাঁর খ্যাতি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

সিসোস্ট্রেসের পুত্র তৃতীয় আমেনেমহেটের রাজত্বকালে দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত ছিল (২০৬১-২০১৩ খৃঃ পূঃ)। বাহুবলে দিগ্বিজয়ের উৎসাহ তাঁর ছিল না, শস্য বৃদ্ধির জন্য সেচব্যবস্থার উন্নতি ও খনিজ সম্পদ উদ্ধারের দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ফায়ুম হ্রদের জল নিয়ন্ত্রণ করে সেচের ব্যবস্থা



ব্রঞ্জ অস্ত্র শস্ত্র (প্রথম আমোস্)—বহুমূল্য প্রস্তর খচিত
কায়রো মিউজিয়াম



দ্বাদশ বংশীয় এক রাজকন্যার মুকুট
(দাশুরের কবরে প্রাপ্ত)



তৃতীয় আমেন-এম-হেটের মস্তক
গ্রানাইট প্রস্তর (ট্যানিসে প্রাপ্ত)



লতাপাতায় নির্মিত নৌকায় জলাদেশে শিকার
সাম্রাজ্য যুগের থিবিসে একটি সমাধিগাত্রে চিত্রিত



উশেরহাটের কবরে চিত্রিত শিকারের দৃশ্য



পশু পরীক্ষা (সাম্রাজ্যযুগের থিবিসে একটি সমাধিগাত্রে চিত্রিত)

দ্বাদশ বংশীরা পূর্বেই করেছিলেন, কিন্তু ওই ব্যবস্থার সবিশেষ উন্নতি সাধন করা হয়েছিল তৃতীয় আমেনেমহেটের আমলে। এই বংশের রাজত্বকালে আরসিনো (Arsinoe) নামে একটি সমৃদ্ধ নগর গড়ে উঠেছিল, সেখানে ছিল কুম্ভীর-দেবতা সবক (Sobk)-এর মন্দির। এই শহরের প্রথম সিসোস্ট্রেসের একটি ওবেলিস্ক আর তৃতীয় আমেনেমহেটের দুটি বিরাট প্রস্তরমূর্তি ছিল দণ্ডায়মান। তৃতীয় আমেনেমহেটের অর্ধ শতাব্দ-জোড়া সুদীর্ঘ রাজত্বের নিবিড় সুখশান্তি ও পরম সমৃদ্ধি সত্যই প্রজাদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। তারা ফারাওর গুণকীর্তন করতো এই গানটি গেয়ে :

দুই ভূখণ্ডকে তিনি শস্য শ্যামল করেছেন
নীল নদীর চেয়েও বেশি,
দুই ভূখণ্ডকে শক্তি সামর্থ্যে ভরে
তুলেছেন,
নাসিকা-জুড়ানো শীতল জীবন তিনি।
(He is life, cooling the nostrils)

দ্বাদশ বংশীয় স্থাপত্য ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্প যখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত, বাণিজ্য যখন বর্ধিষ্ণু দূর-প্রসারিত, সমৃদ্ধি যখন মধ্যাহ্ন শিখরে দীপ্যমান, সেই সময়ে তৃতীয় আমেনেমহেটের মৃত্যুর সঙ্গেই রাজ্যের সুবিশাল সৌধটিতে ফাটল ধরেছিল। ফারাও চতুর্থ আমেনেমহেট মাত্র নয় বছর রাজত্ব করবার পর অপুত্রক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তারপব যে কয়জন ফারাও রাজত্ব করেন তাঁরা নিজেদের দ্বাদশ-বংশী বলে অভিহিত করতেন বটে, কিন্তু রাজত্ব তখন বহুভাগে ভেঙে পড়েছিল। উত্তরাংশে এই সব দুর্বল রাজত্ব কোনমতে টিঁকে থাকলেও সে অস্তিত্ব ছিল নিতান্ত সাময়িক, রাজার পর রাজার আবির্ভাব ও তিরোধান অনেকটা বুদ্বুদের মতই ঘটতে লাগলো। পক্ষান্তরে দক্ষিণদেশের থিবিস নগরে একটি নূতন রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। উত্তর মিশরের দুর্ভাগ্য, এই সময়ে ঘটলো প্যালাস্টাইন থেকে বিদেশী হিকসোসদের (Hyksos) আক্রমণ। এই বর্বর আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারে নি বিভক্ত মিশর। ফলে, নগর ভস্মসাৎ মন্দির ভূমিসাৎ হল, সঞ্চিত ধন লুণ্ঠিত ও শিল্প বিনষ্ট হল, এবং দুই শতাব্দীর জন্য নীল নদীর স্বর্ণ-উপত্যকা "রাখাল রাজাদের" (Shepherd Kings) শাসনাধীন হয়েছিল

(১৮০০-১৬০০ খৃঃ পূঃ)।* হিকসোসরা সম্ভবত ছিল মরুভূমির পশুপালক সেমাইট জাতি, তাই তাদের রাজাকে সুসভ্য মিশরীরা পরম অশ্রদ্ধাভরে 'রাখাল রাজা' বলে অভিহিত করতো। মিশরের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক জীবনে পরাধীনতার তিক্ত স্বাদ গ্রহণ হয়েছিল এই প্রথম, সুমের বা ব্যাবিলনের মত মিশর কখনো বর্বর কর্তৃক উপদ্রুত হয় নি।

হিকসোসদের আক্রমণ প্রসঙ্গে মিশরের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মনেথো (**Manetho**)† এইরূপ বর্ণনা দিয়েছেন : "ভগবান আমাদের ওপর কেন যে বিরূপ হয়েছিলেন তা জানি না—এই সময়ে পূর্বাঞ্চল থেকে একটা জঘন্য জাতির মানুষ বিনা যুদ্ধে অদ্ভুত কৌশলে এ-দেশ দখল করেছিল। আমাদের শাসকদের পরাভূত করে নগর দগ্ধ করেছিল তারা, মন্দির বিধ্বস্ত করেছিল, বর্বরের মত অধিবাসীদের হত্যা করেছিল, তাদের পত্নী ও সন্তানদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে একজনকে তারা রাজপদে অভিষিক্ত করেছিল, তার নাম সালাটিস (Salatis)। তিনি থাকতেন মেমফিসে, দেশের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় অংশই তার করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।...আভারিস (Avaris) নামক একটি প্রাচীন নগরকে পুনর্নির্মাণ করে তার সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে দুই লক্ষ চল্লিশ সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য স্থাপন করেছিলেন তিনি।" বিনাযুদ্ধে

---

* প্রখ্যাত ইতিহাস-তত্ত্ববিদ আরনল্ড টয়েনবির সিদ্ধান্ত এই যে হিকসোরা মূলত আর্য-জাতি, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া অতিক্রম করে আসবার সময় তাদের সঙ্গে অন্যান্য দুর্ধর্ষ জাতিও মিশে গিয়েছিল। ব্যাবিলোনিয়ার ক্যাসাইট ও মিটানির শাসকদের তিনি সম্ভবত এই আর্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন : "While some Aryas crossed the Hindu-Kush into India, others made their way across Iran and Iraq to Syria and thence overran Egypt to wards the beginning of the 17th B.C.

The Hyksos, as the Egyptians called these barbarous warlords, ruled an empire embracing Egypt and Syria and perhaps Mesopotamia as well." (Toynbee's study of History, Vol. I pp. 105)

† মনেথো ছিলেন একজন বিদ্বান পুরোহিত। মিশরে ফারাওর সিংহাসনে যখন গ্রীক রাজা টোলেমি ফিলেডেলফস (Ptolemy Philadelphos) অধিষ্ঠিত, তখন তিনি সেই দেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করে গ্রীক ভাষায় তর্জমার ভার দিয়েছিলেন মনেথোর ওপর। মনেথো যে ইতিহাসটি রচনা করেছিলেন তার অনেক অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে।

অদ্ভুত কৌশলে হিকসোসরা এমন অকস্মাৎ দেশকে দ্রুত অধিকার করতে পেরেছিল, তার কারণ জাতীয় অনৈক্য ও দুর্বলতা। তা ছাড়া, হিকসোসরা নূতন যুদ্ধ উপকরণ নিয়ে এসেছিল, অশ্বচালিত রথই সেই উপকরণ। ব্যাবিলোনিয়ায় যুদ্ধরথ ছিল গর্দভ-চালিত—মিশরে গর্দভ ছিল, রথ ছিল না। মিশরে বা ব্যাবিলোনিয়ায় অশ্বপালনও আরম্ভ হয় নি তখনো। হিকসোসদের দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথগুলিকে বাধা দেবার মত যুদ্ধ উপকরণ মিশরের ছিল না, মিশর-জয় অমন সহজে হয়েছিল সেই কারণে। সম্ভবত খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে অশ্ব আমদানি করা হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ায় ইরানের পার্বত্যাঞ্চল অথবা মধ্য এশিয়ার তৃণাচ্ছন্ন সমতলভূমি (Steppes) থেকে। হয়ত বা ইরানেই প্রথম সুরু হয় রথে গাধার পরিবর্তে অশ্বের যোজনা। একটি বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, হিকসোসদের মিশর আক্রমণের সমকালেই ক্যাসাইটরা (Kassites) ব্যাবিলনকে পর্যুদস্ত আর আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। এরা সকলেই ছিল বর্বর জাতি। সে-যুগে বর্বরতার সাগরমধ্যে সভ্য ভূখণ্ডগুলি ছিল ছোট ছোট দ্বীপের মত, চারদিকে বুভুক্ষিতের দল। শিকারী বা মেষপালক তারা, সুযোগ পেলে শস্যশ্যামল ভূমির ওপর হানা দিতে ছাড়ে নি।

হিকসোসরা সমগ্র মিশরদেশ এক হিড়িকে অধিকার করেছিল বটে, কিন্তু প্রভুত্বকে দীর্ঘকাল বজায় রাখতে পারেনি। সেমেটিক জাতি তারা, আর তাদেরই জাতির একজন স্বনামধন্য রাজা হামুরাবি ব্যাবিলোনিয়া শাসন করেছিলেন মহা গৌরবে মাত্র কিছু কাল আগে। কিন্তু হামুরাবির শাসন আর হিকসোসদের আধিপত্যের মধ্যে বিরাট প্রভেদ এই যে, ব্যাবিলোনিয়ায় সেমাইটরা একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে সুব্যবস্থা দ্বারা সভ্যতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন, আর ক্রূর-স্বভাব বিজাতীয় হিকসোসরা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সমুখে এনে উপস্থিত করেছিল একটি চ্যালেঞ্জ, তার যথাযথ উত্তর দিতে মিশরের সংক্ষুব্ধ জাতীয় অভিমান বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। থিবিস নগরকে কেন্দ্র করে যে-রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল, দক্ষিণ মিশরের সেই রাজ্যে হিকসোসদের প্রতি বিরোধিতা বরাবর বিদ্যমান ছিল, তাই নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও থিবিস জাতীয় সভ্যতার ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরবার প্রয়াস থেকে বিরত হয় নি। মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আর সেই সংগ্রাম চলেছিল পঁয়তাল্লিশ বছর। পরিশেষে থিবিসের রাজা আহমিস (Aahmes) হিকসোসদের সমগ্র মিশরভূমি থেকে

বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন (১৫৮০ খৃঃ পূঃ)। মিশরের এই মুক্তিদাতা মহাবীর অষ্টাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা—তিনি ছিলেন উনিশ কুড়ি বছরের যুবক। ইতিহাসের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়তিলক ললাটে ধারণ করেছিলেন তিনি, সেজন্য তার নাম চিরস্মরণীয়।

মুক্তি সংগ্রামে সমগ্র মিশর ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল 'ভবঘুরে'-দের বিতাড়িত করবার জন্য, যে-ভবঘুরের দল মিশরকে শাসন করবার স্পর্ধা করেছে "রা'কে না জেনে" (in ignorance of Re)। মিশরীদের জাতীয় চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তারা তখন বিদেশীদের বহিষ্কৃত করেই ক্ষান্ত হল না, পশ্চাদ্ধাবন করে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড গ্রাস করে বসেছিল এই ওজুহাতে যে ঐ সব দেশকে মিশর অধিকার না করলে মিশরকেই তারা অধিকার করে বসবে। এইরূপে মিশরে যে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব হয়েছিল সে এক অভিনব বস্তু, কেন না মিশরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনো পররাজ্য গ্রাসের প্রবৃত্তি দেখা যায় নি। আহমোসের নেতৃত্বে বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়েছিল, যুদ্ধ বিগ্রহ অভিযানের ব্যবস্থা প্রশাসনকে প্রভাবিত করেছিল, ক্রমে মিশর একটি শক্তিশালী সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হল।

হিকসোস অধিকার ছিল মিশরের জাতীয় লাঞ্ছনা, সেজন্য হিকসোসদের সকল চিহ্ন এমনভাবেই মুছে ফেলা হয়েছিল যে তাদের বিষয়ে কোন তথ্য আবিষ্কার সম্ভব হয় নি। তবে আমাদের এ-কথা মনে করবার কারণ আছে যে হিকসোস নৃপতিরা মিশরীয় রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে সভ্যতার ধারা পূর্বপর অব্যাহত থেকে গিয়েছিল। জনশ্রুতি অবলম্বনে মনেথো তিনটি রাখাল-রাজ বংশের উল্লেখ করেছেন, পঞ্চদশ ষোড়শ ও সপ্তদশ রাজবংশই এই বংশত্রয়। কিন্তু দ্বাদশ বংশের পর মাত্র দু' শো বছরের মধ্যে এতগুলি বংশের উত্থান পতন সম্ভবপর কিনা তা বিবেচনার বিষয়।

৭

সাম্রাজ্যের প্রথম পর্ব ঃ মধ্যাহ্ন শিখরে মিশর

মিশরকে মর্মান্তিক অধীনতা থেকে মুক্ত করে উর্ধ্বাংশ ও নিম্নাংশ দুই ভূখণ্ডকে সংযুক্ত করা একটি অভাবনীয় ব্যাপার, এবং এমন অঘটন কাণ্ড ঘটেছিল বলেই পট-পরিবর্তনের সঙ্গে নীল নদীর উপত্যকায় নূতন উদ্যম নূতন সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। পঞ্চদশ খৃস্ট পূর্বাব্দের অনেক কীর্তির স্মৃতিচিহ্ন বা লিখিত বিবরণ উদ্ধার করা হয়েছে, অষ্টাদশ রাজবংশীদের ক্রিয়াকলাপ অভিযান প্রভৃতির ওপর বিলক্ষণ রশ্মিপাত করেছে সেই সব চিহ্ন ও বিবরণ, সেজন্য সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সুপ্রচুর, এত অধিক জ্ঞান অন্য কোন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে নেই বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। সাম্রাজ্যযুগের চিত্রাঙ্কন, লিখিত বিবরণ প্রভৃতি থেকে আমরা জানতে পারি, মিশরী রাজারা অশ্বচালিত যুদ্ধরথ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন, এবং দুর্ধর্ষ বাহিনী গঠন করে শুধু যে শত্রুর আক্রমণ থেকে মিশরকে রক্ষা করেছেন তা নয়, প্যালেস্টাইন সিরিয়া কারকেমিস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালিয়েছেন। দিগ্বিজয় করে' প্রচুর লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যসম্ভার সহ বিজয়ীর গর্ব নিয়ে ফিরে এসেছেন তারা থিবিস নগরে, রাজধানীকে নানা শিল্প-সজ্জায় ভূষিত করেছেন। এই সব শিল্পবস্তুর প্রভূত নিদর্শন কারনাক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এশিয়ায় মিশরীদের অভিযান নূতন নয়। ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে তাম্রের জন্য সিনাই উপদ্বীপে, স্বর্ণের জন্য নিউবিয়ায়, পাথরের জন্য হামমাট অঞ্চলে অভিযান পাঠানো হয়েছে, এমন কি প্যালেস্টাইনের সমুদ্রতীরে ফিনিসিয়ায় ও পুনটে নৌ অভিযানের দৃশ্যও দেখা গেছে। সেই অভিযানগুলি ছিল বাণিজ্যিক। বাণিজ্য ছিল ফারাওদের একচেটিয়া কারবার, সেজন্য অভিযান পাঠাতেন তাঁরা কাঁচা মাল ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। পূর্বকালের ফারাওরা রাজ্য বিস্তারে মন দেন নি, পক্ষান্তরে অষ্টাদশ রাজবংশীদের প্রধান রাজনীতি হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ। বিপুল বাহিনীর অধীশ্বর ছিলেন তাঁরা, ভারি ভারি যুদ্ধরথ ছিল তাঁদের, আর ছিল তীরন্দাজ সৈন্য। সাম্রাজ্যের ফারাওরা নিজেরা ছিলেন দুর্ধর্ষ

সেনানায়ক, মহাপরাক্রান্ত সামরিক শক্তির প্রভাবেই তাঁরা এশিয়ার ইউক্রেটিস নদীতীর থেকে আফ্রিকার নীলনদীর চতুর্থ প্রপাত পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন। অধিকৃত অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সে-দেশকে মিশরের কর্তৃত্বাধীনে রাখবার ব্যবস্থা বেশ পাকাপাকি রকমে করা হয়েছিল। তৃতীয় থাটমোসের (Thutmose III) নৌ অভিযানের ফলে সম্ভবত এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ মিশরের অধিকারে এসে পড়েছিল, এবং সেই দ্বীপের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিল একজন মিশরী সেনাপতি। ফারাও তাকে একটি স্বর্ণপাত্র উপহার দিয়েছিলেন, সেই পাত্রের উপর খোদিত রয়েছে সেনাপতির এই পদবী : "সমুদ্রমধ্যের দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্তা"। অবশ্য এই কথাগুলি শুধু এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জকেই বোঝায় না, এশিয়া মাইনরের সমুদ্র উপকূলকেও বোঝাতে পারে। সিরিয়াদেশে মিশরীয় প্রভুত্ব কিরূপ চেপে বসেছিল তার বেশ আভাস পাওয়া যায় জনৈক সিরিয়ান নৃপতির চাটুবাক্যের মধ্যে। এই রাজার কাছে এসেছিলেন একজন মিশরী রাজদূত। তাকে সম্বোধন করে এই তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটি করেছেন রাজা : "সকল দেশেরই প্রতিষ্ঠাতা আমন-দেব (সাম্রাজ্যদেবতা), কিন্তু সর্বাগ্রে তিনি মিশরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমার দেশ সিরিয়ায় কর্মদক্ষতা এসেছিল মিশর থেকে, শিক্ষাও লাভ করেছি আমরা সে-দেশ থেকে।" কথাটা যে নিছক অতিশয়োক্তি তা বলাই বাহুল্য, কেননা ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সিরিয়ার সংযোগ আরও দীর্ঘকালের ও ঘনিষ্ঠতর। ফারাওর মনস্তুষ্টির জন্যই যে ও-রকম কথা বলেছিলেন সিরিয়ার রাজা, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

নবযুগের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পুরানো অনেক জিনিস সেখানে দেখা যায় বটে, কিন্তু পরিবর্তনও ঘটেছিল যথেষ্ট। ফারাও শুধু রাষ্ট্রের প্রধান নন, তিনি ছিলেন 'রে-পুত্র', তাই চিরকাল তাঁকে জনসমাজ থেকে দূরে থাকতে হত। কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য এখন যেমন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে সুরু করলেন, প্রশাসন ব্যাপারেও তেমনি তাঁকে আগের চেয়ে অনেক বেশি অংশ সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল। রাজ্যের কর্মভার প্রধানত ন্যস্ত ছিল উজিরের ওপর, প্রতিদিন প্রভাতে ফারাও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে উজিরের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আর একজন কর্মচারী ছিলেন প্রধান কোষাধ্যক্ষ, তাঁর সঙ্গে ফারাওর চলতো অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা। অর্থ

বিভাগ ও বিচার বিভাগই ছিল সরকারের প্রধান দুটি দপ্তর, সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিলেন ফারাও স্বয়ং। অপরাধীর দণ্ডের নির্দেশ দিতেন তিনি, বিচারের কাগজপত্র পরীক্ষা করে বিচারান্তে বিচারক তাঁরই কাছে সেই কাগজপত্র প্রেরণ করতেন। ফারাও নানান স্থানে খনি এবং নির্মাণকার্য পরিদর্শন করতেন, এমন কি সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়েও অনুসন্ধান করতেন। প্রাচীন রাজ্যে উজির ছিলেন মাত্র একজন, অষ্টাদশ বংশীদের আমলে রাজকার্য বৃদ্ধির দরুণ দুইজন উজির নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথম উজির থাকতেন দক্ষিণাঞ্চলের থিবিস নগরে, দ্বিতীয় উজির উত্তরাংশের প্রধান নগর হেলিওপলিসে থেকে কাজ করতেন। সমগ্র দেশ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলায় বিভক্ত, যেমন ছিল প্রাচীন রাজ্যের আমলে, জেলার সংখ্যা ছিল সম্ভবত চৌত্রিশটি। জেলা-শাসকেরা পূর্বের মতই 'কাউন্ট' উপাধি ধারণ করতো বটে, কিন্তু তাদের কাজ এখন কর আদায় ও বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

আমরা দেখেছি প্রাচীন রাজ্যের সময়ে এই সব জেলাপতিরাই ছিলেন ইজারাদার এবং পরে তারা এক একজন সামন্ত হয়ে উঠেছিলেন। সাম্রাজ্য-যুগে এই সামন্ত-প্রথা আর ছিল না, ভূমির মালিক হয়েছিলেন রাজা স্বয়ং। কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে রাজার চাষী-ভৃত্যরাই (Serfs) কৃষিকার্য করতো, অথবা ফারাও তাঁর আত্মীয়বর্গ ও অনুগত ব্যক্তিদের ভূমিকর্ষণের ইজারা প্রদান করতেন। তা ছাড়া কৃষক প্রজাদের ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষের জমি। ইজারাদার ও কৃষকদের ভূমির ক্রয়বিক্রয় স্বত্ব ছিল আইন-সিদ্ধ। মন্দিরের সম্পত্তি ভিন্ন সকলেরই বিষয়-আশয় সরকারি রেজিস্টারিভুক্ত করে ট্যাক্স ধার্য করা হত। পূর্বের মত এখনো ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য পশু মদ্য মধু বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য কর রূপে আদায়ের এবং সেগুলি সরকারি গুদামে রাখবার ব্যবস্থা ছিল। ফারাওর প্রাসাদ ও আপিসকে বলা হত 'শ্বেত গৃহ' (White House), আপিসের একটি প্রধান বিভাগের ওপর গুদাম ও গুদাম-স্থিত দ্রব্যাদি রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। সাধারণত ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল ক্ষেত্রজাত শস্যের এক-পঞ্চমাংশ, সেই ট্যাক্স আদায় করতো স্থানীয় কর্মচারীরা, আর হিসাব রাখতো লেখকের দল। আমরা দেখেছি, এ-সব ব্যবস্থা বিগত কালেও ছিল, এখন কিন্তু কর্মচারী ও লেখকের সংখ্যা বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তাদের কাজও অধিকতর জটিল আকার ধারণ করেছিল। পূর্বোক্ত ট্যাক্সসমূহ ছাড়াও আর

এক রকমের কর ধার্য করা হয়েছিল, সেই কর ধরা হত রাজকর্মচারীদের ওপর। কাজে বহাল থাকবার মূল্যস্বরূপ কর্মচারীরা প্রতি বছর নির্ধারিত পরিমাণ সোনা রূপো শস্য পশু ও বস্ত্র সরকারকে দিত। একটি প্রাচীন শহরের মেয়র নিজে দিতেন প্রতি বছর ৫৬০০ গ্রেণ সোনা, ৪২০০ গ্রেণ রুপো আর একটি বলদ, এবং তার একজন অধীনস্থ কর্মচারী ট্যাক্স দিত ৪২০০ গ্রেণ রুপো, একটি সোনাদানার নেকলেস, দুটি বলদ ও দু বাক্স বস্ত্র। দেখা যায়, এই একটি স্থানের কর্মচারীদের থেকেই ২২০০০০ গ্রেণ স্বর্ণ, ৯টি সোনার নেকলেস, ১৬০০০ গ্রেণ রুপো, ৪০ বাক্স বস্ত্র, ১০৬টি পশু এবং যথেষ্ট পরিমাণ শস্য আদায় হত। সমগ্র মিশরভূমি থেকে সর্বসাকল্যে কত ট্যাক্স আদায় হত তার কোন হিসাব পাওয়া যায় নি। অষ্টাদশ বংশীদের আমলে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দক্ষিণাঞ্চলের উজির বা অমাত্যকেই বহন করতে হয়েছিল।

দক্ষিণাঞ্চলের এই অমাত্যের ওপর আর একটি গুরুভার ন্যস্ত ছিল। ধর্মাধিকরণসমূহের প্রধান রূপে বিচারকার্যেও তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে হত। পদস্থ কর্মচারীরা সকলেই আইনজ্ঞ, সকলেই ছিলেন বিচারকের আসন গ্রহণের উপযোগী, স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর বিচারক ছিল না। অমাত্যের আমদরবারেই সকল মকদ্দমার লিখিত আরজি পেশ করা হত, উত্তরাঞ্চলের আরজিগুলি তিনি হেলিওপলিসের অমাত্যের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। নির্দিষ্ট কালের মধ্যে মকদ্দমার রায় দেবার বিধান আইনে ছিল দেখা যায়। অনেকটা আধুনিক আদালতের মতই মকদ্দমার নথিপত্র রাখা হত, শুনানির ধার্য দিন আসামীর শাস্তি প্রভৃতি হুকুম সেই নথিপত্রে লেখা হত। রাজধানীতে অপরাধীর বিচার স্বয়ং উজিরই করতেন, তাঁর আপিসে উইলের নকল দাখিল না করলে উইল আইন-সিদ্ধ হত না। উজিরের আমদরবার, যাকে বলা হত 'মহা-পরিষদ' (Great Council), সেই বিচারালয়টি ছাড়াও দেশের নানান্ স্থানে ছিল ধর্মাধিকরণ, সেখানে শাসক-কর্মচারীদের নিয়ে বিচার-সংসদ গঠিত হত। মহা-পরিষদের প্রতিনিধি রূপে সেই সংসদই বিচারকার্য সম্পন্ন করতো। এরূপ স্থানীয় আদালতের সংখ্যা কত ছিল জানা যায় নি, তবে থিবিস ও মেমফিস নগরে প্রতিষ্ঠিত দুটি সংসদের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষেত্রবিশেষে এই সংসদের পারিষদ নির্বাচন করতেন উজির, কখনো বা ফারাও স্বয়ং, বিচার সংসদের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন পুরোহিত। বিচারকেরা সকলেই যে জনগণের আস্থা

অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়। একজন দরিদ্র বিচারপ্রার্থী এই বলে আক্ষেপ করেছে : "আদালতের কাছে যখন কোন দরিদ্র ব্যক্তি উপস্থিত হয় আর অপর পক্ষ হল ধনী, আদালত তখন গরীবের ওপর অত্যাচার করেন আর বলেন, লেখকদের সোনা রূপো দাও! পেয়াদাদের কাপড় দাও!" ঘুষের জোরে মামলায় জয়লাভ ধনীর পক্ষে সহজ ছিল বটে, কিন্তু সেজন্য সেকালের নিন্দা করা চলে না, আজকের প্রগতির যুগেও দুর্নীতির অভাব নেই। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করেই আইন রচিত হয়েছিল, আইনের উদ্দেশ্য ছিল সাধু। চল্লিশটি তাড়ায় লিখিত এই আইন-গ্রন্থ উজির তাঁর সামনে রেখে বিচারকার্যে প্রবৃত্ত হতেন। সেই আইন-গ্রন্থটি ধ্বংস পেয়েছে, সম্ভবত আইনগুলি ছিল প্রাচীন, দেবতার দান বলেই কল্পনা করা হত। নানা বিবরণে উজিরের পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচারে উভয়পক্ষের সন্তোষ প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। আইনের বিধান মত ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিশেষ বিবেচনা সহকারে বিচারকার্য সম্পন্ন হত, রাজদ্রোহীকে পর্যন্ত সরাসরি কোতল না করে আদালতে সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণের পর দণ্ড দেওয়া হত। সেই সুপ্রাচীন যুগে আইনের প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা সত্যই বিস্ময়কর।

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের অমাত্যই ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রবলতম শক্তিশালী পুরুষ, তাঁর মাধ্যমেই ফারাও প্রতিদিন নানান্ স্থানের অবস্থা অবগত হতেন। এই অমাত্যের কাছে বিভিন্ন স্থানের কর্তৃপক্ষ বছরে তিনবার রিপোর্ট প্রেরণ করতো, তাঁর দপ্তরটি ছিল গোটা সাম্রাজ্যের প্রশাসন কেন্দ্র, হুকুম ফরমান সবই এখান থেকে বের হত। সামরিক বিভাগ ছিল এই মন্ত্রীর অধীন, ফারাওর দেহ-রক্ষী দল তিনিই নিযুক্ত করতেন, এবং অষ্টাদশ বংশীদের আমলে ফারাও যখন সসৈন্যে অভিযানে বহির্গত হতেন তখন প্রশাসনের সম্পূর্ণ ভার থাকতো মন্ত্রীর ওপর। তা ছাড়া, রাজ্যের দেউলসমূহের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক বিভাগের পরিচালনা, সেচ, জল সরবরাহ প্রভৃতি জন-কল্যাণ ব্যবস্থার কর্তৃত্বভার দক্ষিণাঞ্চলের মন্ত্রীকেই বহন করতে হত, যতদিন পর্যন্ত না উত্তরাংশের জন্য একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছিল।

সামন্তযুগের অভিজাতশ্রেণীর ভূ-স্বামীদের বিলুপ্তির সঙ্গে যে ক্ষমতাশালী শাসক কর্মচারীর দল বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তারাই এখন মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত কুলীন সম্প্রদায় হয়ে উঠেছিলেন। পুরানো মধ্যশ্রেণীর ব্যবসায়ী কারিগর

শিল্পীদের স্থান সমাজে পূর্ববৎ ছিল। স্থূলভাবে বলতে গেলে সমাজে এখন এই কয়েকটি স্তর-বিভাগ দেখা দিয়েছিল: 'সৈনিক শ্রেণী, পুরোহিতকুল, রাজ-চাষী (royal serfs) ও কারিগরবর্গ'। সকল মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিরই যুদ্ধে যোগদানের এক প্রকার বাধ্যবাধকতা ছিল বলে তাদের সৈনিক শ্রেণী, ভারতীয় ভাষায় যাকে বলে ক্ষত্রিয়, সেই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল। এই ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠেছিল পুরোহিত প্রতিষ্ঠান। পৌরোহিত্য একটি অতিপ্রাচীন বৃত্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু সাম্রাজ্যযুগে বিদেশ থেকে আহৃত প্রভূত ধনরত্নের একটা বিরাট অংশ মন্দিরগুলিকে অর্পণ করা হয়েছিল, ফলে সেই সব মন্দিরই যে শুধু পরম সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা নয়, মন্দিরের মোহান্ত পুরোহিতকুলের ক্ষমতা অসাধারণরকমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম থাটমোসের রাজত্বকালে বিভিন্ন স্থানের দেব-মন্দিরের পূজারীদের সহযোগে একটি পুরোহিত-সঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল, সেই সংঘের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হলেন রাজধানী থিবিসের আমনদেবের প্রধান পুরোহিত। এইরূপে মিশরে পুরোহিততন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল, পরবর্তীকালে যে-পুরোহিততন্ত্র প্রতাপ-প্রবল ফারাওকেই গ্রাস করে বসেছিল। পূর্বে 'রে-পুত্র' ফারাওরা ছিলেন ধর্মগুরু, প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বময় কর্তা, এখন পুরোহিতকুলের ক্ষমতা প্রতিপত্তি অতিমাত্র বৃদ্ধিলাভের দরুণ তাদের সঙ্গে রাজশক্তির গুরুতর বিরোধ দেখা দিল। আমরা যথাকালে দেখতে পাব পুরোহিতদের বিরোধিতা ও প্রতিকূল আচরণ সাম্রাজ্যের গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল।

থিবিসের অভ্যুত্থানের পর আমন-দেবের প্রাধান্য সাম্রাজ্যযুগের ধর্মকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। মধ্যম রাজ্যের সৌর-তত্ত্বে আমন-রে'র স্থান তেমন সুপরিস্ফুট ছিল না, এখন তিনি বিপুল গরিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। মিশরে যুগে যুগে বিভিন্ন দেবতার গুণধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে, এক দেবতার গুণ আর এক দেবতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আমনের বেলায়ও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি, কিন্তু বহু-দেবতার মধ্যে সূর্যদেব তাঁর ভাস্বর দীপ্তি অম্লান রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাব, দেবতারূপে যে-সূর্যদেব আটন অন্যান্য দেবতার সঙ্গে চিরকাল পূজিত হয়ে এসেছিলেন, ইখনাটন যখন সেই আটনকে একমাত্র ঈশ্বরের প্রতীক বলে প্রচার করলেন, থিবিসের পরাক্রান্ত পুরোহিতকুল তখন তাঁর ওপর খড়্গাহস্ত হয়ে উঠেছিল, এবং তাদের সেই বিরুদ্ধাচরণের ফলেই অষ্টাদশ বংশের পতন ঘটেছিল।

পিরামিড নির্মাণের পালা শেষ হয়েছিল সামন্তযুগে, তখন বেনিহাসানের পাহাড়ে-কাটা সমাধিকক্ষে মৃতের মামিকে রাখা হত। সেই প্রথাই সাম্রাজ্যযুগে একটি বৃহৎ ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। মৃতের পারলৌকিক মঙ্গলকৃত্য মন্ত্রতন্ত্র ইন্দ্রজাল এখন এমন প্রসার লাভ করেছিল যে শিলালিপির পরিবর্তে প্যাপিরাসে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রাদি লিখে সেই তাড়াগুলি সমাধিগর্ভে মৃতের পাশে রাখা হত তার আত্মার সদ্‌গতির জন্য। এইসব প্যাপিরাসের তাড়াই যথাকালে 'মৃতের গ্রন্থ' (**Book of the Dead**) নামে একটি ধর্মপুস্তকে পরিণত হয়েছিল। পুরোহিতের লেখকেরা এই গ্রন্থটি নকল করতো আর ধনী ব্যক্তিরা সেই নকল বহু অর্থ ব্যয় করে কিনে রাখতো। 'অসিরিস মিথ' অবলম্বনে গ্রন্থটির পরিকল্পনা, উত্তরকালে অনুরূপ আরও দুটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই দুটি গ্রন্থের নাম, 'আমদুয়াত গ্রন্থ' অর্থাৎ পরলোক বা অধোজগতের বই (**Book of What is in the Nether World**) এবং 'ফটকের গ্রন্থ' (**Book of the Gates**)। আমদুয়াত গ্রন্থটি উনবিংশ ও বিংশ বংশীয় ফারাওদের সমাধিগর্ভে পাথরে খোদাই করে লেখা হয়েছিল। 'অসিরিস মিথ' আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত তিনটি গ্রন্থের পরিচয় আমরা বিশদভাবেই দেবার চেষ্টা করবো। মৃতের কাছে গ্রন্থগুলি ছাড়াও কতগুলি মূর্তি রাখা হত, সেই সব মূর্তির নাম 'উশবটি' যার পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। পিরামিডের প্রাচীরগাত্রে চাষবাসের চিত্র অঙ্কিত হত, এখন সেই চিত্রের বিকল্প ব্যবস্থা রূপে কাঠ পাথর বা মাটির মূর্তি নির্মাণ করা হত, সেগুলি 'উশবটি'।

সাম্রাজ্যযুগের রাষ্ট্র সমাজ ও ধর্মের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর আমরা এখন নৃপতিগণের কাহিনী বর্ণনা করবো।

* * *

আহমোস দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, পূর্বাঞ্চলের মরুবাসী বর্বর জাতি ট্রোগ্লোডাইটদের সঙ্গে তাঁকে বেশ কিছুকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি অষ্টাদশ বংশের প্রতিষ্ঠা করে মিশরকে পরম সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যযুগের তোরণ-দ্বারে এনে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম আমেনহটেপ (**Amenhotep I**) নিউবিয়া আক্রমণ করে বিগত মধ্যম রাজ্যের সীমান্তে দ্বিতীয় প্রপাত পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেছিলেন। হিকসোস শাসনকালে লিবিয়ানরা পশ্চিম থেকে এসে অববাহিকা অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল, আমেন-হটেপ তাদের বিতাড়িত করে লিবিয়া আক্রমণ করেন। তারপর তিনি সৈন্য-

বাহিনী নিয়ে এশিয়ায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর সিরিয়া সংগ্রামের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় নি।

আমেনহটেপের উত্তরাধিকারী প্রথম থাটমোস (Thutmose 1) সিংহাসনে অধিরোহন করেন ১৫৪৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। থাটমোসের মাতা সম্ভবত রাজবংশ-সম্ভূতা ছিলেন না, রাজবংশে বিবাহসূত্রেই তিনি সিংহাসন লাভ করেন। দিগ্বিজয়ীর খ্যাতি লাভ করেন থাটমোস, সাম্রাজ্যের সীমা ইউফ্রেটিস পর্যন্ত বিস্তার করেছেন বলে দাবী করেন। কথিত আছে, সাম্রাজ্যের প্রসার ব্যাপারে বাধা তিনি সামান্যই পেয়েছিলেন। সীমানার ওপর প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত করে বিজয়গর্বে থিবিসে ফিরে সগৌরবে ঘোষণা করেন, মিশর সাম্রাজ্য "সূর্যের পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত (as far as the circuit of the sun)"। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা ছিল সেমাইট জাতি, ক্যানানাইট ও আরামিয়ান, ধাতুশিল্পে এবং অস্ত্র ও রথ নির্মাণে সুদক্ষ। সাগরকূলের ফিনিসীয়রা ছিল নাবিকের জাতি, দূরদেশে গিয়ে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করতো। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশসমূহের সভ্যতা ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতি দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল, এখন সেখানে নীল নদীর সংস্কৃতি-ধারা এসে তার সঙ্গে মিলিত হল। মিশর ও ব্যাবিলনের প্রাচীন দুটি সভ্যতার প্রথম মিলনের সন্ধিক্ষণে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল শান্তিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার, কিন্তু পরিশেষে তাদের সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে হয়েছিল, আমরা তা পরে দেখতে পাব। সম্ভবত ইউফ্রেটিস উপত্যকার প্রতি স্বতস্ফূর্ত বিরূপতার পূর্বাভাস প্রকাশ পেয়েছিল ইউফ্রেটিস নদী বিষয়ে থাটমোসের একটি বিকৃত বর্ণনায়। ইউফ্রেটিসের বর্ণনাটি এই: সাম্রাজ্যের সীমায় রয়েছে 'সেই উল্‌টা নদী, যে-নদীর ধারা বয়ে চলেছে উজান-পথে' (The inverted Nile which runs downstream in going upstream)।

বিজিত দেশসমূহ থেকে লব্ধ কর দ্বারা থাটমোস বিধ্বস্ত মন্দিরগুলির সংস্কার-কার্যে প্রবৃত্ত হলেন। থিবিসে আমনদেবের মন্দিরের সামনে দুটি তোরণ নির্মাণ করেছিলেন প্রধান স্থপতি ইনেনি (Ineni), উভয়ের মধ্যে একটি হল-ঘর তৈরি হল, বৃহৎদ রজাগুলি ব্রঞ্জের নানান্ দেবতার স্বর্ণমূর্তি পরিশোভিত। স্তম্ভগুলি ছিল সিডার কাষ্ঠের, সেই কাঠ আনা হয়েছিল লেবানন থেকে। আবিডসের অতিপ্রাচীন জীর্ণ অসিরিস-মন্দিরকেও তিনি সংস্কার করেছিলেন, এবং সেটিকে সোনা রুপোর আসবাবপত্রে ভরে দিয়েছিলেন। সমাধি-মন্দিরে মৃত রাজার মামিকে শায়িত

করে রাখা ছিল একটি চিরাগত প্রথা, সেখানে ধনরত্নাদি দস্যু তস্করদের প্রলুব্ধ করতো। এই সব সমাধি-দস্যুদের গ্রাস হতে ঐশ্বর্য-সম্পদ রক্ষার জন্য মন্দির থেকে দূরে কোন নিভৃত গোপন স্থানে সমাধি-কক্ষ নির্মাণ করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। থাটমোস এই গোপনীয় নির্মাণকার্যের ভার সমর্পণ করেছিলেন ইনেনির ওপর। এ-সব কাজ তিনি কেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন ইনেনি লিবিয়ান পর্বতমালার সন্নিকটে দের-এল-বাহিরির সমাধি-শিলালিপিগুলিতে। স্থাপত্যে পারদর্শী একজন সুদক্ষ শিল্পীমাত্র ছিলেন না ইনেনি, তিনি ছিলেন আদর্শ রাজকর্মচারী, উপর্যুপরি চারজন ফারাওর বিশ্বস্ত প্রাজ্ঞ উপদেষ্টা। দীর্ঘ জীবনে তিনি আমেনহটেপ, দুজন থাটমোস ও হাটসেপস্থট এই চার রে-নন্দনের সেবা করবার অবিচ্ছিন্ন সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। একটি শিলালিপিতে তিনি লিখেছেন : "রানী (হাটসেপস্থট) আমাকে ভালোবাসতেন, দরবারে আমাকে যোগ্য মর্যাদা দান করতেন। আমাকে তিনি অনেক জিনিস পুরস্কার দিয়েছিলেন, প্রাসাদের সোনা-রুপো ও সুন্দর-সুন্দর দ্রব্যে আমার গৃহখানিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন।"

ত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর থাটমোস তাঁর কন্যা হাটসেপস্থটকে (**Hatshep-sut**) সিংহাসনের অংশীদার করেছিলেন।* হাটসেপস্থট বিবাহ করেছিলেন তার বৈমাত্র ভ্রাতাকে, কিন্তু তাকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখে রাজ্যশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। মিশরের ইতিহাসে একটি অভিনব ঘটনা রানী হাট-সেপস্থটের সিংহাসনে অধিরোহণ (১৫০১ খৃঃ পূঃ)। পূর্বে বলা হয়েছে, ফারাও ছিলেন 'আমন' বা 'রে'র পুত্র। রাজ্যশাসনের অধিকার কোন নারীর ছিল না। হাটসেপস্থটের শাসন সর্বসাধারণের গ্রহণীয় করে তুলবার জন্য একটি বিচিত্র জন্মকাহিনী রচনা করতে হয়েছিল। কাহিনীতে বলা হয়েছে, আমন রে-ই তাঁর যথার্থ পিতা, তিনি রাজা থাটমোসের রূপ ধরে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে

* ভাবী উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনের অংশীদার করা একটি প্রাচীন মিশরীয় প্রথা। বৃদ্ধকালে তৃতীয় সিসোস্ট্রেস তাঁর পুত্রকে অংশীদার করেছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক প্রথম থাটমোসের রাজত্বের শেষ ভাগের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। সম্ভবত তখন কোন গোলযোগ ঘটেছিল এবং তারই মধ্যে অতি অল্পকালের জন্য দ্বিতীয় থাটমোস (Thutmose II) রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর হাটসেপস্থটের রাজত্বকাল সুরু হয়। জগতের ইতিহাসে ইনিই প্রথম রাজ্যেশ্বরী।

বললেন, "আমার এই কন্যা হাটসেপসুটকে আমি তোমার গর্ভে স্থাপন করছি। সমগ্র ভূখণ্ডে সে জনহিতকর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।" দেবতার এই সুস্পষ্ট অভিপ্রায় প্রচার করে হাটসেপসুট দেশশাসনের রাজনৈতিক প্রতিবন্ধক দূর করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রজানুরঞ্জনের জন্য, হয়ত বা আত্মতৃপ্তির জন্যই তিনি পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। পুরুষবেশে কৃত্রিম দাড়ি পরে প্রজাদের সামনে উপস্থিত হতেন তিনি—স্মৃতিস্তম্ভগুলিতেও তাঁর প্রতিমূর্তি দেখানো হয়েছে গুম্ফ-শ্মশ্রুযুক্ত পুরুষরূপে। কিন্তু তাঁর এই খেয়ালখুশী যেমনই হোক, নারীসুলভ কোমলতাকে তাঁর প্রকৃতি কখনো বর্জন করেনি, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ শান্তিপ্রিয়, পরন্তু হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি। প্রজার উপর অত্যাচার না করে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন, সাম্রাজ্যের ক্ষতি না করেও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকতেন তিনি—এক কথায় প্রজার হিতসাধনের জন্য যে-সব শাসক মিশরের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি লোহিতসাগরে পাঁচটি জাহাজের একটি অভিযান পুন্ট্ বা সোমালিদেশে পাঠিয়েছিলেন দিগ্বিজয়ের জন্য নয়, বাণিজ্যের জন্য। গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকাদেশে উৎপন্ন নানান্ রকমের জিনিস নিয়ে এসেছিলেন তিনি জাহাজ বোঝাই করে'। থিবিসকে সুসজ্জিত করে তুলেছিলেন তাঁর পিতার আমলের শিল্পীশ্রেষ্ঠ ইনেনি, আর দের-এল-বাহারিতে একটি সুন্দরও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেই মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে নৌ-অভিযানের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে, পাঁচটির মধ্যে দুটি চিত্রে জাহাজের প্রতিকৃতি দেখানো হয়েছে। বর্ণনায় লেখা আছে, পুন্ট্-দেশের বিচিত্র পণ্য (**marvels of the land of Punt**) দিয়ে জাহাজ ভর্তি করা হয়েছিল, —যেমন, সুগন্ধি কাষ্ঠ, ইবনি, নানান্ রকমের গাছ, হাতীর দাঁত, এমুর নীল স্বর্ণ, গন্ধ দ্রব্য, চোখের সুরমা, বানর, কুকুর, ব্যাঘ্রচর্ম, কৃষ্ণকায় নিগ্রো প্রভৃতি। এই নৌ-অভিযানই রানীর একমাত্র কীর্তি নয়। কারনাকের সৌন্দর্য বর্ধন করেছিলেন, সেখানে দুটি স্তম্ভ বা 'ওবেলিস্ক' খাড়া করেছিলেন তিনি, প্রত্যেকটি প্রায় ১০০ ফিট উঁচু ৩৫০টন ভারি। নীল নদীর প্রথম প্রপাতের পর্বতমালা থেকে আস্ত একখণ্ড পাথর কেটে বের করে' নৌকাযোগে বয়ে আনা হয়েছিল ১৫০ মাইল দূরে থিবিস নগরে, তারও বিবরণ লেখা আছে। দশটি নৌকার একটি সারি, এমনি তিন সারিতে ত্রিশটি নৌকার ওপর ওবেলিস্ক দুটিকে চাপিয়ে দাঁড় বেয়ে ভাঁটিয়ে আনা হয়েছিল—প্রত্যেকটি নৌকায় ছিল বত্রিশ জন মাঝি, মোট

দাঁড়ের সংখ্যা ন'শো ষাট। হিরোডোটাস বলেন, চর্বি-মাখা কাঠের কড়ি ঢালু জায়গার ওপর বসিয়ে তার ওপর দিয়ে ভারি পাথর টেনে তুলতো হাজার হাজার ক্রীতদাস—সম্ভবত এমনি কোন উপায়ে ওবেলিস্ক দুটিকে যথাস্থানে পৌছানো হয়েছিল। চিরাচরিত প্রথামত রানী তাঁর কীর্তির কাহিনী সেই প্রস্তর-স্তম্ভে লিখে গিয়েছিলেন। স্তম্ভ দুটির একটি এখন আর নেই, অনেক আগেই ধ্বংস পেয়েছে। অপরটিকে রানীর স্বামী ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় থাটমোস প্রস্তরখণ্ড দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মিশরে নারীর শাসন কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভাবীকালে এ-কথা কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। কিন্তু সত্য গোপন থাকেনি, কালক্রমে বাইরের প্রস্তরাবরণ খসে পড়ে লেখাগুলি বেরিয়ে এল, চাপা ইতিহাস করলো আত্মপ্রকাশ।

নীল নদীর পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড় কেটে নিজের সমাধিমন্দির নির্মাণ করেছিলেন রানী হাটসেপস্থট। পরবর্তী ষাটজন রাজার সমাধিমন্দির পর পর সেখানে প্রস্তুত করা হয়েছিল। কালক্রমে রাজন্যবর্গের এই 'সমাধি উপত্যকা'টি (The Valley of the Kings' Tombs) মৃতের নগররূপে জীবিতের নগর থিবিসের সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ হয়েছিল।

বাইশ বছর বিচক্ষণ দক্ষতা সহকারে রাজ্যশাসন করেছিলেন রানী হাটসেপস্থট শান্তির পথ অনুসরণ করে'।* তাঁর মৃত্যুর পর (১৪৭৯ খৃঃ পূঃ) রাজা তৃতীয় থাটমোস (Thutmose III)-এর অব্যাহত যুদ্ধোদ্যম স্বর্গীয়া রানীর শান্তিপ্রিয়-

---

* রানী হাটসেপস্থট সম্বন্ধে ব্রেস্টেড বলেছেন: "Great though she was, her rule was a distinct misfortune, falling as it did at a time when Egypt's power in Asia had not been seriously tested, and Syria was only too ready to revolt." হাটসেপস্থটের রাজত্ব মিশরের একটি দুর্ভাগ্য, এ-কথা বলে পণ্ডিত-প্রবর ব্রেস্টেড রানীর প্রতি সুবিচার করেন নি। বরং সত্য বোধ করি এই যে হাটসেপস্থটের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী ফারাওরা যদি সাম্রাজ্যবাদ বর্জন করতেন তা হলে হয়ত মিশরের পক্ষে ভাবীকালের অনেক জটিল পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ত। হাটসেপস্থটের রাজত্বকালের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন স্যর ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি। তিনি বলেছেন: "Egypt developed greatly during twenty years of peace and commerce, and resources were husbanded." শান্তিপূর্ণ সহাবস্থিতিকে অসম্ভব করে তুলে উত্তরকালের ফারাওরা যে-সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রদর্শন করেছিলেন সুদূর অতীতযুগে, তার অবশ্যম্ভাবী বিপদ-সম্ভাবনার দিকে মানব-জাতির দৃষ্টি ছিল অন্ধ অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত।

তাকে যেন ব্যঙ্গই করেছিল। তৃতীয় থাটমোস সম্বন্ধে বলা হয়, প্রাচীন মিশরের দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান ছিলেন তিনি। হাটসেপস্থটের ভ্রাতুষ্পুত্র বা বৈমাত্র ভ্রাতা, তাঁর বাল্যাবস্থায়ই রানী তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের কালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র বাইশ বছর। এই তরুণ রাজাকে শক্তিহীন মনে করে সিরিয়া বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। থাটমোস তিলমাত্র বিলম্ব করলেন না, রাজ্যাভিষেকের বছরেই কানটারা ও গাজা-র মধ্য দিয়ে বিপুল বাহিনী নিয়ে চললেন, দ্রুতগতিতে প্রতিদিন বিশ মাইল অতিক্রম করে'। লেবানন পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত হার-মেগিড্ডো (**Har-Megid-do**) নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হলেন তিনি, এবং সেখানেই যুদ্ধ বাধলো। এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়ী হয়েছিলেন থাটমোস। সে আজ প্রায় ৩৪৫০ বছর আগেকার কথা, তারপর অগণিত যুদ্ধ হয়েছে হার-মোগিড্ডোর গিরিসঙ্কটে—যার জন্য যুদ্ধের ইংরেজি একটি প্রতিশব্দ এই জায়গাটির নামে হয়েছে **armegaddon.** ১৯১৮ খৃস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ জেনারেল আলেনবেরি তুর্কীদের এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানেই পরাভূত করেছিলেন।

ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহ জয় করে সগৌরবে ফিরে এলেন থাটমোস থিবিস নগরে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে। তিনি পনেরটি অভিযানে যাত্রা করেছিলেন তার ৩২ বছর (কেউ বলেন ৫৪ বছর) রাজত্বকালে, সিরিয়া ফিনিসিয়া ও প্যালেস্টাইন তার সম্পূর্ণ পদানত হয়েছিল,এমন কি সুদূর ব্যাবিলনও তাঁর শক্তির মর্যাদাস্বরূপ তাঁকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিল। তিনি যে কেবল দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তা নয়, হামুরাবির চেয়েও বিশালতর সাম্রাজ্যকে তিনি সংগঠন করেছিলেন, সর্বত্রই সৈন্যনিবাস নির্মাণ করেছিলেন এবং সুদক্ষ প্রদেশপাল নিযুক্ত করেছিলেন।* করদ রাজাদের দরবারে তাঁর প্রতিনিধি (রেসি-ডেণ্ট) সসম্মানে অভ্যর্থিত হতেন। অধীনস্থ রাজ্যগুলির প্রশাসন ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণের ভার ভ্রাম্যমান পরিদর্শকদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। দূরবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রক্ষার জন্য নৌবহরের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তিনি, নৌবহর গঠন করে নিকট-প্রাচ্য ও এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে আয়ত্বের মধ্যে

*তৃতীয় থাটমোসের দিগ্বিজয় উপলক্ষে কোন কবি একটি 'বিজয় স্তোত্র' রচনা করেছিলেন আমন রের মুখ-নিসৃত বাণীরূপে। সেই স্তোত্রের কিয়দংশ 'সাহিত্য: নীতি' বিষয়ক আলোচনার পরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

রেখেছিলেন। অধিকৃত স্থানগুলি থেকে ধনসম্পদ আহরণ করে মিশরীদের স্বচ্ছন্দ আরামে জীবনযাত্রার উপায় ও কলা-শিল্পের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন থাটমোস। নূতন একদল কারিগর শিল্পীর অভ্যুত্থান হয়েছিল যারা সারা মিশরকে মূল্যবান শিল্পবস্তু দিয়ে ভরে দিয়েছিল। তাঁর রাজত্বের দ্বিতীয় জুবিলি উৎসব উপলক্ষে কারনাকে এক জোড়া বিরাট ওবেলিস্ক নির্মাণ করা হয়েছিল, তার একটি ধ্বংস পেয়েছে, অন্যটি এখন ইস্তাম্বুলে রক্ষিত আছে। মিশরীয় রাজপ্রতিনিধি নিউবিয়া থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সোনা পশু ইবনি হস্তীদন্ত শস্য ও নিগ্রো দাস পাঠাতেন, আর এশিয়ার বন্দরগুলি থেকে জাহাজ ভরে আসতো শুধু ধন রত্ন নয়, কাতারে-কাতারে যুদ্ধবন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসদের আনা হত স্মৃতিস্তম্ভ ও মন্দির নির্মাণের জন্য। থাটমোসের সমৃদ্ধি কতকটা অনুমান করা যায় একটি বিবরণ থেকে,—তার খাজাঞ্চিখানায় না কি নয় হাজার পাউণ্ড সোনা ও রূপা ওজন করা হয়েছিল। ব্যবসাবাণিজ্যের এখন যেমন প্রসার হয়েছিল তেমনটি আগে কখনো হয় নি। দেবতা ও রাজার মহিমাকে আকাশে তুলে ধরেছিল কারনাকের নব-নির্মিত বিশাল সুউচ্চ উৎসব সৌধ (**Promenade and Festival Hall**)। চূড়ান্ত দিগ্বিজয়ের পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি শিল্পচর্চায় ও আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের দিকেই মন দিয়েছিলেন। তার প্রধান মন্ত্রী একটি শিলালিপিতে এইরূপ বলেছেন : "কোথায় কি হচ্ছে সব খবরই রাজা রাখেন, তাঁর অজ্ঞাত কিছুই নেই। জ্ঞানের দেবতা তিনি।" এতই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন থাটমোস যে লোকের বিশ্বাস জন্মেছিল, তাঁর নামাঙ্কিত মাদুলি ধারণ করলে আপদের শান্তি হয়। মিশরীদের কাছে তার নাম ভয় ও ভক্তি যুগপৎ জাগিয়ে তুলতো। পরবর্তীকালে আলেকজাণ্ডারের নামও প্রাচ্য-দেশে তেমনি ভাবেরই উদ্রেক করেছিল। মৃত্যুর পর থিবিসে রাজন্যবর্গের সমাধিক্ষেত্রে থাটমোসের মামি রাখা হয়েছিল।

থাটমোসের পর রাজা হলেন দ্বিতীয় আমেনহটেপ (**Amenhotep II**) ১৪৪৮ খৃস্ট পূর্বাব্দে। থিবিসের সমাধিমন্দিরে এখনো তার মামি রাজশয্যায় শায়িত রয়েছে। দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন মুখমণ্ডল, দৈহিক সামর্থ্য ছিল তার গর্বের বস্তু। একটি শিলালিপিতে লেখা রয়েছে : "অসীম শক্তি ধারণ করতেন তিনি বাহুদ্বয়ে। সৈনিকপুরুষই হোক, আর ক্যানানাইট অধিনায়ক বা সিরিয়ার রাজন্যবৃন্দই হোন, এদের মধ্যে কেউ তার ধনুকটিকে আনমিত করতে

পারতেন না।" বিবরণটি অর্জুনের গাণ্ডীবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গাণ্ডীবের জ্যা-যোজনা অর্জুন ভিন্ন আর কেউ করতে পারতেন না, আর সেই কোদণ্ডের টঙ্কার ছিল মেঘগর্জনের মত। অর্জুনের গাণ্ডীব আমরা কেউ চক্ষে দেখি নি, কিন্তু আমেনহটেপের এই কোদণ্ড সমাধিমন্দিরে মামির পাশেই পাওয়া গেছে, এখন সেটি কায়রো মিউজিয়মে রক্ষিত। রাজত্বের প্রথম দিকে সিরিয়ার বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তিনি, কিন্তু অকারণে যুদ্ধ করেন নি কখনো, এশিয়ার দেশ-গুলিতে অযথা হানাও দেন নি। ক্বচিৎ তার হিংস্র স্বভাব জাগরিত হয়ে উঠলে বর্বর নিষ্ঠুরতায় তিনি আসরীয়দেরও সমকক্ষ হতে পারতেন, সিরিয়ার বিদ্রোহী রাজাদের প্রতি ব্যবহারই তার প্রমাণ। সাতটি রাজাকে বন্দী করেছিলেন তিনি, জাহাজে নিয়ে এসেছিলেন তাদের বেঁধে, পা দুটি ওপর পানে আর মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে, তারপর এদের মধ্যে ছয় জনকে আমন-দেবের কাছে স্বহস্তে বলি দিয়েছিলেন। সিরিয়া থেকে বহু বন্দী বন্দিনী সহ ১৬৬০ পাউণ্ড ওজনের স্বর্ণপাত্রাদি ও এক লক্ষ পাউণ্ড ওজনের তাম্র আনা হয়েছিল।

১৪২০ খৃস্ট পূর্বাব্দে আমেনহটেপের মৃত্যু হয়। পরবর্তী রাজা চতুর্থ থাটমোস (**Thutmose IV**)-এর রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি—অবশ্য একটি ব্যাপার ছাড়া। টেল-এল-আমরনায় যে-সব পত্র পাওয়া গেছে (**Amarna Letters**) তাই থেকে জানা যায়, মিটানি আসিরিয়া ও পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাবি-লনের নৃপতিরা মিশরের ফারাওদের কাছে কন্যার বিবাহ দিয়ে কুটুম্বিতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাইতেন। মিটানির আর্য রাজা আর্ততমের (**Artatama**) কন্যাকে চতুর্থ থাটমোস বিবাহ করেছিলেন, সেই বিবাহকে একটি বিশেষ ঘটনাই বলতে হয়। এ-যেন ভারতের মোগল-সম্রাটের রাজপুত রাজকুমারীকে বিবাহ করা। তবে অসাধারণত্ব মিশরের দিক দিয়েই বেশি, যে-হেতু কোন মিশরীয় রাজা ইতিপূর্বে বিদেশিনীকে বিবাহ করেন নি।

খৃস্ট পূর্ব ১৪১২ অব্দে তৃতীয় আমেনহটেপ (**Amenhotep III**)-এর দীর্ঘ রাজত্ব আরম্ভ হল। মিশরীয় সাম্রাজ্যের গৌরব চরম শিখরে পৌঁছেছিল এই রাজার রাজত্বকালে। এই সময়কার মিশরের সঙ্গে বহির্জগতের সম্বন্ধ এবং পরবর্তীকালে মিশর যেরূপে এশিয়ার দেশগুলিকে একে একে হারাতে লাগলো, তার বিস্তারিত বিবরণ পাই আমরা মধ্য-মিশরে টেল-এল-আমরনায় যে বহু সংখ্যক লিখনযুক্ত মাটির চাকতি পাওয়া গেছে সেই

সব লিখন থেকে। এশিয়া মাইনরে বোগাজ কুই (Boghus Keui) নামক একটি স্থানেও আর্যজাতীয় মিটানিদের লিখিত প্রাচীন বিবরণ পাওয়া গেছে, তাই থেকেও মিশরের সঙ্গে সেই দেশের সম্বন্ধ বিচার করা সম্ভব হয়েছে।* 'আমারনা পত্রে'র মধ্যে যেগুলি মিটানি থেকে প্রেরিত সেগুলি সবই লিখেছেন রাজা দুশরত্ত (Dushratta) তার ভগ্নীপতি তৃতীয় আমেনহটেপকে—রানী তী (Tii) এবং চতুর্থ আমেনহটেপকে লিখিত পত্রও আছে। দুশরত্ত (দশরথ) ছিলেন মিটানির পরাক্রান্ত রাজা—একটি পত্রে জানা যায় কোন কোন বিষয়ে আসিরিয়ার ওপরও তাঁর প্রভুত্ব ছিল। আসিরিয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইস-তারকে মিশরে পাঠিয়েছিলেন তিনি বন্ধুত্বের নিদর্শন রূপে, সে-কথারও উল্লেখ আছে। মিশরের রাজা ও রানীকে অভিবাদন করে পত্র দিয়েছিলেন, এবং সেই সঙ্গে রাজাকে উপঢৌকন পাঠালেন অশ্ব সমেত একটি রথ। মিশরের রানী তাঁর ভগ্নী, তাঁকে উপহার দিলেন বক্ষের অলঙ্কার। রাজা তৃতীয় আমেনহটেপের একটি প্রস্তরমূর্তি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, মূর্তিটিতে তাঁর মানসিক শক্তি ও কমনীয়তা পরিস্ফুট—দেখে মনে হয়, স্বচ্ছন্দ আরামে শান্তির ছায়াকুঞ্জে বসবাস করেও তাঁর পিতৃপুরুষের অর্জিত বিশাল সাম্রাজ্যটিকে অটুট রাখবার মত শক্তিধারণ করতেন তিনি। টুটেনখামেনের সমাধি খননের পূর্বে এই শান্তিপ্রিয় রাজার সমৃদ্ধির কথা অল্পই জানা ছিল। লাকসারের বৃহৎ সৌধ ও সোলেবের

* বোগাজ কুই তুরস্কের বর্তমান রাজধানী আনকারা হতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে এখানে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত বিরাট নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নগরটি ছিল আনাটোলিয়ার হিটাইটদের রাজধানী। সিরিয়ার উত্তরে ক্ষুদ্র রাজ্য মিটানির শাসকেরা ছিলেন ইন্দো-আর্য জাতি। প্রতিবেশী হিটাইটদের সঙ্গে আর্যজাতীয় মিটানিদের বিরোধ বেধেছিল, বিরোধের অবসানে হিটাইট-রাজের সঙ্গে মিটানির নৃপতি দুশরত্ত বা দশরথের পুত্র মাতউরাজা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, কীলকাক্ষরে লিখিত সেই সন্ধিপত্রটি বোগাজ কুইতে উদ্ধার করা হয়েছে। খৃঃ পূঃ ১৩৮০ অব্দে সম্পাদিত সন্ধিপত্র, সেই পত্রে দেখা যায়, মিটানিদের আরাধ্য দেবতা ছিল মিত্র বরুণ ইন্দ্র নাসত্য, মিটানি-রাজ সন্ধি করেছিলেন তাদের নামে শপথ করে। সকলেই তারা বৈদিক দেবতা। মিটানির শাসকদের নাম ও ভাষার সঙ্গে, তাঁদের ধর্মের সঙ্গে বৈদিক যুগের বিশেষত ঋগবেদের কালের ভাষা ও ধর্মের আশ্চর্যরকমের সাদৃশ্য ভারতে আর্যজাতির আগমনের ওপর বিলক্ষণ রশ্মিপাত করেছে। বস্তুত চতুর্দশ খৃষ্ট পূর্বাব্দের এই সন্ধিপত্রটি বৈদিকযুগের কাল-নিরূপণ ব্যাপারে একটি আলোক স্তম্ভ বিশেষ। (Stewart Piggot লিখিত Pre-historic India দ্রষ্টব্য।)

মন্দিরে এ-কালের স্থাপত্যের পরিকল্পনায় বিরাটত্বের মহিমা ও সৌষ্ঠব সুপরিস্ফুট। রাজধানীতে রাজার সমাধি মন্দিরটিও যে শিল্প-গৌরবে অন্যান্য মন্দিরের সমকক্ষ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় রামেসিস সেই সৌধটি ধ্বংস করে 'রেমেসিয়াম' (**Ramesseum**) নামে নিজের একটি সমাধিমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে এখন আমেনহটেপের স্মৃতিস্বরূপ আছে দুইটি 'কলোসাস' (Colossus)—অর্থাৎ সত্তর ফুট উচ্চ অতি বৃহৎ দুইটি প্রস্তরমূর্তি। নানা পরিবর্তনের মাঝেও নির্বিকার মূর্তিদ্বয় শ্যামল শস্যক্ষেত্রের পানে চেয়ে জল-প্লাবনের ঊর্ধ্বে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাম্রাজ্যেব অতীত কীর্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এই রাজার ঐশ্বর্য ও বৈভবের বিবরণ এখন সম্পূর্ণ-ভাবেই সমর্থিত হয়েছে টুটেনখামেনের সমাধি-গর্ভে যে-সব নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে তাই থেকে। আমেনহটেপের রাজত্বকালে থিবিস ছিল একটি মহানগরী, ব্যবসায়ীর ভিড়ের দরুণ পথ জনাকীর্ণ, সারা বিশ্বের পণ্যে বিপনী পরিপূর্ণ। সৌধগুলির জাঁক-জমক 'কি পুরাতন কি আধুনিক, সকল নগরীব হর্ম্যরাজির মহিমাকে অতিক্রম করেছিল (**surpassing in magnificence ali those of ancient or modern capitals**)'। বিরাট কারুখচিত স্বর্ণমন্দির, সুরম্য প্রাসাদ, কৃত্রিম হ্রদ, লতাবিতান—রোমান সাম্রাজ্যসম্ভোগের অগ্রণী রূপেই দেখা যায় ভোগবিলাসের এই আধার ও উপকরণগুলিকে। এমনি ছিল মিশরের অতুলনীয় সমৃদ্ধি পতনের পূর্বকালে।

সাম্রাজ্য তখন ২০০ বছর পুরানো, খৃঃ পূঃ ১৩৮০ অব্দে তৃতীয় আমেন-হটেপের পুত্র চতুর্থ আমেনহটেপ (**Amenhotep IV**) সিংহাসনে অধিরোহন করেন। ইনিই ইতিহাসে ইখনাটন (**Ikhnaton**) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধি অসাধারণ রকমের। এমন নয় যে তিনি পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণকারী একজন মহাবীর রূপে প্রখ্যাত। তাঁর গুণধর্ম পিতৃগণের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যোদ্ধা ছিলেন না, ছিলেন ধর্মপ্রবর্তক—কবি। টেল-এল-আমরনায় তাঁর একখানি চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। নারীর মত পেলব, কমনীয় মুখচ্ছবি, চোখদুটি স্বপ্নময়—কল্পনা-বিলাসী কবি-চিত্তের সূক্ষ্ম আবেগ চাঞ্চল্য প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে। শীর্ণকায় তরুণ যুবক, ভাবপ্রবণ—মনে হয় রবীন্দ্র-নাথের 'পুরস্কার' কবিতার কবিকেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মিশরের রাজ-সিংহাসনে!

ইখনাটনের মাতা ছিলেন সিরিয়া দেশের একটি সুন্দরী নারী। ফারাও-বংশের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ নেই এমন নারীকে বিবাহ করে' রাজা তৃতীয় আমেনহটেপ পুরোহিতকুলের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। অধ্যাপক মেসপারো বলেন যে রানী তী পুরোহিতদের বিরুদ্ধাচরণে ক্রুদ্ধা হয়েছিলেন এবং সেই থেকেই রাজপরিবারের সঙ্গে পুরোহিতকুলের বিবাদ সুরু হয়েছিল। মাতার শিক্ষার প্রভাবেই বোধ করি, বয়সে কিশোর হয়েও ইখনাটন আমনদেবের ধর্ম ও পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহসী হয়েছিলেন। প্রতাপ-প্রবল মহাবীর তৃতীয় থাটমোস বিভিন্ন প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজারীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী পুরোহিত সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন, সঙ্ঘের শীর্ষে ছিলেন থিবিসের আমনদেবের প্রধান পুরোহিত, ইখনাটনের ধর্মনীতির লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল সেই সঙ্ঘটিকে ভেঙে দিয়ে পুরোহিত-তন্ত্রের বিলোপ এবং সেই সঙ্গে আমন-পূজার উচ্ছেদ সাধন। আমনদেবের মন্দির ব্যভিচারের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। দেবসেবার জন্য অন্তঃপুরে অনেক নারী ছিল, তারা দেবদাসী—আসলে পূজারীদের উপভোগ্যা। তরুণ সম্রাট নারীর গণিকাবৃত্তি, পুরোহিতের ব্যভিচার, দেব-মন্দিরে পশুবলি, ধর্মের নামে এইসব অনাচার বন্ধ করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। পুরোহিতদের মন্ত্রতন্ত্র ইন্দ্রজাল ঘৃণা করতেন তিনি। রাজনৈতিক দুর্নীতির সমর্থনে আমনদেবের ভবিষ্যদ্বাণী (oracles) কৌশলে ঘোষণা করা পুরোহিতদের একটি লাভজনক কারবার হয়ে উঠেছিল। সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কুহেলী দিয়ে ইখনাটন তাঁর ধর্মবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে দেন নি। পরন্তু ধর্মের কদর্য অধঃপতন দেখে তার অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়েছিল। মন্দিরে ধনদৌলতের কুৎসিত আড়ম্বর, বিপুল অনুষ্ঠানের ঠাট, অর্থগৃধ্নু পূজারীদলের জাতীয় জীবনের ওপর প্রভুত্ব—এ সব তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁর কবি-মানস বিশ্বস্রষ্টা, সর্বভূতের মূলকারণ ও আশ্রয়স্বরূপ একমাত্র পরমেশ্বরের কল্পনা করেছিল, যার বাহিরের প্রকাশ, ভাস্বর সূর্য বা 'আটন' (Aton) আর তাঁর জীবনদায়িনী দীপ্তির মধ্যে। তাঁর এই একেশ্বরবাদের পরিকল্পনাটি জোর করেই দেশের ওপর চাপিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন তিনি। অন্যান্য দেবদেবীর পূজাকে বাতিল করে ঈশ্বরের একমাত্র প্রতীক সূর্যদেব আটনের উপাসনার প্রবর্তন করলেন তিনি। একেশ্বরবাদ মিশরীয় ধর্মের ইতিহাসে একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিস, এবং এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ যে নূতন চিন্তাধারাকে মানুষের মন সহজে গ্রহণ করতে চায় না

ভাবোন্মাদ অদূরদর্শী রাজা তাঁর ধর্মমত দেশবাসীর গ্রহণীয় করবার অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করলেন না। এ-কথাও বুঝলেন না যে ধর্মবিশ্বাসের মূল্য আপেক্ষিক, আর সে-মূল্য যাচাই করবার একমাত্র মানদণ্ড জাতীয় চেতনা ও প্রজ্ঞা। বুঝলেন না যে, চেতনাকে উদ্বুদ্ধ না করে বিশ্বাসের মূলে আঘাত, ঐতিহ্যের উচ্ছেদ অত্যন্ত বিপদজনক। কিন্তু ধর্মান্ধতা তার বিচার বুদ্ধিকে রেখেছিল আচ্ছন্ন করে। আদেশ দিলেন তিনি, সাম্রাজ্য মধ্যে একমাত্র আটনদেবের পূজাই চলবে, অন্য দেবতার আরাধনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চিরাচরিত ধর্মকে আঘাত করলেন তিনি—দেবদেবীর মন্দির বন্ধ করে দিয়ে, পুরোহিতদের পথে দাঁড় করিয়ে। শুধু তাই নয়, মন্দিরে দেবতাদের নামাঙ্কিত পাথর ঘষে-মেজে লেখাগুলিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন, যেন এই সব প্রাচীন দেবতাদের নাম জাতীয় স্মৃতিপট থেকে মুছে যায়। বিশেষ করে—আমন-দেবের নাম, যা তিনি ঘৃণা করতেন সব চেয়ে বেশি—সেই নাম যুক্ত ছিল তাঁর পিতার নাম 'আমেনহটেপে'র সঙ্গে। তাঁর নিজের নামও ছিল 'আমেনহটেপ'—অর্থ, 'আমন বিশ্রাম করেন' (**Amon rests**)। সর্বত্রই পিতার নাম মুছে ফেলে দিলেন তিনি, আর নিজের নাম পরিবর্তন করে নূতন নামকরণ করলেন 'ইখনাটন' (**Ikhnaton**), অর্থ—'সূর্যদেব আটন প্রীত হয়েছেন' (**Aton the sun-god is satisfied**)।

ইখনাটনের একেশ্বরবাদী ধর্ম, বিখ্যাত 'আটন-স্তোত্রে' অনুপম কবিত্বের বিকাশ—এ-সব প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা আমরা পরে করবো। এখানে তরুণ রাজার কর্ম ও কর্মফলের কথাই বলা হবে। পূর্বপুরুষের কীর্তিমুখর প্রতিষ্ঠা-সমুজ্জ্বল সমৃদ্ধ নগর থিবিস। এ-হেন প্রাচীন রাজধানীকে পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি—কেন? শহরটিকে কি তিনি পাপ-পঙ্কিল মনে করেছিলেন? না, পুরোহিত-কুলের বিরুদ্ধাচরণে সেখানকার শাসনকার্য তাঁর পক্ষে দুরূহ, হয়ত বা জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠেছিল? সে যাই হোক, নদীর ভাটি-পথে একটি স্থানে 'আখেটেটন' (**Akheteton**) নামে একটি সুন্দর রাজধানী স্থাপন করলেন তিনি। 'আখেটেটন' শব্দের অর্থ—'আটনের চক্রবাল' (**Horizon of Aton**)। এখন যেখানে টেল-এল-আমরনা নামে একটি গ্রাম রয়েছে, আখেটেটন সেখানেই অবস্থিত ছিল। রাজধানী অপসারণের ফলে থিবিসের দ্রুত পতন ঘটেছিল, এবং সেই সঙ্গে নূতন নগর আখেটেটন ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। গৃহনির্মাণ চলতে লাগলো সেখানে এবং কলা-শিল্পের পুনর্জাগরণ দেখা

দিল। পুরোহিতের কবল থেকে মুক্ত, বাধাবন্ধনহীন নবধর্ম শিল্পীর মনেও নির্মল আনন্দধারা প্রবাহিত করেছিল, নবসৃষ্টির নিদর্শনগুলিতে আমরা তার পরিচয় পাই। স্যর উইলিয়াম পেট্রি এখানে একটি বাঁধানো স্থান খুঁড়ে বের করেছেন। পশু পক্ষী মাছ প্রভৃতির চিত্রে স্থানটি সুশোভিত। এমনই সুন্দর ছবিগুলি—খুঁটিনাটির অঙ্কনৈপুণ্য ও পরিপূর্ণ সৌষ্ঠবকে অতিক্রম করতে কোন দেশের কোন যুগের চিত্রশিল্প পেরেছে কিনা সন্দেহ।

ইখনাটনের রাজধানীর পতন ঘটেছিল তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে, থিবিস নগর তখন আবার জেঁকে উঠেছিল রাজধানী রূপে। এইরূপে আখেটেটন নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস পেয়েছিল, কিন্তু তার সেই মৃত্যুর নীচেই চাপা ছিল অমরত্ব। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করেছেন কত গৃহের কত প্রাসাদের প্রাচীর—একজন ভাস্করের কর্মশালাও আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে পাওয়া গেছে কতকগুলি সুন্দর প্রস্তরশিল্পের নমুনা, যা তখনকার ভাস্কর্যের ওপর প্রভূত আলোকপাত করে। নগরের বাইরে রাজার অনুচরদের সমাধি আছে, সেখানেও স্থাপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান। গুহাপ্রাচীরের গায়ে খোদাই করা নগর-জীবনের দৃশ্যগুলি বিস্মৃত রাজধানীকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

আমরনার গুহায় সমাধিমন্দিরের গায়ে ইখনাটনের স্বরচিত আটন-স্তোত্রগুলি (Aton Hymns) এখনো আমরা পাঠ করতে পারি। আমরনায় আর একটি আশ্চর্য আবিষ্কার—তিন শো'রও বেশি পত্র পাওয়া গেছে রাজপ্রাসাদের সরকারি মহাফেজখানায়। পত্রগুলি 'আমরনা পত্র' নামে খ্যাত। তিন হাজার বছর অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়েছিল এই পত্রাবলী। অধিকাংশই 'কিউনিফরমে' লেখা ব্যাবিলোনীয় পদ্ধতি-মত মাটির চাকতির ওপর, মিটানির রাজা দুশরত্ত'র লিখিত পত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। তেমনি পশ্চিম এশিয়ার রাজাদের লিখিত আরও পত্র পাওয়া গেছে যেমন, ব্যাবিলনের ক্যাসাইট রাজা বুরনা বুরাইশের (Burna Buraish) একখানি পত্র। তিনি লিখেছেন ইখনাটনকে অনুযোগ করে যে, আসিরিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকার করে তার রাজদূতের অভ্যর্থনা করাটা ভুল হয়েছে মিশরের। কেন না, আসিরিয়া ব্যাবিলনের অধীন। এই দম্ভোক্তি সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং মিশরের নৃপতিকে মূল্যবান পাথর (lapis lazuli) এবং পাঁচটি অশ্ব ও পাঁচটি কাষ্ঠনির্মিত রথ উপহার পাঠিয়েছিলেন। এই আমরনা পত্রগুলিতেই হিব্রুদের নামের উল্লেখ

সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। জগতের প্রাচীনতম আন্তর্জাতিক চিঠি পত্র (Oldest international correspondence of the world)-রূপে এই পত্রাবলীর একটি বিশেষ মর্যাদা, এমন কি আভিজাত্যও আছে। তা ছাড়া ইখনাটনের রাজত্বকালে এশিয়ার অধীনস্থ রাজ্যগুলি কেমন করে খসে পড়েছিল তার বিলক্ষণ আভাসও পাওয়া যায় এই পত্রগুলি থেকে।

আদর্শবাদী কল্পনা-বিলাসী রাজা যখন তার নবধর্ম ও শিল্পচর্চা নিয়ে গভীর-ভাবে মগ্ন, তখন পশ্চিম এশিয়ার উত্তরদিকে অধীন রাজ্যগুলির ওপর হিটাইট (Hittite)-দের হানা সুরু হয়ে গিয়েছিল। সেখানে উঠলো 'পরিত্রাহি' শব্দ, সকলেই আকুলভাবে সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করলে। নির্যাতিত টিউনিপের (Tunip) অধিবাসীদের তখন মনে পড়লো অতীতকালের দুর্ধর্ষ পরাক্রান্ত সম্রাট তৃতীয় থাটমোসের কথা। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তারা বললে, "কার সাধ্য ছিল টিউনিপকে লুণ্ঠন করে সেই প্রাচীনকালে? থাটমোস শাস্তি দিতেন লুণ্ঠনকারীর দেশ লুণ্ঠন করে।" ইখনাটন বিপন্ন রাজ্যের সাহায্যে সামরিক অভিযান প্রেরণ করলেন না—সম্ভবত এই কারণে যে, এশিয়ার রাজ্যগুলিকে পরাধীন করে রাখবার অধিকার মিশরের নেই, এবং দূর বিদেশে মিশরীয় সৈন্যদের পাঠিয়ে মৃত্যুর কবলে তুলে দেওয়া একটি অমার্জনীয় অপরাধ। একখানা শিলালিপিতে তার যে-শপথ লেখা রয়েছে, তা এই মনোভাবকেই সমর্থন করে। শপথটি এইরূপ: "যুদ্ধ করবার জন্য রাজধানীর বাইরে যাবেন না কখনো তিনি।" তা ছাড়া প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি যে শুধু শক্তিশালী পুরোহিতদেরই শত্রু হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, জনসাধারণকেও বিরোধী করে তুলেছিলেন। পরাধীন রাজ্যগুলি যখন দেখলে একজন দুর্বলচিত্ত সাধু পুরুষ মিশরের রাজ-সিংহাসন অধিকার করে আছেন, যিনি নিজের প্রজাদেরই বিরাগভাজন হয়েছেন, তারা তখন একে একে স্বাধীন হতে লাগলো। এই সময়ে জেরুসালেমের প্রদেশ-পাল হিব্রুদের আক্রমণ উপলক্ষে ইখনাটনকে যে পত্র দিয়েছিলেন, সেই পত্রে অধীনস্থ দেশগুলির অবস্থা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, "খাবিরুরা (হিব্রুরা, অর্থাৎ ইহুদিরা) রাজার নগরগুলি কেড়ে নিচ্ছে। রাজার পক্ষে আর কোন শাসকই নেই। মহারাজ, সব গেল।" মিশরীয় প্রদেশপালদের বিতাড়িত করলো, করদানও বন্ধ করে দিল করদ রাজ্যগুলি। মিশরের বিস্তৃত সাম্রাজ্য চক্ষের নিমেষেই যেন ভেঙে পড়লো, মিশর আবার একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হল

এবং সেখানেও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা চলতে লাগলো। রাজার মৃত্যুকালে রাজকোষ ছিল কপর্দকশূন্য, আর রাজা নিজে হয়েছিলেন বন্ধুবান্ধবহীন।

খৃস্ট পূর্ব ১৩৬২ অব্দে ইখনাটনের মৃত্যু হল, তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর। সাম্রাজ্যের পতন তাঁরই কৃতকর্মের ফল, সেজন্য কোন মনস্তাপ দেখা দেয় নি তাঁর মনে। স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর কবির জীবন নিয়ে সহজভাবেই কাল কাটিয়েছেন তিনি। তাঁর পুত্র ছিল না, কন্যা ছিল সাতটি, আইনমত তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে পারতেন পুত্রোৎপাদনের জন্য। কিন্তু বিবাহ তিনি করেন নি। তাঁর ভগ্নী ও পত্নী নেফ্রেটেটিকে (**Nefretate**) সত্যই তিনি ভালোবাসতেন। একটি ক্ষুদ্র কাজ-করা গহণায় দেখা যায়, মহিষীকে আলিঙ্গন করছেন তিনি। রানী বসতেন তাঁর সিংহাসনেব পাশে আর রাজকুমারীরা পদপ্রান্তে বসে খেলা করতো। রানী সম্বন্ধে নানা শ্রুতিসুখকর ভাষা প্রয়োগ করতেন তিনি,—যেমন "সুখের কর্ত্রী রানী, যার কণ্ঠ শুনে রাজা হৃষ্ট হন", "আমার হৃদয়ের সুখ রানী ও তাঁর সন্তানদের মধ্যে নিহিত রয়েছে।"

তিন সহস্রাব্দেরও অধিক কাল পরে আজও ইখনাটনের চরিত্রের গুণাগুণ বিচার করে তাঁর সম্বন্ধে সকলে একমত হতে পারেন নি। অনেকে বলেন, তিনি ছিলেন একটি স্ত্রৈণ প্রকৃতির পুরুষ—তার ওপর ধর্মান্ধ। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকের দল, যাদেব আদর্শ তৃতীয় থাটমোস হামুরাবি বা আলেকজাণ্ডার—অনেকেই তাঁরা ইখনাটনকে বলেন আধ-পাগলা (**half-insane**), পিতৃপুরুষের কীর্তিকে বজায় রাখবাব সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত যার নেই। কিন্তু একটু বিচার করে দেখলে ভারতেব বৌদ্ধ সম্রাট ধর্মাশোকের সঙ্গে ইখনাটনের চরিত্রের ও গুণধর্মের মিল কিছু কিছু চোখে না পড়বার কথা নয়। অশোকেব মত ইখনাটনও ছিলেন নবধর্মের প্রবর্তক—দয়া, প্রেম, করুণা, বিশ্বজনীন পরার্থপরতা, এই গুণাবলীর কোন অভাব ছিল না তাঁর স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে, আটন-স্তোত্রই তার প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন প্রেমিক ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ, কিন্তু এমনই প্রকৃতির পরিহাস, তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণগুলি তাঁকে বাস্তব-জ্ঞানবর্জিত অসহনশীল ও ধর্মান্ধ করে তুলেছিল। ইখনাটনের ধর্মসংস্কারের সঙ্গে সুমেরদেশের রাজা উরুকাগিনার সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার তুলনা করা যেতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর এই উভয় প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া একরূপই হয়েছিল। উরুকাগিনা ও ইখনাটনের দুর্ভাগ্যের কথা বিবেচনা করে যারা আদর্শবাদকে সমূলে উৎপাটিত করাই বাস্তব

বুদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করেন, তাঁদের একটি খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের দর্পিত তেজগর্বের পরিণামের দিকে তাকিয়ে দেখতে বলি—সে আসিরীয় সাম্রাজ্য। মানবতার আদর্শবর্জিত নির্মম বাস্তববুদ্ধি—তার অন্য নাম অন্ধ-স্বার্থ—জাতির চোখে সাম্রাজ্যবাদের ঠুলি বেঁধে সেই ছদ্মরূপী বাস্তববুদ্ধি কেমন করে দেশকে ছারখার করে দিয়েছে, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালের আসিরিয়া আর বর্তমান যুগের জার্মানী ইতালী ও জাপান।

৮

সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পর্ব ঃ অস্তাচলে মিশর

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লর্ড কারনারভনের অধিনায়কত্বে টুটেন-খামেনের (**Tutenkhamen**) সমাধি খনন করা হয়। সমাধির বহির্ভাগে লেখা ছিল, "এই সমাধি মন্দির যে খনন করবে, মৃত্যু তার কাছে দ্রুত পক্ষ-সঞ্চালনে এসে উপস্থিত হবে।" টুটেনখামেনের অভিশাপ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে যে-সব চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে তার আলোচনার প্রয়োজন নেই। অপরিমিত ধনরত্ন পাওয়া যায় সমাধিগর্ভে, যা থেকে ইখনাটনের কালের সমৃদ্ধির কথা জানতে পারি আমরা। ইখনাটনের জামাতা টুটেনখামেন, কিন্তু রাজা হয়েছিলেন তিনি পুরোহিতদের সাহায্যে। রাজধানীকে তিনি আবার থিবিস নগরে স্থানান্তরিত করেছিলেন। তার নিজের নাম ছিল টুট-আনখ-আটন। 'আটন'কে বাদ দিয়ে পরিবর্তিত নাম হল তার টুট-আনখ-আমন। আমনদেবকে সগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি, আর আটনকে দিলেন নির্বাসন। ইখনাটনের নাম বিলুপ্ত করার জন্য সকল স্মৃতি-শিলা থেকে 'ইখনাটন' ও 'আটন' এই দুটি নাম মুছে ফেলা হয়েছিল, আর সেই স্থানে ইখনাটন যে-সব দেবদেবীর নাম উঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই নামগুলিকেই বসিয়ে দেওয়া হল। এমনি দুর্দৈব, ইতিহাসের এমন একজন নীতিপরায়ণ চরিত্রবান দরদী নৃপতি ইখনাটন, প্রজারা তার নাম দিলে—"মহা-পাষণ্ড" (**Great Criminal**)।

টুটেনখামেনের মৃত্যুর পর তার বংশধরদের শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। তাঁরা চেয়েছিলেন সূর্যদেবতা আটনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সনাতনপন্থীদের মধ্যে ছিলেন একজন মহাপরাক্রান্ত ব্যক্তি—ইখনাটনেরই সেনাপতি ছিলেন তিনি। তাঁর নাম হোরেমহেব (**Horemheb**)। তিনি এখন রাজা হয়ে পুরোহিত-তন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি করলেন। রাজ্যাভিষেক-কালীন একটি স্মৃতিলেখনে বলেছেন : "বংশানুক্রমে শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি দুই ভূখণ্ডে (সম্ভবত ইখনাটন কর্তৃক)।...রাজার আদেশে তিনি যখন গেলেন তার কাছে তাকে দেখে রাজা ভীত হতে আরম্ভ করেছিলেন।" সনাতনধর্ম রক্ষার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি

ছিল না, সে কাজ তিনি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ বংশের শেষ রাজা। ব্রেস্টেড কিন্তু তাকে উনবিংশ বংশের প্রথম রাজা বলেই ধরেছেন। প্রখ্যাত মিশরীয় ঐতিহাসিক মনেথো উনবিংশ বংশের রাজত্বকালের বিবরণ সুরু করেছেন মেন-পেটিরা অথবা প্রথম রেমেসিস (**Men-petira** বা **Ramesis I**)-এর আমল থেকে—তিনিই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সে যাই হোক, সাম্রাজ্যের হৃত-গৌরব কতকটা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই বংশের প্রথম সেটি (**Seti I**) ও দ্বিতীয় রেমেসিস (**Rame-sis II**)। প্রথম সেটি কারনাক নগরে একটি বিরাট সভা-গৃহ (**Hypostyle Hall**) নির্মাণ আরম্ভ করেন, এবং সেই হলটি সম্পূর্ণ করেন দ্বিতীয় রামেসিস। আবু সিমবাল (**Abu Simbal**)-এর পাহাড় কেটে একটি মন্দির নির্মাণ করবার উদ্যোগও করেছিলেন সেটি। পাথরে খোদাই-করা মনোহর শিল্পবৈচিত্র্য দেখা যায় তাঁর আমলের। আবিডসে প্রাচীন মিশরের একটি অতি চমৎকার কারুকার্য-খচিত সমাধিগর্ভে কয়েক সহস্র বৎসর ধরে নিরুদ্বেগে শায়িত ছিল রাজা সেটির মামি।

প্রখ্যাত ফারাওদের মধ্যে দ্বিতীয় রামেসিস সর্বশেষ কীর্তিমান পুরুষসিংহ। তাঁর অভিযান কাহিনীগুলির নিখুঁৎ বর্ণনায় আছে বীরত্বের অপূর্ব ব্যঞ্জনা, ঠিক সেই পরিমাণে প্রণয় ব্যাপারেও তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। তিনি ছিলেন অতি সুপুরুষ—যৌবনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তরমূর্তি সুন্দর মুখাকৃতি সুডৌল অঙ্গসৌষ্ঠব প্রতিফলিত করছে। শৌর্য ব্যক্তিত্বের মোহিনী শক্তি, এই সব বিচিত্র গুণধর্মের অধিকারী তিনি যেমন ছিলেন, ইতিহাসে তেমন গুণী মানুষ অল্পই দেখা যায়। সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী তিনি ছিলেন না, সম্ভবত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বঞ্চিত করেই সিংহাসন অধিকার করেছিলেন এবং তার অব্যবহিত পরেই নিউবিয়ায় সামরিক অভিযান পঠিয়েছিলেন সোনার খনি থেকে স্বর্ণ আহরণের জন্য। এমনি করে যখন রাজভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠলো তখন তিনি এশিয়ায় অভিযান সুরু করলেন। এশিয়ার রাজ্যগুলি আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তিন বৎসর সংগ্রামের পর প্যালেস্টাইন পুনরধিকার করলেন তিনি। তারপর খৃঃ পূঃ ১২৯৫ অব্দে পরাক্রান্ত হিটাইটদের পরাজিত করলেন কাদেশের যুদ্ধে (**Battle of Kadesh**) এবং দাপুর নামক নগর অবরোধ করেন। এই সকল যুদ্ধে তাঁর অসাধারণ বীরত্ব ও নেতৃত্বের পূর্ণ বিবরণ 'রামেসিয়াম'

(**Ramesseum**)-এর প্রস্তর গাত্রের চিত্র-বর্ণনায় পাওয়া যায়। দুর্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে বিপুল সংগ্রাম চালিয়ে অসমসাহসী নৃপতি মিশরীয় বাহিনীর অবশ্যম্ভাবী পরাজয়কে কিরূপে বিজয়গৌরবে রূপান্তরিত করেছিলেন, পূর্বাপর সেই ঘটনাগুলির দৃশ্য পাথরে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। অনেকের মতে, প্যালেস্টাইন বিজয়ী দ্বিতীয় রেমেসিসই বাইবেলের 'একসোডাস' (**Exodus**)-গ্রন্থে বর্ণিত ইহুদীদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। কবিতার ছন্দে তাঁর জীবনের কাহিনী রচনা করেছেন একজন কবি। তাঁর মহিষী ছিল কয়েক শত। মৃত্যুকালে তাঁর পুত্রের সংখ্যা ছিল একশো ও কন্যার সংখ্যা পঞ্চাশ। কতিপয় কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন তিনি বংশে যাতে কৃতী সন্তানের জন্ম হয় সেইজন্য। তাঁর বংশধরদের সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল যে নিজেদের নিয়ে একটি সম্প্রদায় গঠিত করেছিল তারা এবং এত প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল সেই সম্প্রদায় যে ভাবী কালে মিশরের শাসকেরা সেই গোষ্ঠী থেকেই নির্বাচিত হতেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টায় রেমেসিসের যুদ্ধবিগ্রহ আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রাচ্য ভূখণ্ডে কয়েকটি দেশের অবস্থার দিকে দৃষ্টি পড়ে। মিশরে টেল্-এল্ আমরনায় যে পত্রাবলী উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলি লিখেছেন এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের মিশরীয় রাজদূতগণ ও রাজন্যবৃন্দ—মিটানির রাজা ছাড়াও, মেসোপটেমিয়া, আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের নৃপতিগণের লিখিত পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পত্রগুলির মধ্যে পশ্চিম প্রাচীর যে রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত, তারই পরিপূরণ ও সমর্থন হিসাবে প্রত্নতত্ত্বের একটি সার্থক আবিষ্কার ঘটেছে এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়ার বোগাজ-কিউই নামক স্থানে। আনাতোলিয়ার প্রাচীন নাম, ক্যাপাডোশিয়া (**Capp-adocia**)। এখানকার দুর্গের প্রাকারবেষ্টনীর মধ্যে রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ থেকে অনেকগুলি মৃণ্ময় লিখন-চাকতি উদ্ধার করা হয়েছে। সেই চাকতির ওপর কিউনিফরম ও বর্ণ-মালার হরফে লিখিত মিটানি, আসিরিয়া, সিরিয়া প্যালেস্টাইন, মিশর ও ব্যাবিলোনিয়া প্রসঙ্গে নানা বিবরণ পাঠ করে সমসাময়িক দেশসমূহের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ পরিচয় ঘটে। আমরা দেখতে পাই, এশিয়া মাইনরে আসমুদ্র-বিস্তৃত বিশাল হিটাইট সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন সুবিলুলিউমা (**Shubbiluliuma**)—তাঁর রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ১৩৮৫-১৩৪৫।

রাজধানীর নাম খাটটি (Khatti)। মিশরীয় ফারাও ইখনাটনের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই সুচতুর নৃপতি কূটনৈতিক কৌশলদ্বারা প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় মিশরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বহ্নি প্রজ্বলিত করতে উৎসাহ দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্যালেস্টাইনের নাহেরিন প্রদেশ ছলক্রমে দখল করেছিলেন তিনি। তারপর আসিরিয়ার উত্তরে ইউফ্রেটিস নদীর উৎপত্তি স্থানে অবস্থিত প্রতিবেশী মিটানি রাজ্যের উপর কূট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেন, পরাক্রান্ত মিটানিরাজ দুশরত্তর (দশরথের) মৃত্যুর পর। সুবিলুলিউমার কৃতিত্ব এই যে, রাজ্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি, কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বনে মিশরকে দূরে সরিয়ে রেখে। মিশরের সঙ্গে তাঁর কখনো বাহুশক্তির পরীক্ষা হয় নি। তাঁর বংশধরেরা কিন্তু সরাসরি সংঘর্ষ বর্জনের সুপরিকল্পিত নীতির অনুসরণ না করে মিশরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, উনবিংশ বংশীয় ফারাও প্রথম সেটির আমল থেকেই মিশরের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চলেছিল, এবং সেই উদ্যমের পূর্ণ দাপট প্রকাশ পেয়েছিল দ্বিতীয় রেমেসিসের বিখ্যাত যুদ্ধ অভিযানসমূহে। হিটাইটদের রাজা তখন মুরসিল (Mursil)। অভিযানের প্রথমভাগে কোন বাধা দেন নি তিনি, কিন্তু পরিশেষে মিশরীয় বাহিনীর অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। সেটির বিপুল বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে পনের বছর শান্তি-ভঙ্গের কোন কাজই করেন নি তিনি। তারপর যখন দাম্ভিক উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করবার জন্য দ্বিতীয় রেমেসিস আক্রমণ করলেন প্যালেস্টাইনের উত্তরাংশে অবস্থিত আলাসিয়া ও উগারিট নগর, মুরসিল তখন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন আত্মরক্ষার একান্ত প্রয়োজনে। খৃঃ পূঃ ১২৯৫ অব্দে কাদেস-নগরে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধলো, এবং এই যুদ্ধে (Battle of Kadesh) মুরসিলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। প্রাচীন কালের ইতিহাসে এই যুদ্ধটি প্রসিদ্ধি লাভ করে এইজন্য যে অদ্ভুত রণকৌশলের বলে শত্রুব্যূহ ভেদ করে নিজের বিচ্ছিন্ন পরিবৃত সৈন্যদলকে নিশ্চিত পরাজয় থেকে উদ্ধার করেছিলেন রেমেসিস, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে হিটাইটদেরও বিধ্বস্ত করেছিলেন। কিন্তু পরাজিত হলেও হিটাইট শক্তি অস্তমিত হয় নি। মুরসিলের পুত্র মুটাল্লু (Mutallu) মিশর সাম্রাজ্যে আবার বিদ্রোহ জাগিয়ে তুললেন, এবং সেই সূত্রে বিদ্রোহীদের সাক্ষাতভাবেই সাহায্য করলেন। যুদ্ধ বাধলো তখন আবার দুই রাষ্ট্রের মধ্যে।

আসকেলন ও দাপুরের যুদ্ধে হিটাইটদের পরাস্ত করেছিলেন রেমেসিস, সমগ্র প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধার করতে সমর্থও হয়েছিলেন —তথাপি যুদ্ধ বিরতি ঘটলো না। দ্বিতীয় রেমেসিসের হিটাইটদের সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল খৃঃ পূঃ ১২৯৫ অব্দে, সেই সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘ পনের বছর খৃঃ পূঃ ১২৮০ পর্যন্ত। মুটালুর ভ্রাতা খাট্টুসিল (Khattusil) সিংহাসনে অধিরোহণ করেই রেমেসিসের কাছে সন্ধি প্রস্তাব করে পাঠালেন। দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামে প্রভূত রক্তমোক্ষণের ফলে উভয় দেশই বীর্যহীন হয়ে পড়েছিল। মিশরের পক্ষে এই যুদ্ধ হয়েছিল সম্পূর্ণ নিষ্ফল। মিশরীরা যেমন হিটাইটদের প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করেছিল, তেমনি আবার নিজেরাও হিটাইটগণ কর্তৃক উত্তর সিরিয়া থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। ফল কথা, পশ্চিম এশিয়ায় প্রথম সেটির সাম্রাজ্য যতখানি বিস্তৃত ছিল, তার আয়তন এক বিঘাও বৃদ্ধি করতে পারেন নি দ্বিতীয় রেমেসিস। পরিশেষে এই নিরর্থক যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত হবার সুবুদ্ধি দেখা দিয়েছিল তাঁর, খাট্টুসিলের সন্ধি প্রস্তাবে তিনি অচিরেই সম্মত হলেন। উভয় নৃপতির মধ্যে তখন সন্ধিপত্রের বিনিময় হল। মৃণ্ময় চাকতির ওপর 'কিউনিফরম' বা 'বানমুখো' হরফে লিখিত এই সন্ধিপত্রের কিয়দংশ বোগাজ কিউই-তে পাওয়া গেছে। আর মিশরীয় হরফে লিখিত সম্পূর্ণ সন্ধিপত্রটি কারনাক মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায়।

প্রাচীনকালের একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দলিল এই সন্ধিপত্র। সন্ধিপত্রের প্রচলন সুমের, ব্যাবিলন, আসিরিয়া প্রভৃতি এশিয়ার দেশসমূহে ইতিপূর্বে দেখা গেছে। সুমের দেশের ইতিহাসে দেখা যায়, অতি প্রাচীনকালে একটি সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়েছিল দুইটি নগরদেবতার মধ্যে। পূর্বে মিশর ও খাটটির মধ্যে আরও দুবার সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু রেমেসিস-খাট্টুসিল সম্পাদিত সন্ধিপত্রটির বিশেষত্ব এই যে, শর্তগুলি এমন শোভন আকারে, যুক্তিসঙ্গতভাবে, সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ যে পাঠ করলে মনে হয়, দলিলখানা যেন একটি আধুনিক রচনা। উভয় নৃপতি স্ব স্ব দেবতার নামে শপথ করে অঙ্গীকার করছেন : "তাদের মধ্যে আর কোনও বিরোধ রইলো না, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। খাট্টির অধিপতি মিশরীয় ভূমিতে কখনো হানা দেবেন না, সেখান থেকে কোন দ্রব্য অপসারণও করবেন না। মিশরের অধিপতি রেমেসিসও খাটটির ভূমি আক্রমণ করবেন না, সেখান থেকে কোন দ্রব্য অপসারণও করবেন না।" আর একটি শর্ত

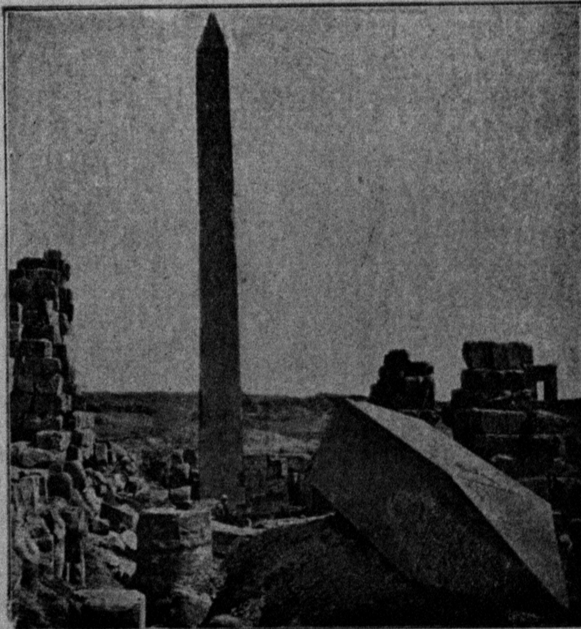
এই যে, সুবিলুলিউমার আমলে উভয় দেশের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল সেই চুক্তিগুলি বলবৎ থাকবে, এবং আপদকালে উভয় দেশ পরস্পরকে সাহায্য করবে। আপদকালে এইরূপ পরস্পর সাহায্যের চুক্তিকেই আধুনিককালে বলা হয়,—'প্রতিরক্ষা-মূলক মৈত্রী' (defensive alliance)। সন্ধিপত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি এইরূপ : উভয় দেশে রাজনৈতিক কারণে শাস্তির ভয়ে যারা পালিয়ে এসেছে (political fugitives) সেই ব্যক্তিদের স্বদেশে ফেরত পাঠাতে হবে, তবে সেখানে তাদের ওপর কিম্বা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর কোনরূপ অত্যাচার বা জুলুম করা হবে না, অথবা তাদের গৃহেব কোন ক্ষতি করা চলবে না। আধুনিক সন্ধিপত্রে এরূপ ব্যবস্থাকে বলা হয়,—'মার্জনা-চুক্তি' (amnesty clause)।

খাটটিরাজ খাটটুসিল মিশরের সঙ্গে শুধু সন্ধি করেই ক্ষান্ত হন নি। তাঁর কন্যাকে মিশররাজ দ্বিতীয় রেমেসিসের সঙ্গে বিবাহও দিয়েছিলেন, এবং কন্যাসহ স্বয়ং মিশরে উপস্থিত হয়েছিলেন পাত্রীকে সম্প্রদান করবার জন্য। একটি অভিনব ব্যাপার তাঁর এই মিশরে আগমন—কেন না, সেকালে কোন রাজা অন্য নৃপতির রাজ্যে কখনো পদার্পণ করতেন না। প্রচুর উপঢৌকন ও যৌতুক নিয়ে গিয়েছিলেন খাটটিরাজ, তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজনও হয়েছিল যথেষ্ট। সম্মানের প্রতিদানরূপে রেমেসিস কিন্তু স্বয়ং খাটটিনগরে গিয়ে খাটটুসিলকে সম্মানিত করেন নি। তারপর খাটটির হিটাইট রাজকন্যা বেনত্রেস (Bentresh) যখন অসুখে পড়লেন —আর সকলেই মনে করলো তিনি ভূতগ্রস্তা হয়েছেন—ফারাও তখন তাঁর রাজবৈদ্যকে পাঠিয়েছিলেন চিকিৎসা করে' রাজকুমারীর দেহ থেকে ভূত ছাড়াবার জন্য। বৈদ্যের সকল চেষ্টা বিফল হল। তখন থিবিসের নগর-দেবতা খনসু (Khonsu)-র বিগ্রহকে হিটাইট রাজদরবারে পাঠিয়েছিলেন ফারাও। কথিত আছে, রাজধানীতে দেবতার আগমনে ভীত-ত্রস্ত রাজা সসৈন্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য, আর দেবতা যেমন সংগ্রামের উদ্যোগ করলেন, নগরবাসীদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে অপদেবতাও অমনি তিরোহিত হলেন! স্মরণ থাকতে পারে, ইতিপূর্বে মিটানিরাজ দুশরত্ত নগরদেবী ইসতার'কে মিশরে পাঠিয়েছিলেন তৃতীয় আমেনহটেপের নিকট বন্ধুত্বের নিদর্শন-রূপে—খনসুর আগমনও সেই ঘটনার অনুরূপ।

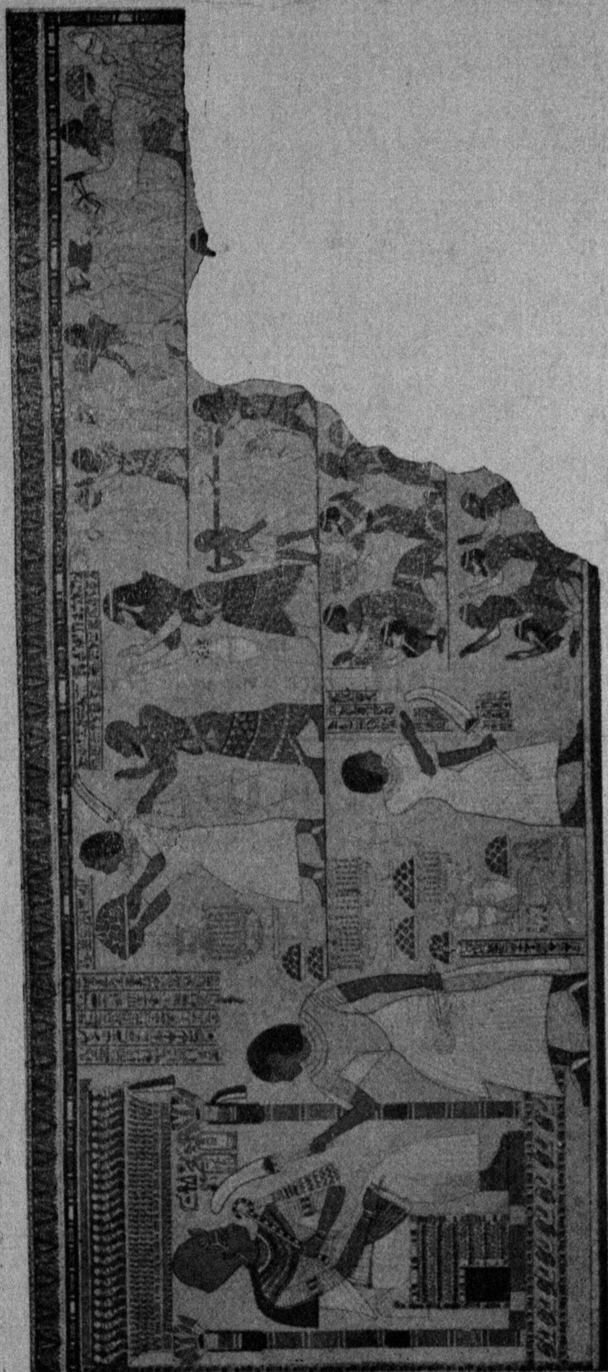
দ্বিতীয় রেমেসিসের ব্যক্তিজীবন ও শৌর্যবীর্যের কাহিনীই তাঁর সম্যক পরিচয়



সম্রাট ইখনাটন রানীর হাত থেকে ফুল গ্রহণ করছেন



রানী হাটাসেপসুটের স্তম্ভ (কারনাক)



সাম্রাজ্যের অধীশ্বর একজন ফারাও
(কর ও উপঢৌকনবাহী এশিয়ার দূতগণকে অভ্যর্থনা করছেন)

দেয় না। শিল্পক্ষেত্রে ও নির্মাণকার্যে তাঁর অসামান্য উৎসাহ বিরাট অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিফলিত। প্রাচীন মিশরের যেসব সৌধ এখনও বর্তমান, তার অর্ধেকই দ্বিতীয় রেমেসিসের আমলের। কারনাকের সভাগৃহ (Hypostyle Hall) —যার নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন প্রথম সেটি, সেই বৃহৎ হর্ম্য তিনিই সম্পূর্ণ করেন। লাকসার (Luxor)-এ নদীর পশ্চিম দিকে 'রেমেসিয়াম' (Rameseum) নামে নিজের একটি সুমহান সমাধিগৃহ নির্মাণ করেছিলেন তিনি। গৃহটির বিশাল প্রবেশদ্বারের প্রাচীরগাত্র (pylon-walls) রাজশিল্পীরা যে রকম বিরাট আকরে জমকালোভাবে চিত্রিত করেছিলেন তেমনটি পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। ভাস্কর্যের বিরাটত্ব প্রায় সেই অতীতকালের স্ফিংক্সের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। পাহাড় কেটে ৭৫ ফুট উচ্চ বিরাট রেমেসিস মূর্তিসমূহ নির্মাণ করা হয়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ 'রেমোসিয়াম' রেমেসিসের একটি প্রধান কীর্তি, কিন্তু সেই কীর্তি তাঁর চরম দুষ্কৃতিও বটে। লাকসারের অনেক প্রাচীন স্মৃতি নির্বুদ্ধিতা বশত—সম্ভবত আত্মগৌরব প্রচার করবার উদ্দেশ্যেই—ধ্বংস করেছেন তিনি, এবং সেখানে নিজের কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। আত্মপ্রচার দ্বারা উত্তরপুরুষের স্মৃতি-মন্দিরে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা মিশরীয় রাজন্যকুলের একটা দুর্বলতা, যা অনুকম্পার যোগ্য মনে হতে পারে আধুনিক মানুষের কাছে। এই আত্মপ্রচার কার্যে রেমেসিস অতীতের সকল ফারাওকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সারা মিশরে তাঁর অতিবিরাট পাথরের প্রতিমূর্তির ছড়াছড়ি। আবু সিমবেল (Abu Simbel) পাহাড়ের গুহামন্দিরও তিনিই সম্পূর্ণ করেছিলেন। তার রাজত্বকালে বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল জল ও স্থল উভয় পথেই। প্রাচীন রাজাদের পূর্ত-কার্যের অনুকরণে তিনি আর একটি নূতন খাল কেটেছিলেন লোহিত সাগরের সঙ্গে নীল নদীর সংযোগ বিধানের জন্য। খালটি মজে গিয়ে তার উদ্যমকে দিয়েছিল ব্যর্থ করে'। খৃঃ পূঃ ১২৩৩ অব্দে নব্বই বছর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

কিন্তু এত সব বিরাট নির্মাণকার্য ও বিপুল আত্মপ্রচার তার সাম্রাজ্যের দুর্বল ভিত্তির কৃপণ দীনতাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে নি। রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে তিনি যে হিটাইটদের সঙ্গে মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তা চলেছিল ষোল বছর, এবং সেই যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন উভয় পক্ষই নিরতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় রেমেসিসের উত্তরাধিকারী ছিলেন মারনেপটা (Merneptah—১২৩৩-

১২২৩)। তিনিও এই আত্মঘাতী যুদ্ধ সমানে চালিয়ে গিয়েছিলেন, তা প্রতিপন্ন হয় নিম্নোক্ত শিলালিপির বর্ণনা থেকে :

বিদায় নিয়েছেন রাজারা 'সালাম' বলে,
বিধ্বস্ত তেনেহু (লিবিয়া),
প্রশান্ত হিটাইট ভূমি,
লুণ্ঠিত ক্যানান,...
বিপর্যস্ত ইসরায়েল...
প্যালেস্টাইন হয়েছে পতিহীনা মিশরের তরে,
যুক্ত সর্বভূমি, সেথা শান্তি বিবাজিত,
দুর্দান্ত যারা তাদের বেঁধেছেন রাজা মেনেপটা।

না, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি—হয়েছিল মহতী বিনষ্টির বীজবপন। প্রকৃতপক্ষে মিশবের ইতিহাসে বিপর্যয়ের সূত্রপাত, পতনও আরম্ভ হয়েছিল তখনই—আর সে এমন পতন যার অধোদিকের গতিবেগ তৃতীয় রেমেসিসের (**Ramesis III**) মত উদ্যমশীল নৃপতিও রোধ করতে পারেন নি। পুরোহিতদের কৃপায় উনবিংশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা—অপরিমিত শক্তিক্ষয়েরদ ক্ষণ পুরোহিত-তন্ত্রকে আয়ত্বাধীনে রাখতে পারেন নি তৃতীয় রেমেসিস। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যত্র যেমন ঘটেছে মিশরেও তেমনি পুরোহিত ও রাজার মধ্যে ক্ষমতাব রজ্জু ধবে টানাটানির যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তার সূচনা দেখেছি আমরা ইখনাটনের রাজত্বকালে। তাব পর থেকে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন পুরোহিত। দ্বিতীয় রেমেসিসেয় বিদেশ থেকে আনা জয় লব্ধ যে-সব ধনরত্ন, তার অধিকাংশই ভাগে পডতো দেব-মন্দিরের আর ভোগে লাগতো পুরোহিতের। এমন অবস্থায় ঐশ্বর্য-পুষ্ট প্রতিপত্তিশালী পুরোহিতকূল যে বাজ্যের মাথায় চডে বসবে তার আশ্চর্য কি? হ্যারিস প্যাপিরাস (**The Great Harris Papyrus**) নামক কাগজের লেখা থেকে জানা যায় যে, তৃতীয় রেমেসিসের কালে পুরোহিতদের দাসের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ সাত হাজার,—অর্থাৎ মিশরেব জনসংখ্যার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ। আবাদি জমির সাত ভাগের এক ভাগ আর পাঁচ লক্ষ পশু ছিল তাদের। মিশর ও সিরিয়ার ১৬৯টি নগরের রাজস্ব বিনা শুল্কে তাদেরই লভ্য। পুরোহিতদেব তৈলার্দ্র মস্তকে আরও তেল ঢেলেছিলেন তৃতীয় রেমেসিস, আমনদেবের পূজারীদের প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্য দান করে' এবং প্রায় দুই লক্ষ বস্তা

শস্য বার্ষিক বরাদ্দ ধরে দিয়ে। এই দান-দক্ষিণার ব্যাপারে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়েছিল, এমন অর্থ অবশিষ্ট রইলো না যা দিয়ে রাজভৃত্যদের পাওনা মেটানো যায়।

ভারতের ইতিহাসে বিনা শুল্কে আমদানি, রাজস্ব আদায় প্রভৃতি অদ্ভুত বরাদ্দের দৃষ্টান্ত দেখা যায় মোগল সাম্রাজ্যের পতনকালে। ইংরেজ কোম্পানী তখন সেই রাজস্বের সঙ্গে ক্ষমতার চাবিকাঠিটিও পকেটে ভরেছিল। ফল যা হয়েছিল তা সকলেই জানেন। রেমেসিস-বংশীয় (Ramessides)-দের রাজত্বকালে সেই একই ব্যাপারের পরিণামও ঘটেছিল একই রকম। আমনদেবের প্রধান পুরোহিত ধনদৌলত ও ক্ষমতা বলে রাজাকে হাতের পুতুল বানিয়ে রেখেই তুষ্ট হলেন না। বংশের শেষ নৃপতি ১১শ রেমেসিসের মৃত্যুর পর খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দে প্রধান পুরোহিত হেরিহোর (Herihor) স্বয়ং রাজসিংহাসনে উঠে বসলেন। সেই থেকে রাজ্য ধর্মতন্ত্রের (Theocracy) ওপর পুরোপুরি ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হল। জাতীয় জীবনের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল, নানা রকম কুসংস্কার গজিয়ে উঠতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে রাজ্যটিও ছারেখারে যেতে বসলো।

পুরোহিত হেরিহোর রাজা হবার সঙ্গেই উত্তরাঞ্চল বিযুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। যথাকালে অন্য উপদ্রবও দেখা দিল। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী লিবিয়া ও ফিনিসিয়া, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার ওপর প্রভুত্বের ফলে মিশরের বাণিজ্য বিলক্ষণ বিস্তার লাভ করেছিল, সাম্রাজ্যও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। পূর্বাঞ্চলে এখন তিনটি পরাক্রান্ত শক্তির অভ্যুত্থান একে একে ঘটেছিল, আসিরিয়া ব্যাবিলন ও পারস্য সেই শক্তিত্রয়। ফিনিসীয়রা জলযানের উন্নতি করেছিল, সামুদ্রিক আধিপত্য তাই আর মিশরের ছিল না, তাদেরই হাতে গিয়ে পড়েছিল। ডোরিয়ান (Dorian) ও আকিয়ান (Achaean) নামক দুইটি গ্রীক উপজাতি খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ থেকে ক্রীট ও এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে বাণিজ্যের প্রসারের দিকে মন দিয়েছিল। এমনি করে জলে স্থলে উভয় ক্ষেত্রেই বাধা প্রাপ্ত হয়ে মিশরের বাণিজ্য ক্রমেই শীর্ণ হয়ে এসেছিল, ক্ষমতা প্রতিপত্তিও হ্রাস পেল। সাম্রাজ্যযুগে বিদেশী রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল, বিদেশ থেকে মিশরে ভাবধারাও আমদানি হয়েছিল। নূতন রক্ত ও ভাবের আগমনে সাংস্কৃতিক পরিপুষ্টি ঘটবারই কথা, মিশরে কিন্তু তা হয় নি, ফল বরঞ্চ বিপরীত দেখা গেল। বিদেশী ভাবধারাকে যে কৌশলে ধাতস্থ করা যায় সেই গ্রহিষ্ণু চিত্ত-বৃত্তির সঙ্গে

মিশরের পরিচয় ছিল না, সে-কারণে নূতন আমদানিগুলি জাতির চিন্তাজগতে একটি 'জগা-খিচুড়ি' অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় মর্যাদা ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিশেষ হানিকর এই অবস্থা—উপর্যুপরি নানা জাতির আক্রমণ যখন ঢেউ-এর মত ভেঙে পড়লো মিশরের ওপর, নিরুপায়ভাবে সহ্য করা ছাড়া তখন আর তার উপায়ান্তর ছিল না। পরিশেষে গর্ব করবার মত যা ছিল তার একমাত্র অবশিষ্ট সম্পদ, সেই তিন সহস্রাধিক বৎসরের স্বাধীনতার চির অবসান ঘটলো।

এক-বিংশ বংশের কাল থেকে ঘটনা পরম্পরার যে বিচিত্র শোভাযাত্রা চলেছিল আমরা তার বিশদ আলোচনা না করে শুধু ইতিহাসের কয়েকটি পদ-চিহ্নের উল্লেখ করবো। খৃঃ পূঃ ৯৫৪ অব্দে লিবিয়ানরা পশ্চিম পাহাড় অঞ্চল থেকে এসে সাংঘাতিক রকমের হানা দিয়েছিল। খৃঃ পূঃ ৯২৫ অব্দে দ্বাবিংশ বংশীয় সম্রাট শেশেক জুডা অর্থাৎ প্যালেস্টাইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জেরুসালেম অধিকার করেছিলেন এবং রাজা সলোমনের সঞ্চিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করে দেশে ফিরেছিলেন। খৃঃ পূঃ ৭২২ অব্দে ইথিওপিয়ানরা তাদের দীর্ঘ কালের দাসত্বের প্রতিশোধ খুব বড় হাতেই নিয়েছিলেন। তার পর দেখা দিল আসিরীয়দের উপদ্রব। খৃঃ পূঃ ৭২০ অব্দে ফারাও সাবাক-এর বিরুদ্ধে আসিরীয় সম্রাট দ্বিতীয় সারগন যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সমুদ্রের উপকূলে রাফিয়ার যুদ্ধে (**Battle of Raphia**) মিশরীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ফারাও রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেন, কিন্তু সারগন তার পশ্চাদ্ধাবন করেন নি। কয়েক বছর পর আসীরীয়রাজ সেননাচেরিব (**Sennacherib**)-এর মিশর অভিযান একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্যালেস্টাইনের উপকূল ধরে সসৈন্য অগ্রসর হয়ে তিনি মিশরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেন, সেখানে এলটেকে (**Eltekeh**) নামক স্থানে মিশরবাহিনীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধলো, এবং সেই যুদ্ধে জয়ের দাবী করেছেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দৈবদুর্বিপাকে তাঁর পরাজয় ঘটেছিল শত্রুর হস্তে নয়, মহামারীর আক্রমণে। সৈন্যশিবিরে প্লেগ দেখা দিয়েছিল, বহু সৈন্যের মৃত্যু ঘটলো এবং সেজন্য কলঙ্ক নিয়েই তাকে দেশে প্রত্যাগমন করতে হয়েছিল।*

---

* এই দুর্দৈব প্রসঙ্গে বাইবেলের বর্ণনা এইরূপ : "সেই রজনীতে ঈশ্বরের দূতগণ বহির্গত হলেন এবং আসিরীয় শিবিরে সাত সহস্রেরও উর্ধ্বসংখ্যক সৈন্যকে আঘাত করলেন। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল তাদের মৃতদেহ। অনন্তর আসিরিয়াধীপ সেননাচেরির নিনেভায় প্রত্যাবর্তন করলেন।" (**II Kings 19 ; II Chronicles 32**)

কিন্তু সেই কলঙ্ক মোচন করেছিলেন তাঁর পুত্র এসারহেড্ডন (Esarhaddon)। খৃঃ পূঃ ৬৭৪ অব্দে এসারহেড্ডন মিশর জয় করেছিলেন, কিন্তু শক্তিমান ফারাও তাহরকার উদ্যোগে অচিরেই মিশর পরাধীনতা পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হয়েছিল। এসারহেড্ডনের পুত্র আস্নুরবানিপাল (Assurbanipal) আসিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মিশর আক্রমণ করেন (খৃঃ পূঃ ৬৬১)। মিশর অভিযান স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন তিনি, তাহরকার উত্তরাধিকারী তানুতামন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। মিশর বিজয়ের পর আস্নুরবানিপাল থিবিসের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ দিয়ে স্বীয় রাজধানী নিনেভের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন। কারনাকে থিবিস নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় আস্নুরবানিপালের সৈন্যরাই নগরটিকে সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ করেছিল। কিন্তু কঠোর দমন-নীতি সত্ত্বেও মিশরে বিদ্রোহবহ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয় নি। দশ বৎসর পর খৃঃ পূঃ ৬৫১ অব্দে ষড়বিংশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সাইটে (Saite)-বংশীয় রাজা সামেটিক (Psamatik) মিশরের মুক্তিসংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। মিশর আবার স্বাধীন হল। সাইটে রাজন্যবৃন্দের উৎসাহদানের ফলে দেশের ভাস্কর্য স্থাপত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা পুনর্জাগরিত হয়েছিল, কিন্তু এবার সেগুলি আর মিশরের ভোগে লাগে নি, যথাকালে গ্রীসের পদে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। সাইটে নৃপতি নেকোর (Necho) রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৬০৯-৫৯৩) মিশরে গ্রীক আদর্শের প্রবর্তন আরম্ভ হয়েছিল। আবু-সিমবেলের একটি শিলা-লিপিতে দেখা যায়, মিশরীয় সৈন্যদলে তখন গ্রীক্ ভাড়াটিয়ারা (mercenaries) নিযুক্ত হয়েছিল। এই সৈন্যদের নিয়ে রাজা নেকো নিউবিয়ার যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। যুদ্ধ ব্যাপারে নেকোর চরম কীর্তি আসিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান। তিনি যখন প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়ে তাঁর বাহিনী পরিচালিত করেন, তখন জুডার রাজা জোসিয়া (Joshia) প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন তাঁর অগ্রগতি রোধ করবার জন্য। বৃত্তান্তটির বিবরণ বাইবেলে পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৬০৮ অব্দে মেগিড্ডোর যুদ্ধে (Battle of Megiddo) জোসিয়া নিহত হলেন। তখন জুডা অতিক্রম করে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সসৈন্যে উপনীত হলেন নেকো। সেখানে তাঁকে নব-ব্যাবিলোনীয় রাজশক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মিডিস্ (Medes)-দের আক্রমণে আসিরীয় সাম্রাজ্য তখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে-স্থলে ক্যালডিয়দের নবশক্তি জেগে উঠেছিল

ব্যাবিলোনিয়ায় রাজা নবপোলাসার (Nabopolassar)-এর অধিনায়কত্বে। ব্যাবিলোনিয়াকে নির্বিরোধে মিশরের হাতে সমর্পণ করবার অভিপ্রায় ক্যালডিয়-রাজ নবপোলাসারের ছিল না। পুত্র নেবুকাড্‌নেজ্জার (Nebuchadnezzar)-কে সসৈন্যে পাঠালেন তিনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ফারাও নেকোর গতিরোধ করবার জন্য। খৃঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হয় কারকেমিশ (Carchemish) নামক নগরের সন্নিকটে, এবং সেই যুদ্ধে মিশরীয় সেনাদল গুরুতরভাবে পরাজিত হয় ব্যাবিলোনীয় বাহিনীর কাছে। ছত্রভঙ্গ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করে নেবুকাড্‌নেজ্জার মিশরের প্রত্যন্তদেশ পর্যন্ত এসেছিলেন, কিন্তু সেই সময় পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাকে ব্যাবিলনে ফিরে যেতে হয়েছিল।

মিশর আপাতত রক্ষা পেল বটে, কিন্তু খৃঃ পূঃ ৫৬৮-৫৬৭ অব্দে ব্যাবিলোনীয় নৃপতি নেবুকাড্‌নেজ্জার যে অন্তত একবার মিশরের অভ্যন্তরে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। কথিত আছে, তিনি না কি মিশরকে ব্যাবিলোনিয়ার একটি প্রদেশে পরিণত করেছিলেন। কথাটা অতিশয়োক্তি হওয়াই সম্ভব—মিশর হয়ত বা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর খৃঃ পূঃ ৫২৫ অব্দে পারস্য সম্রাট কাম্বোজিয় (Cambyses) সুয়েজ-যোজক অতিক্রম করে মিশর আক্রমণ করেন। ইতিপূর্বেই কাম্বোজিয়ের পিতা পারস্যাধীপ মহাবীর কুরুশ (Cyrus the Great) ব্যাবিলোনিয়া অধিকার করে' আসমুদ্র সাম্রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। মিশররাজ আমোসিস (Amosis or Ahmose) পারস্যের এই সাম্রাজ্যবিস্তারে শঙ্কিত হয়ে সামোসের গ্রীক 'টাইরাণ্ট' বা শাসক পলিক্রাটিসের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষার উদ্যোগ করেছিলেন। কাম্বোজিয়ের পারসীক বাহিনী যখন গাজায় উপনীত, ঠিক সেই সময় গ্রীক শাসক বিশ্বাসঘাতকতা করে মোক্ষম আঘাত হানলেন মিশর-রাজের ওপর, তিনি আমোসিসকে পরিত্যাগ করে সসৈন্যে পারসীকদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মরু অঞ্চল অতিক্রম করে কাম্বোজিয় যখন পেলুসিয়াম নগরের দ্বারদেশে এসে পৌছলেন তখন আমোসিস বেঁচে নেই, তাঁর পুত্র ফারাও তৃতীয় সামেটিক (Psamatik III) গ্রীক ভাড়াটিয়া সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ফলে পেলুসিয়ামের সমরাঙ্গনে (Battle of Pelusium) তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মেমফিস অধিকৃত হল, ফারাওকে বন্দী করে সুসায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করে কাম্বোজিয় মিশরীয় দেবদেবীর পূজা অর্চনা দ্বারা নিজেকে

ফারাও-রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয় প্রপাত পর্যন্ত তিনি অভিযান চালিয়েছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত মিশর পারস্যের পদানত হয়ে পড়লো। মিশরের স্বাধীনতা দীপ চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হল।

মিশর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সিরিয়ায় কাম্বোজিয়ের মৃত্যু ঘটে। তখন মহাবীর দারায়ুস (Darius) পারস্যের সিংহাসন অধিকার করে সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিপতি হন (খৃঃ পূঃ ৫২২)। মিশর ছিল সেই সাম্রাজ্যেরই একটি প্রদেশ। কাম্বোজিয় ও দারায়ুস, উভয় নৃপতিকেই মিশরী পুরোহিতেরা 'ফারাও' বলে বরণ করেছিলেন। অহুর-মাজদার উপাসক পারস্য-নৃপতিরাও ফারাওদের মত 'আমন' ও 'টা-'র পূজা আরাধনা করতে কোন দ্বিধা বোধ করতেন না। দারায়ুসের প্রশাসনিক বিধান মত মিশরশাসনের জন্য একজন 'ক্ষত্রপ' (Satrap) বা প্রদেশপাল নিযুক্ত হয়েছিল। ১৯০৭ সালের খননকার্যে এলিফ্যানটাইন নামক প্রাচীন মিশরীয় শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্যাপিরাসে লিখিত কতকগুলি পত্র উদ্ধার করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি পত্রে মিশরের পারস্য প্রদেশপালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পত্রটি লিখেছেন মিশরস্থিত ইহুদী সম্প্রদায় প্যালেস্টাইনের পারস্য শাসক বাগাওসকে খৃঃ পূঃ ৪০৭ অব্দে। পত্রের মর্ম এই যে, তিনি যেন মিশরীগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত ইহুদীদের জাভে মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ কার্যে সাহায্য করেন।

ইতিমধ্যে গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধে পারস্য-রাজ দারায়ুসের অপ্রত্যাশিত পরাজয় ঘটে ম্যারাথনের সমরাঙ্গনে, এবং ততোধিক শোচনীয় পরাভবের সম্মুখীন হলেন তাঁর পুত্র সম্রাট খ্ষায়র্ষ বা জারেক্‌জেস (Xerxes) প্লেটিয়া সালামিস প্রভৃতি যুদ্ধে (খৃঃ পূঃ ৪৮০)। পারস্য-সাম্রাজ্যের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রথম সূত্রপাত যখন দেখা দিল, মিশর তখন 'সেটেটু-রা' (Setetu-ra) বা 'রা-নন্দন' ফারাও-প্রতিম পারস্য-রাজের মুখের পানে চেয়ে অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করে নি। দারায়ুসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মিশরে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল (খৃঃ পূঃ ৪৮৪-৪৮৩)। কিন্তু সেই বিদ্রোহ অবলীলাক্রমে দমন করেছিলেন জারেকজেস, এবং সেই সঙ্গে মিশরের ওপর পারসীক প্রভুত্ব এমন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের কলঙ্ক সত্ত্বেও পারস্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবার আর কোন চেষ্টা করে নি মিশর। পক্ষান্তরে গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযানে মিশর পারস্যরাজ জারেক্‌জেস্‌কে সাহায্যই করেছিল। তারপর পারস্যের নৌ-

শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিশরে গ্রীকদের অভিযান সুরু হল সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে। খৃঃ পূঃ ৪৫৯ অব্দে এথেন্স-এর নৌবাহিনী নীলনদীর তীরে পারসীক সৈন্যদলকে যুদ্ধে পরাস্ত করে মেমফিস নগর অধিকার করে। পরিশেষে এই অসমসাহসিক গ্রীক অভিযান বিপুল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। খৃঃ পূঃ ৪৫৬ অব্দে পারস্যরাজ আর্তজারেক্‌জেস্ (**Artaxerexes**) একটি সুবৃহৎ বাহিনী পাঠিয়েছিলেন মিশরে সেনাপতি মেগাবাইজাসের (**Megabyzus**) অধিনায়কত্বে এবং এই সেনাপতি গ্রীকদের মিশর থেকে বিতাড়িত করেন।

পারস্যরাজ দ্বিতীয় দারায়ুসের রাজত্বকালে মিশরে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল (৪০৭ খৃঃ পূঃ)। মিশরীরা তখন ইহুদীদের মন্দির ধ্বংস করেছিল, এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ইহুদীরা প্যালেস্টাইনের পারসীক ক্ষত্রপ বাগাওসকে পূর্বোক্ত পত্রখানি লিখেছিল। কিন্তু পারস্য সাম্রাজ্য হীনবল হয়ে পড়েছিল, বাগাওস অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পারেন নি। এখন থেকে মিশর পারস্যের হস্তচ্যুত হয়ে পডেছিল। মিশরের নূতন ফারাও তাখোস বিদ্রোহী ক্ষত্রপের সহযোগে সসৈন্যে ইউফ্রেটিস অতিক্রম করলেন পারস্য আক্রমণের জন্য। কিন্তু তাঁর এই অভিযান ব্যর্থ হল। সাম্রাজ্যের অবসান যখন আসন্নপ্রায়, এমন সময় পারস্যের ভাগ্যক্রমে ফারাও তাখোসের বিরুদ্ধে অধীনস্থ সৈন্যদল অস্ত্রধারণ করলো। তাখোস তখন মিত্রবাহিনী পরিত্যাগ করে সুসায় গিয়ে পারস্যরাজ দ্বিতীয় আর্তজারেক্‌জেসের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু পারস্যের এই জয়লাভ স্থায়ী হয় নি। তৃতীয় আর্তজারেক্‌জেসের রাজত্বকালে মিশর-রাজ নেকটানেবো স্বাধীন হয়ে উঠলেন, তাঁর গ্রীক পরিচালিত বাহিনী পারসীকদের পরাস্ত করে বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও শেষ রক্ষা হয় নি। নেকটা-নেবো পরিশেষে পারসীকদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মিশর ছেড়ে ইথিওপিয়ায় পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল (৩৪২ খৃঃ পূঃ)।

খৃঃ পূঃ ৩৩৬ অব্দে আলেকজাণ্ডার মেসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেই গ্রীসে অবতরণ করেন এবং গ্রীকগণ কর্তৃক সেনাপতি পদে বৃত হন। দুই বছর পরে আরম্ভ হয় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ পারস্য অভিযান। খৃঃ পূঃ ৩৩৩ অব্দে ইসাসের যুদ্ধে (**Battle of Issus**) পারস্য-সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস (**Darius III**)-কে পরাজিত করে পরবর্তী বৎসরে মিশরে প্রবেশ করেন তিনি। মিশর তখন পারস্য থেকে ছিন্ন হয়ে পডেছিল, মিশর-বিজয়ে আলেকজাণ্ডার কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হন

নি। ফারাওদের রাজধানী মেমফিস-নগরে সসৈন্যে উপনীত হলেন তিনি এবং সেখানে এপিস (Apis) ও অন্যান্য মিশরীয় দেবতার পূজা ক'রে নিজেকে দেবাদিদেব আমন-রা'র পুত্র বলে প্রচার করলেন। তাঁর এই দাবীকে জনগণের গ্রহণীয় করবার জন্য প্রয়োজন, পুরোহিতকুলের সমর্থন ও দেবতার মুখঃনিসৃত দৈববাণী। এই দুইটি অভীষ্টলাভের জন্য তিনি সিওয়ার মরু-উদ্যানে (Oasis of Siwah) আমনদেবের মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। পুরোহিতরা তাঁকে সাহায্যদানে কার্পণ্য করেন নি। কথিত আছে, দৈববাণী (oracle) হয়েছিল, তিনি আমন-রা'র পুত্র। খৃঃ পূঃ ৩৩১ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়া নগরের ভিত্তি পত্তন করেছিলেন তিনি ভূমধ্যসাগরতীরে।

আলেকজাণ্ডারের• দিগ্বিজয় ভুবনবিখ্যাত। ব্যাবিলন, পারস্য, এমন কি সুদূর ভারতের পঞ্চনদীর তীর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এই দিগ্বিজয়ী বীর শ্রান্ত-ক্লান্ত সৈন্য সহ ব্যাবিলনে ফিরে আসেন, এবং সেখানে নিতান্তই অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে (খৃঃ পূঃ ৩২৩)। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল। মিশরের ভাগ্যবিধাতা হলেন 'টোলেমি' (Ptolemy) নামক জনৈক গ্রীক সেনাপতি, তিনিই মিশরে টোলেমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মিশরে গ্রীক সংস্কৃতির উন্নত আদর্শ তুলে ধরেছিলেন মার্জিত রুচি টোলেমিরা। জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল আলেকজান্দ্রিয়া। কিন্তু এ-গৌরব গ্রীসের, মিশরের নয়— যদিও গ্রীক সংস্কৃতির আদিগুরু হিসাবে মিশরের দাবী অকিঞ্চিৎকর নয়। টোলেমি রাজারা যেমন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী, তেমনি প্রাচীন স্থাপত্যের ধারা-পরম্পরা বজায় রাখতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কারনাকে প্রথম ইউয়েরগেটিস-এর তোরণদ্বার (Gateway of Euergetes I) তেমনি স্থাপত্যের নিদর্শন।

খৃঃ পূঃ ৪৮ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করতে এসেছিলেন সুবিখ্যাত রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সিজার (Julius Caesar)। তখন মিশরের অধীশ্বরী টোলেমিবংশীয়া রানী ক্লিওপেট্রা (Cleopetra)। সিজারের অভিপ্রায় ছিল ক্লিওপেট্রাকে একটি সন্তান দান করবেন তিনি, আর সেই সন্তান রোমের সঙ্গে মিশরকে যোগসূত্রে বেঁধে দেবে। সিজারের এই বাসনা ফলপ্রসূ হয় নি। রোমে আততায়ীর হস্তে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর দেশপ্রেমিক মহাবীর মার্ক এনটনি (Marc Anthony) মিশরে এসে

অপরূপ সৌন্দর্যবতী রানী ক্লিওপেট্রার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে যখন কর্তব্য কর্মের প্রতি উদাসীন, তখন রোমের শাসক অকটেভিয়াস এলেন তার শাস্তি বিধানের জন্য। ক্লিওপেট্রা ছিলেন কুহকিনী, পরম ছলনাময়ী, নব আগন্তুকের হাতে প্রেমাস্পদকে তুলে দেবার জন্য একটি ফাঁদ প্রস্তুত করবার সংকল্প করলেন। এই যাদুকরীর কাহিনী অবলম্বন করে মহাকবি সেক্সপিয়র 'এনটনি ও ক্লিওপেট্রা' নামে একটি অবিস্মরণীয় নাটক রচনা করেছিলেন। একদিকে এনটনির ব্যথিত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে বলছে, "ডাইনী মরবে। সে আমাকে একজন রোমান বালকের কাছে বিক্রি করেছে। আমি তার ষড়যন্ত্র জালে জড়িত, এবং সেজন্য তাকে মরতে হবে।" অন্যদিকে ক্লিওপেট্রাকে বলছেন এনটনি, "আমি মরতে চলেছি, মিশরও মরতে চলেছে। আমি শুধু চাই, মৃত্যু যেন ক্ষণতরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, যে পর্যন্ত না তোমার অধরে আমি সহস্র চুম্বনান্তের শেষ শীর্ণ চুম্বনটি মুদ্রিত করি।"

I am dying, Egypt dying ; only
I here importune death awhile until
Of many thousand kisses the poor last
I lay upon thy lips.

এনটনি মরলেন, পরিশেষে এই বিষকন্যাকেও বিষপানে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। মিশর রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল (খৃঃ পূঃ ৩০)। প্রাচীন মিশরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেল।

৯

মিশর পতনের কারণ কি ?

বহির্দেশের আঘাত ও চাপ দেশের ওপর পড়ে জাতিকে অনেক সময় পুনরুজ্জীবিত করে তোলে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মিশরে দেখা গেছে যখন সমবেত জাতীয় শক্তি নীল উপত্যকার পুণ্যভূমি থেকে হিক্‌সোসদের বিতাড়িত করেছিল। আবার এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়, দীর্ঘকালের পরাধীন জাতির চারিত্রিক অধঃপতন সত্ত্বেও তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি একেবারে মুছে যায় নি। কিন্তু ইতিহাসের পরিণতি আমরা ভিন্ন রূপে দেখতে পাই যেমন ব্যাবিলোনিয়ায় তেমনি মিশরে। যুগ যুগান্ত ধরে সংস্কৃতির যে শীর্ণ ধারা বয়ে চলেছিল, সেই প্রবাহ ক্রমে শুকিয়ে গিয়ে প্রাণহীন কাঁকরের ওপর রেখে গেছে শুধু কতকগুলি অতীতের পদচিহ্ন, যা দেখে মানুষ বিস্ময়াবিষ্ট হয়, কিন্তু তার মনে কোন প্রেরণাই জাগে না। সভ্যতার সূচনা থেকে চার হাজার বছর ধারাপরম্পরায় চলে এসেছিল বিপুল সুমহান মিশরীয় সংস্কৃতি, আশ্চর্যের বিষয় এই যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর সে দেশে এমন একজন ব্যক্তিও ছিল না যে অগণিত স্মৃতিস্তম্ভে খোদিত বা সমাধি-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে লিখিত চিত্র-লেখনগুলি পাঠ করতে পারে! শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে, প্যাপিরাসের রাশি রাশি গ্রন্থ প্রাচীন গ্রন্থাগার সমূহের তাকের ওপর সযত্নে সাজানো, কিন্তু কি শিলালিপি কি গ্রন্থের লিখন কোনটিরই পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি যতদিন না রোজেটা পাথর আবিষ্কৃত হয়েছিল, আর শাঁপোলিয়ঁ করেছিলেন তার মর্মোদ্ঘাটন। সংস্কৃতির বিলোপ একটা মস্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এ-কথাও তেমনি সত্য, এই বিরাট গগনস্পর্শী মিশরীয় অচলায়তনের প্রতিটি কীর্তিই এক একটি আলোক-গৃহ, যা আগামীকালের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রীদের সম্ভাব্য বিপদ থেকে দূরে সরে থাকবার জন্য বারবার হুঁশিয়ারী সংকেত জানিয়ে দেয়। আর সেজন্যেই আজকের দিনেও মিশরের অতীত বিস্মৃত যুগের মহান সভ্যতার শোচনীয় পরিণামের কারণ উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আছে।

রাজশক্তিকে দেবশক্তি, নৃপতিকে দেবতার অবতার রূপে কল্পনা—'মহতী

দেবতা হ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি' (মনু)—এই ভাবটির প্রকৃষ্ট প্রাচীন দৃষ্টান্ত স্থল মিশর,—যদিও সুমেরীয় যুগের শেষভাগে ব্যাবিলোনীয় পূজারী-নৃপতিরাও দেবত্বের দাবী করেছিলেন। দেবতার সম্মান লাভ করলেই দেবতার দায়িত্বজ্ঞান জেগে ওঠে না, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্যবুদ্ধিও প্রবুদ্ধ হয় না। বরঞ্চ ঐ রকম সম্মান গ্রহণ বা আদায় করে রাজা বিপথগামী হয়েছেন, ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দিয়ে থাকে। মিশরের 'প্রাচীন রাজ্যে'র নৃপতিরা দেবতার অবতাররূপে জনসাধারণের পূজ্য ছিলেন বলেই জনহিতের মহত্তর আদর্শ ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন পিরামিড নির্মাণ করে নিজেদের দেবতার মর্যাদা দান করতে। এতবড় নির্মাণকার্য পৃথিবীর আর কোন স্থানে সম্ভব হয় নি—এমন কি ব্যাবিলনেও নয়—তার কারণ প্রজাদের গভীর রাজভক্তি, রাজার দেবত্বে অগাধ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জন্যই লক্ষ লক্ষ লোক অমানুষিক পরিশ্রম করেছে নিজেদের রিক্ত করে—শোষণের বিরুদ্ধে, অপরিমিত শক্তির অযথা অপব্যয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি। ফলে সভ্যতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ধ্বংসের বীজও বপন হয়ে গিয়েছিল। বংশের পর বংশ ফারাওদের প্রধান কাজই ছিল বিরাট সমাধিমন্দির নির্মাণ, আত্ম-প্রশস্তির দ্বারা চির-অমরতা লাভের আশায়। সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতীয় শক্তিকে বিপথে চালিয়েছিলেন তাঁরা, যে-শক্তির প্রয়োজন ছিল জাতির সর্বাধিক কল্যাণ বর্ধনের জন্য। কিন্তু শুধু পিরামিডের বিরাট ভারেই মিশর ভেঙে পড়েনি —সেই বোঝাকে আরও ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল লেখকের দল যারা লিখতো রাজার প্রশস্তি, গাইতো রাজার গুণ, আর আহার করতো দরিদ্র কৃষকের শ্রমজাত অন্ন। রাজার দেবত্ব বজায় রাখবার পক্ষে অপরিহার্য যন্ত্র এই লেখকের দল, সে-কথা তারা ভাল করেই জানতো, এবং জাতিধর্ম ও সম্প্রদায় হিসাবে এই অদ্ভুত সমাজ-ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ তারা নিয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশের ভরা এখানেও পূর্ণ হয় নি। সাম্রাজ্যযুগে দেখা দিয়েছিল পুরোহিতকুলের অভ্যুত্থান, এবং তাদের আহার সংস্থানের ভার পড়েছিল সেই সনাতন 'গৌরী সেন' কৃষক শ্রেণীর ওপর। সম্রাট তৃতীয় থাটমোসের আমলে পূজারী সম্প্রদায় একটি সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন, আর সেই সঙ্ঘের পরিচালক ছিলেন আমন-রে'র প্রধান পুরোহিত। এই পূজারীসঙ্ঘ জাতীয় কল্যাণের প্রতি দৃকপাত করেন নি, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক স্বার্থ। এইরূপে শ্রেণীগত স্বার্থবুদ্ধি দেশাত্মবোধকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অপর পক্ষে, হিকসোসদের আক্রমণের ফলে

যে নবশক্তি জেগে উঠেছিল, বিদেশী বিতাড়নের পালা সাঙ্গ করে সেই নব উদ্দীপনা শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অবাঞ্ছনীয় সামরিক মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল। ফারাওরা দিগ্বিজয় সুরু করেছিলেন আসিরিয়ার মত, ফলে মিশর সামগ্রিকভাবে বিপুল ধন সম্পদের অধিকারী আর নগরগুলিও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু নিছক সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যথাকালে দেখা দিয়েছিল। মিশরের ধনরত্ন শ্রম-জাত নয়, অধিকৃত দেশসমূহের লুণ্ঠন দ্বারা অর্জিত হয়েছিল। সে ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার করা হয় নি, লুণ্ঠিত সম্পদ ফারাওর ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে, তার কতক অংশ লাভ করেছে পুরোহিতকুল আর কিয়দংশ অভিজাতবৃন্দ। কিন্তু জনগণের দারিদ্র্য মোচন স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ও অন্যান্য হিতকর কার্য যার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর সব চেয়ে বেশি, সেই সব অতি প্রয়োজনীয় কর্মানুষ্ঠানে সামান্যই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। পিতৃপুরুষের ক্ষুদ্রাকৃতি দেবালয়ের স্থলে সাম্রাজ্যযুগে বিরাট মন্দিরসমূহ নির্মাণ করা হয়েছিল, এইসব দেবমন্দির ছিল রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক জীবনের কেন্দ্রভূমি। কিন্তু সমাজ ও অর্থনীতি ছিল সামন্তিক ব্যবস্থার ঘোর অবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তার ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মমন্দিরগুলি তার ওপর কোন সেতু বেঁধে দেয় নি, বরঞ্চ মন্দিরের কাজে অগণিত দাস নিযুক্ত করে সামাজিক অব্যবস্থাকেই কায়েম করে রেখেছিল। ধর্মমন্দিরের পূজারীদের সঙ্গে ফারাওর দ্বন্দ্বে পরিশেষে ধর্মমন্দিরগুলিই ফারাওকে গ্রাস করে বসেছিল। কিন্তু কি পুরোহিতের সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্ব, কি বহিঃশত্রুর মিশর আক্রমণ, এরূপ কোন অশান্ত অবস্থাই গণ-জীবনকে বিচলিত করতে পারে নি, জনগণ ছিল নির্লিপ্ত নির্বিকার—কেন না, মিশরের সমাজ-ব্যবস্থাই ছিল তাদের দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার প্রধান অন্তরায়।

সভ্যতার সংবৃদ্ধি একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নয়, আদিম জাতিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে কথাটির সারবত্তা উপলব্ধি হয়। আদিম জাতির সভ্যতার সংবৃদ্ধি অর্ধপথেই বন্ধ হয়ে গেছে, নানা কারণে জাতির উদ্ভাবনী শক্তির বিলুপ্তির সঙ্গে জীবন গতানুগতিক ধারায় বয়ে চলেছে, কিন্তু এখনো সে সব জাতি প্রাণগতিক নিয়ে বেঁচে আছে। সভ্যতারও তেমনি স্বাস্থ্যভঙ্গ হলেই যে তখনি মৃত্যু ঘটবে এমন কোন কথা নেই। তাই আমরা দেখতে পাই, স্বাস্থ্যভঙ্গ যৌবনাবস্থায় ঘটলেও দীর্ঘকাল টিঁকে ছিল মিশরীয় সংস্কৃতি তার উদ্দাম প্রাণশক্তির বলে। হিকসোসদের

আক্রমণের পূর্বে যে দু হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে, তার মধ্যেই মিশরীয় সভ্যতার জন্ম, বিবৃদ্ধি ও পতন ঘটেছিল। তারপরও প্রায় দু হাজার বছর মিশরের অস্তিত্ব ছিল, এই সুদীর্ঘ সময়ে সেখানে অবস্থার নানারূপ পরিবর্তন উত্থান পতন ঘটেছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতে কোন নব-সৃষ্টি দেখা যায় নি। সাম্রাজ্যযুগের যে-সব সুবৃহৎ ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন আমাদের চোখ ঝলসিয়ে দেয়, বিদগ্ধ দৃষ্টির বিচারে সেগুলির মধ্যে শুধু কতকগুলি প্রাচীন রীতিনীতি ধারাপদ্ধতির অনুকরণ প্রবৃত্তিই (mimesis) প্রকাশ পেয়ে থাকে। সমাজ-রক্ষার ব্যবস্থায় অনুকরণ প্রবৃত্তির মোটামুটিভাবে প্রয়োজন অস্বীকার করবার উপায় নেই। কারণ, যে-সৃজনশক্তির প্রভাবে মনুষ্যসমাজে প্রগতি সম্ভবপর, অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সেই শক্তির অধিকারী, তারাই প্রকৃত গণনেতা—আর জনসাধারণের গড্ডালিকা সেই সব গণনেতার অনুগমন না করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। এই হিসাবে অনুকরণ প্রবৃত্তি সামাজিক ড্রিলেরই কাজ করে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিয়ে ("Mimesis is a social drill"—Toynbee)। পক্ষান্তরে অনুকরণ প্রবৃত্তির একটি মারাত্মক কুফল এই যে ব্যক্তি অচিরেই যন্ত্রে পরিণত হয়, জাতির উদ্ভাবনী-শক্তি লোপ পাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, আর সেই অবস্থায় ঘরে বা বাইরে যদি কোন নূতন চ্যালেঞ্জের আবির্ভাব হয়, নিজেকে তখন রক্ষা করবার কোন সামর্থ্যই তার থাকে না। বস্তুত মিশরের শেষ দু হাজার বছরের ইতিহাস দেশকে ঠিক এমনি একটি শোচনীয় দুর্বিপাকের মধ্যেই নিক্ষেপ করেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রঃ টয়েনবি'র মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "During these two supernumerary millenia, a civilization whose previous character was so full of movement and meaning lingered on inert and arrested. In fact it survived by being petrified." বস্তুত উদ্ভাবনী ও সৃজনশক্তির অভাব সত্ত্বেও মিশর টিঁকে ছিল, তার কারণ সভ্যতা তখন পাথর বনে গিয়েছিল।

কালের তরঙ্গে মিশর ভেসে গেল, কিন্তু সে মৃত্যু দৈহিক—আত্মা তার চিরঞ্জীব, মানবজাতির জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা অবদানের মধ্যে বিরাজ করছে। কৃষি, ধাতুবিদ্যা, কারিগরি নির্মাণ ও বয়ন শিল্প, কাঁচ, কাগজ, কালি, পঞ্জিকা, ঘড়ি, জ্যামিতি, বর্ণমালা, এমনি সব জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু মানবজাতি মিশরের কাছ থেকে পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। পোশাক পরিচ্ছদ

অলঙ্কার আসবাবপত্র ইত্যাদি বিষয়ে সুরুচি, রাষ্ট্র পরিচালনা, শান্তিপূর্ণ প্রশাসন, শিক্ষা সাহিত্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিদ্যা, নীতিধর্ম, ন্যায়ের বিধান, এরূপ নানা ক্ষেত্রে মিশরের দৃষ্টান্ত উত্তরকালের জগৎ অনুসরণ করেছে। মিশরীয় শিল্প, বিশেষত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, কলা সৌষ্ঠবে রূপ-সৃষ্টির অভিনবত্বে অতুলনীয়, প্রাচীন বা আধুনিক কোন শিল্পই তার বিরাটত্বের বা শ্রেষ্ঠত্বের নাগাল ধরতে পারে নি। ফিনিসীয়, সিরীয়, ইহুদী, ক্রীটান, গ্রীক, রোমান—এই সকল জাতি তাদের সভ্যতার উপকরণগুলি মিশর থেকে সংগ্রহ করছে। মিশরীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির সেই মশালের আলো হাতে হাতে ফিরে পরিশেষে ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে, সব মানবের উত্তরাধিকার রূপে।

পতনের পরও মিশরে জনসাধারণের জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি। পুরানো সংস্কৃতি, বিশেষত ধর্ম দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত ছিল, এবং যতদিন না রোমান শাসকগণ সেখানে যিশু খৃস্টের নব-ধর্মের বার্তা বহন করে এনেছিল, প্রাচীন ধর্ম ততদিন অক্ষুণ্ণই ছিল। ইতিমধ্যে গ্রীকদের আমলেই মিশরীয় ভাষা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সে স্থলে চলেছিল গ্রীক। পরবর্তী কালে মুসলমান শাসন সুরু হবার সঙ্গে গ্রীক ভাষার পরিবর্তে জাতীয় ভাষা আরবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে মিশরীরা মুস্লিম শিল্প ও সাহিত্যকে এমন নিবিড়ভাবে বরণ করে নিলে যে একটি অতিপ্রাচীন জাতির বংশধর হয়েও দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে কার্যত তাদের কোন সম্পর্কই আর রইলো না। কিন্তু শহরের বাইরে তালকুঞ্জপরিবৃত পল্লী অঞ্চলে অতীতের কীর্তি-সমূহ দিকে দিকে ছড়ানো পড়ে ছিল, তারই মধ্যে বসবাস করে সেই সব প্রাচীন ঐতিহ্য গৌরবের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে জড়িত থেকে সেখানকার অধিবাসীরা তাদের মহিমাময় পূর্ব গরিমা একেবারে বিস্মৃত হতে পারে নি। পল্লীর চাষী—মিশরে যাদের বলা হত 'ফেলা' (fellah)—তাদের রূপকথা রীতিনীতির মধ্যে দেখা যায় প্রাচীন ঐতিহ্যের ইঙ্গিত, এমন কি, স্থানীয় দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির সেই বিগতযুগের ভাবধারার জের। কথিত আছে, উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের তত্ত্বাবধানে ফারাওদের কয়েকটি মামি সমাধিগর্ভ থেকে তুলে নৌকা-যোগে অন্যত্র নিয়ে যাবার সময় সারা দেশের পল্লীবাসীরা নীল নদীর উভয় তীরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং তাদের পূর্বপুরুষদের রাজ-শাসকবৃন্দের অপসারণে স্বজনবিচ্ছেদের শোকে অভিভূত হয়ে বক্ষে করাঘাত করে ক্রন্দন করেছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

সংস্কৃতির পরিচয়

১

ধর্ম চিন্তার ধারা

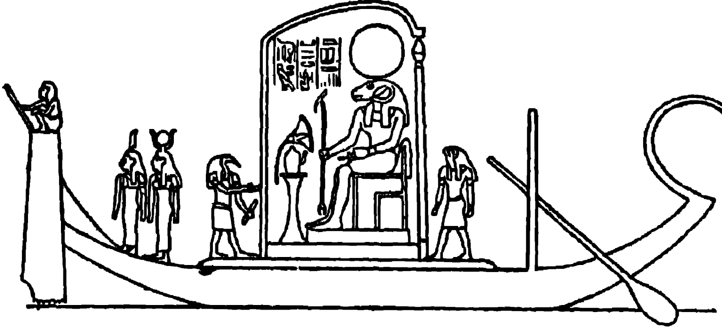
প্রাচীন মিশরের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় পিরামিড ও সমাধি-মন্দিরে। মিউজিয়ামে মিশরের যে-সব জিনিস রাখা আছে তাও সমাধি থেকেই উদ্ধার করা। আমরা কোন রাজপ্রাসাদ, হর্ম্য বা প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই না। গৃহ-নির্মাণের কাজে কাষ্ঠ বা কাঁচা অর্থাৎ রৌদ্রে শুকানো ইটের ব্যবহার হত,সেগুলি সব ধ্বংস পেয়েছে। পক্ষান্তরে পিরামিড ও সমাধিমন্দিরগুলি যেন কোন কালে ধ্বংস না হয়, এমনি পাকা রকমে পাথর দিয়ে বা পাহাড় কেটে তৈরি। ভাবটি ছিল যেন এইরূপ: মানুষের ঐহিক জীবন ক্ষণস্থায়ী, তার বাসগৃহের বিলোপ হলে ক্ষতি নেই—কিন্তু পারত্রিক বাসস্থানকে চিরস্থায়ী করা চাই, কেন না অনন্তকাল ধরে মৃত ব্যক্তি সেখানেই বসবাস করবে। কিন্তু এমনিধারা কল্পনার সঙ্গে মিশরীয় ধর্ম-চিন্তার সঙ্গতির অভাব অনেক স্থলেই দেখা যায়। অবশ্য, তিন হাজার বছরের চিন্তাধারায় পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষার প্রত্যাশা নিরর্থক। মিশরের ধর্মের ইতিহাসে এমন কোন দর্শনের আবির্ভাব হয় নি—যাতে করে মূলতত্ত্বের বিপরীত ভাবগুলির বর্জন অথবা পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা চলে। তাই এখানে কোন ধর্মতত্ত্বের ধারাবাহিক আলোচনা সম্ভব নয়। মিশরের নিসর্গ-প্রকৃতি ও মানবীয় পরিবেশ যুগে-যুগে যে সব চিন্তা ও ভাবের তরঙ্গ তুলে দিয়েছিল মানুষের মনে,তারই আলোকে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক (**physical and spiritual**) বিষয়ে তাদের ধারণাগুলিকে মোটামুটি ভাবে বিচার করতে হবে। দর্শনের যুক্তিতর্ক সঙ্গতি-অসঙ্গতি আপাতত শিকায় তুলে রাখাই সঙ্গত।

ধর্মই মিশরীয় সংস্কৃতির জীবন। 'টোটেম' থেকে সুরু করে সুমহান আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, সব রকম বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম। মিশরীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হলে মিশরের প্রকৃতি, বিশেষ করে মিশরের নীল নদী আর সূর্যের দিকেই আমাদের সবত্ন দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। তটভূমিকে জলসিক্ত করে নদী জীবনের সঞ্চার করে থাকে, সেখানে জন্মে শস্য। প্রতি বছর নীল নদীর জীবনে

জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক তৃষ্ণার্ত দুটি তীরের মধ্যবর্তী শীর্ণা নদীর জলধারা মন্দ হয়ে আসে। প্রাণহীন উপত্যকাভূমির অজস্র ধূলারাশি রৌদ্রতপ্ত বাতাসে উড়ে মরুবালুকার সঙ্গে মিশে গিয়ে দিগন্ত অন্ধকার করে দেয়। সারা দেশ হয় তখন মৃত্যুর রাজ্য, সজীব শ্যামলতার চিহ্নমাত্র কোথাও থাকে না। তারপর দেখা যায় জীবনের তড়িৎ স্পন্দন। পাহাড়ের বরফ-গলা জল দ্রুত নেমে এসে নদীকে স্ফীত করে তোলে, খরস্রোত বয়ে যায় উদ্দাম বেগে দুকূল ভাসিয়ে। পরিশেষে জল যখন ধীরে ধীরে নেমে যায় কৃষিক্ষেত্রের উপর উর্বর এক প্রস্ত পুরু মাটির স্তর জমা করে, মানুষ তখন প্রচণ্ড তাপের মৃতকল্প জড়তা ঝেড়ে ফেলে মহা উল্লাসে চাষের কাজে মন দেয়, জীবনের বীজ বপন করে—আর তখনই মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের জয়দুন্দুভি বেজে ওঠে। বৃষ্টিপাত তেমন নেই এদেশে, মনে হয় নদীর জল যেন জীবনদায়িনী সুধারূপে ভূগর্ভ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। পাতাল থেকে জল ওঠার অনুরূপ আর একটি আজগুবি কল্পনা করতে বাধে নি মিশরীদের। তারা সত্যই বিশ্বাস করতো, নীলাকাশের অন্তরালে আছে আর একটি নীল নদী, যা থেকে জলবর্ষণ হয় সকল দেশে।

নদীর উত্থান পতনের সঙ্গে জীবন-মরণের এই যে বিচিত্র লীলা—যা একটি বার্ষিক ব্যাপার, সূর্যদেবের উদয়াস্তকে সেই জীবন-মরণ নাটকেরই একটি নিত্য-নৈমিত্তিক অভিনয় রূপে কল্পনা করা হয়েছে। পূর্বাচলে সূর্যের নবজন্ম প্রতিদিন ঘটে, তরুহীন মরুদেশের নির্মেঘ আকাশে পলে পলে তার তেজের বৃদ্ধি ও হ্রাসকে অনুভব করা যায়, সায়াহ্নে অস্তাচলে সূর্যকে ডুবে যেতে মানুষ নিয়তই দেখে থাকে। মিশরীয় কল্পনা সূর্যের এই পর্যটনকে সেখানকার মানুষের নিজেদের ভ্রমণের মত করেই মানসপটে চিত্রিত করেছিল। অর্থাৎ মিশরীরা যেমন নৌকায় ভ্রমণ করে, সূর্যও তেমন কোন দ্যুলোকের সমুদ্র বা স্বর্গীয় নীল নদীর বক্ষের ওপরে তরী ভাসিয়ে যাত্রা করেছেন। কিন্তু সূর্যের এই নৌ-বিলাস মিশরবাসীদের কাছে শুধু কবির কল্পনামাত্র নয়—মানুষের ভ্রমণের মতই তা যথার্থ ও বাস্তব, এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে মিশরের অনেক প্যাপিরাস ও শিলালিপির বর্ণনায় ও চিত্রের অঙ্কনে। বিবরণে দেখা যায়, বজরার মাঝখানে আছে একটি কামরা, তার মধ্যে সূর্যদেব বসে বা দাঁড়িয়ে থাকেন। মাঝি হাল ধরে আছে, আর সেখানে বসেছে দেবগণের বৈঠক। বারো ঘণ্টা ভ্রমণের পর আলোর রাজ্য পেরিয়ে গিয়ে নৌকা প্রবেশ করে অন্ধকারের রাজ্যে, সেখানেও

ভাসতে ভাসতে যায় নদীর স্রোতে। সূর্যদেবের এই যাত্রা পথ মনুষ্যজীবনের প্রতীক বলেই মনে করেছে মিশরীরা। জন্মের পর মানুষ আলোর রাজ্যে পথ



সূর্যদেবের দিব্য বজরা—সিংহাসনে আসীন ছাগ-মুণ্ড দেবতা—শীর্ষে জ্যোতির্মণ্ডল—সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী থৎ ভাষণ দিচ্ছেন

চলে, শ্রান্ত হয়ে মৃত্যুর অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করে, সূর্যের জীবনও ঠিক তেমনি ধারা।

এই কল্পনাটি হাথর-সেকেটের (**Hathor-Sekhet**) উপাখ্যানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সূর্যদেবের দাহিকা-শক্তি হাথর-সেকেট দেবী, রুদ্র তেজের প্রতীক। সূর্যদেব রে (**Re**) স্বয়ম্ভু, দেবতা ও মানবের অধীশ্বর। মানুষেরা একত্র হয়ে সূর্যদেবকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বললে,—ঐ ছ্যাখো, রে হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ। তার অস্থি রূপায় পরিবর্তিত হয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়েছে সোনা, চুলগুলি হয়েছে রঙিন পাথর (**lapis lazuli**)। [ব্যঙ্গোক্তির ভাষা আমাদের কাছে অদ্ভুত বলেই মনে হয়!] এই কথা শুনে সূর্যদেব ক্রুদ্ধ হয়ে দেবসভার আহ্বান করলেন। দেবতাদের উপদেশ মত বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ করবার জন্য নিজের চক্ষুরূপিণী হাথর-সেকেট দেবীকে পাঠালেন তিনি। পৃথিবীতে এসে হাথর মানবজাতিকে বধ করতে প্রবৃত্ত হলেন···কিন্তু মানবজাতি নির্মূল হল না, তার কারণ সূর্যদেব রে'র মনে মানুষের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়েছিল।···তখন তিনি হাথর-সেকেট দেবীকে মদ্যপান করিয়ে মাতাল করবার ব্যবস্থা করে মানব-

জাতিকে রক্ষা করলেন। তিনি মানুষের অকৃতজ্ঞতায় বিরক্ত হয়েছিলেন, আর এখন তাদের শাসনকর্তা রূপে থাকতে চাইলেন না। এদিকে মানুষ অনুতাপ করতে লাগলো। সূর্যদেব রে দয়াপরবশ হয়ে তাদের তখন ক্ষমা করলেন এবং নিজের শক্তির পরিবর্ত-স্বরূপ আপন তরুণ পুত্রকে প্রভু ও রাজা করে রেখে এলেন।"* ফারাওরা ছিলেন 'রে-র পুত্র'—আমরা তা পূর্বে দেখেছি। এমন কি, রানী হাটসেপস্থটকেও আমন রে'র পুত্রী বলে নিজেকে প্রচার করতে হয়েছিল। এই কাহিনীটিতে নৃপতি সূর্যপুত্র হলেন কেমন করে, সেই বৃত্তান্তটি সবিস্তারে বলা হয়েছে।

ধর্মের সঙ্গে 'মিথ' (myth) বা পুরাণ-কথার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, মিথের স্বরূপ না জানলে ধর্মকে বোঝা যায় না। প্রাচীন ধর্ম ছিল কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানের (rites) সমষ্টি, আর অনুষ্ঠানগুলি পুরাণ-কাহিনীরই ব্যবহারিক রূপ বা আবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মলিনৌস্কি (Malinowski) বলেন, "**Myth is not merely a story told, but a reality lived···believed to have once happened in the primeval times, and continuing ever since to influence the world and human destinies.**" অর্থাৎ 'মিথ' শুধু একটি আখ্যায়িকা নয়, বাস্তব জীবনেরই সত্য-রূপ, যে সত্য জীবন যাপন করেছে মানুষ আদিকালে এবং যা এখনও জগতকে ও মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবান্বিত করে। সৃষ্টির আদিকালে দেবতার সঙ্গে মানুষের যে-সম্বন্ধটি গড়ে উঠেছিল, যেমন জমির উর্বরতা-বৃদ্ধি ও শস্য উৎপাদনের জন্য দেবতার ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান—সেই ব্যাপারগুলি নিয়ে রচিত নাটকের পুনরভিনয়ের নামই 'মিথ' বা পুরাণ-কথা। রূপকের ভাষায় যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে কাহিনীতে, নাটকের ভঙ্গীতে সেই ঘটনার বা অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি করলে আগেকার মতই উর্বরতার সৃষ্টি, শস্য উৎপাদন প্রভৃতি ফললাভ করা যায়—এই বদ্ধমূল বিশ্বাস থেকেই 'মিথ'-এর উৎপত্তি। অনুষ্ঠান প্রভৃতির রূপ বদলায়, কালক্রমে সেগুলি নষ্টও হয়ে যায়, কিন্তু 'মিথ' টিকে থাকে আখ্যায়িকা রূপে, এবং 'মিথ'-এর ধ্বংস নেই বলেই যুগে যুগে দৈব অনুষ্ঠানগুলির অনুকরণ সম্ভব হয়। দেবতাদের কাজের অনুকরণ দ্বারা ইষ্টলাভের কল্পনা যে-যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই যুক্তির নাম দেওয়া হয়েছে,

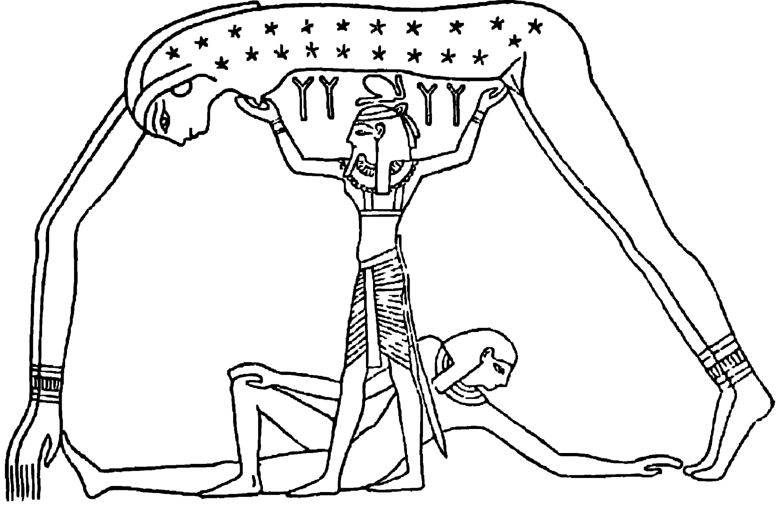
* **Weidemann : Realm of the Egyptian Dead.**

mythopoeic logic অর্থাৎ পুরাণ-কাব্যের যুক্তি। এই যুক্তি অনুসারে সাদৃশ্য বা সমত্বকে একত্বেরই নামান্তররূপে গ্রহণ করা হয়েছে—অর্থাৎ, 'কোন জিনিসের মত হওয়া আর সেই জিনিসটি হওয়া একই কথা। আমাদের বৈদিক গ্রন্থেও সমত্বের একত্বভাবকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে অনেক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে দেখা যায়। অনুকরণ দ্বারা ইষ্ট ফললাভের একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে কৌষীতকি উপনিষদে: "দৈবীমাবৃতমাবর্তে আদিত্যস্য ইতি দক্ষিণং বাহুং অন্বাবর্ততে।" অর্থাৎ—"আমি সূর্যের সঞ্চরণ ক্রিয়ার অনুকরণ করি, এই বলিয়া দক্ষিণ বাহু ঘুরাইবে।" কার্য দ্বারা দেবতার সমত্ব, মানে তার সঙ্গে একত্ব লাভ করলে মানুষ তার শক্তির অধিকারীও হতে পারে—ভাবার্থটা এইরূপ।

'মিথ'-এর উৎপত্তির ভিন্নরূপ কারণও নির্দেশ করেছেন পণ্ডিতরা। সেটি হল এই যে, 'মিথ' কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি বা রাজার জীবন-চরিত। এই মতবাদের সর্ব প্রথম প্রবর্তক খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দের গ্রীক দার্শনিক ইউহেমেরাস (**Euhemerus**)। তিনি বলেছিলেন, "ইতিহাসই 'মিথ'-এর ছদ্মরূপ ধারণ করেছে" (**"Myth is history in disguise"**)। তার মতে দেবতারা সুদূর অতীতের মহাকর্মী কৃতী মানুষ, যাদের পুরুষকার ও উদ্যম গণ-কল্পনায় শাখাপল্লবিত হয়ে আখ্যায়িকারূপে দেখা দিয়েছে। এই মতের সমর্থনে অধ্যাপক হোকার্ট (**Hocart**) আর একধাপ অগ্রসর হয়ে বললেন, "জগতের প্রাচীনতম ধর্মই হল এই বিশ্বাস যে, রাজা মহতী দেবতা। দেবতার পূজা যে রাজ-পূজার আগে আরম্ভ হয়েছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। সম্ভবতঃ রাজাকে বাদ দিয়ে দেবতা ছিল না কোনকালে, আবার দেবতাকে বাদ দিয়ে রাজাও ছিল না (**Perhaps there were never any gods without kings or kings without gods**)।"

'মিথ'-এর উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদের কথা বলা হল, সত্যাসত্য বিচার করবার জন্য নয়। সত্য সম্ভবতঃ উভয় মতবাদেই আছে—যদিও পুরোপুরি-ভাবে কোনটিতেই নেই। মিশরীয় ধর্মের মেরুদণ্ড 'অসিরিস মিথ'। এই 'মিথ'-এর মূলতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হলে ধর্মকে বোঝার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অসিরিস পূজার আবির্ভাব হয়েছিল অববাহিকা অঞ্চল থেকে, মিশরের চিরাগত ধর্ম ছিল সৌরদেবতার আরাধনা, এবং পঞ্চম

বংশের রাজত্ব কালের পূর্বেই রে-পুত্র ফারাওর সঙ্গে কৃষিদেবতা অসিরিস ঐক্যের গাঁট-ছড়ায় বাঁধা পড়ে গিয়েছিল, তখন অসিরিস পূজাই গণ-ধর্ম হয়ে উঠেছিল।* অতিপ্রাচীন কালে অসিরিস হয়ত বা সত্যই ছিলেন উত্তরাঞ্চলের কোন রাজা বা গণপতি যিনি কৃষির প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি যখন দেবতার



আকাশ-দেবী নুট—দেহ নক্ষত্র-খচিত—বায়ু-দেবতা সু তাঁকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে—পদতলে শায়িত পৃথিবী-দেবতা গেব—লক্ষ্যের বিষয় পৃথিবী-দেবতাকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে

মঞ্চে অধিরোহণ করে পূজিত হতে লাগলেন, তখন সেই পুরানো ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে 'অসিরিস মিথ' গড়ে উঠতে বিলম্ব হয় নি। এই মিথে আমরা যে অসিরিসের সাক্ষাৎ পাই, তার পিতা পৃথিবীর দেবতা 'গেব' আর মাতা আকাশ দেবী 'নুট'। প্রথমেই অসিরিসকে দেখা যায় সংস্কৃতির প্রবর্তকরূপে, যবাদি শস্য কিরূপে উৎপাদন করতে হয় মিশরীদের যে-শিক্ষা তিনিই

---

* ব্রেস্টেড বলেন, "In the solar faith we have a State theology with all the splendour and the prestige of its royal patrons behind it; while in that of Osiris we are confronted by a religion of the people, which made a strong appeal to the individual believer." (Breasted J. H.—The Development of Religious Thoughts in Anciet Egypt—p 140)

দিয়েছিলেন। জন-মানবকে কৃষিকর্মে শিক্ষা দানের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেরিয়েছিলেন। অসিরিসের একটি ভ্রাতা ছিল, সে একজন শয়তান প্রকৃতির মানুষ—নাম 'সেট' (Set)। ভ্রাতার প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি দেখে এই শয়তানটি ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরছিল। অসিরিস যেমনি মিশরে ফিরলো, অমনি ছল চাতুরি করে সেট তাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে ভরে সেটিকে নদীর জলে ফেলে দিলে। অসিরিসের পত্নী আইসিস (Isis) শোকার্তা হয়ে সারা দেশ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এদিকে যে-বাক্সটির মধ্যে অসিরিস আবদ্ধ ছিলেন সেই বাক্সটি ভাসতে ভাসতে সিরিয়ার বিবলাস (Byblus) নামক নগরে গিয়ে ঠেকলো, আর সেখানে একটি মায়া-তরু গজিয়ে উঠলো বাক্সটিকে পরিবৃত করে। সে-দেশের রাজার দৃষ্টি যখন গাছের দিকে পড়লো তিনি তখন গাছটি কেটে তাই দিয়ে তৈরি করলেন প্রাসাদের একটি স্তম্ভ। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে আইসিস গেলেন সেখানে। কিছুকাল রাজ পরিবারে শুশ্রূষাকারিণী রূপে থেকে তিনি সেই স্তম্ভটিকে নিয়ে মিশরে ফিরলেন। আইসিস তাঁর পুত্র হোরাসকে রেখে গিয়েছিলেন মিশরে, ফিরে এসে তার সন্ধান না পেয়ে আবার খোঁজে বেরুলেন। ইতিমধ্যে শয়তান সেট সেই বাক্সটিকে হাত করেছিল এবং তাই থেকে অসিরিসের দেহ বের করে সেটিকে খণ্ড খণ্ড করে কাটলো, তারপর সেই টুকরোগুলিকে মিশরের নানাস্থানে পুঁতে দিল।

প্রসঙ্গত এখানে মিশরের একটি অতি-প্রাচীন প্রথার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যার একটু আভাসও রয়েছে অসিরিস কাহিনীর মধ্যে। অন্যান্য অনেক আদিম মানবের মত প্রাগৈতিহাসিক মিশরবাসীরাও তাদের রাজার রাজত্ব কাল নির্দিষ্ট করে সীমা বেঁধে দিয়েছিল। রাজত্বকাল ত্রিশ বছর পূর্ণ হলে রাজাকে বধ করা হত, অথবা তাকে সিংহাসন চ্যুত করে তার আনুষ্ঠানিক মৃত্যুর উৎসব বেশ ঘটা করে সম্পন্ন করা হত, তাকে নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করে।

মিশরের একটি প্রধানতম দেবতা হয়েছিলেন অসিরিস—কৃষির দেবতা। পাথরে খোদাই-করা বা চিত্রাঙ্কিত যে প্রতিমূর্তি দেখা যায় অসিরিসের, তাতে তিনি রয়েছেন শায়িত, আর তাঁর দেহ দিয়ে যবের চারা ফুঁড়ে বেরিয়েছে। যে-ভাবে তার দেহের খণ্ডিত অংশগুলিকে নানা স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা আবাদি জমির ওপর শস্য বীজ ছড়ানোরই ইঙ্গিত করে। তা ছাড়া, অসিরিস-কাহিনী নীল নদীর জীবন-দায়িনী শক্তিরই প্রতীক। তট-

ভূমিকে প্লাবিত করে' রাশি রাশি কর্দম ভাসিয়ে নিয়ে আসে নীল নদীর খর স্রোত, যেমন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অসিরিসের বাক্সটিকে, তারপর শীর্ণতোয়া নদীপ্রবাহ যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখন উপকূলে পলি মাটিকে ফেলে রেখে যায় সেই বাক্সটির মতই এবং সেই মাটি থেকেই কাহিনীর যাদু-গাছের মত শস্য চারা গজিয়ে ওঠে। নীল নদীর হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে অসিরিসের জীবন-কাহিনীর এই অদ্ভুত সাদৃশ্যকে আকস্মিক বলা যায় না। সৃজন-শক্তি অসিরিস আর সংহার-শক্তি সেট—সৃষ্টি ও ধ্বংস, উর্বরতা ও বন্ধ্যাত্ব, সঞ্জীবন ও ক্লান্তি, জীবন ও মৃত্যু, এই দুইটি শুভ ও অশুভ শক্তির বিরোধই কাহিনীটির মধ্যে পরিস্ফুট। এ-ছাড়া চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গেও উপাখ্যানটিকে জড়ানো হয়েছে। অসিরিস পুত্র হোরাসের প্রতীক এই শশিকলা। পিতার জন্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে যে-কলা ক্ষয় হয়েছিল হোরাসের, শশিকলাবৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিদিন সেই ক্ষয়ই পূরণ হয়ে থাকে।

জীবন-কালে অসিরিস ছিলেন জীবন্ত মানুষের রাজা, মরণের পর হলেন তিনি মৃতের রাজা (King of the Dead)। মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে পুনরুজ্জীবনের (resurrection) অঙ্কুর, মৃতের দেবতা অসিরিসকে তাই জীবন-দেবতা রূপেই দেখতে হয়। শবাধারের পাশেই একটি নকল শস্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত করতো মিশরীরা এই বিশ্বাস করে—মৃত্যুর পর অসিরিসের দেহ থেকে গজিয়ে উঠেছিল শস্যের চারা, মৃত ব্যক্তিও যেন তেমনি পুনর্জীবন লাভ করে। সূর্যপুত্র ফারাওরা মৃত্যুর পর মৃতের দেবতা অসিরিস হতেন, মিশরীয় সভ্যতার আদি পর্বে এই বিশিষ্ট সম্মান ফারাও ছাড়া আর কেউ লাভ করতেন না। কিন্তু কালক্রমে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল, তখন সকল মৃত ব্যক্তিই 'অসিরিসত্ব' প্রাপ্ত হত। নিশীথ রাত্রের সূর্যদেবতাই অসিরিস, সমাধি-মন্দিরগুলি তাঁরই রাজ্য মধ্যে অবস্থিত—রাজাদের সমাধি-মন্দিরের প্রবেশপথের শীর্ষে অঙ্কিত আছে সূর্যের জ্যোতির্মণ্ডল (Sun's disc)। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দৃশ্যসমূহে ও চিত্রাঙ্কনে দেখা যায় মৃতের রাজ্য, যেখানে নিশীথ রাত্রের সূর্য দরিয়ায় তরী বেয়ে চলেছেন নবজীবন লাভ করবার জন্য। অদ্ভুত বিভীষিকাপূর্ণ কল্পনার খেলা রয়েছে ছবিগুলির মধ্যে—নানা রকমের অপদেবতার প্রতিমূর্তি আঁকা, মানুষের পশুর অথবা মরুভূমির ত্রাসরূপী সর্পের। অর্ধ-মানব অর্ধ-জন্তুর প্রতিকৃতিও দেখা যায় এই দানবকুলের মধ্যে। ছবির সঙ্গে প্রত্যেক দানবেরই নাম লেখা রয়েছে—কেউ বা সূর্য-দেবতার বন্ধু, অধিকাংশ মারাত্মকরূপেই শত্রুভাবাপন্ন। এই শত্রুদলীয় অপদেবতাদের মাথায় আছেন

'আপোপিস' (Apopis) নামে সর্পরাজ—আঁধারের দেবতা (Power of Darkness)—সূর্যদেবতাকে ধ্বংস করবার জন্ম তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। তারপর চলে সংগ্রাম। প্রতিবার সূর্যদেবের বন্ধুদের হাতে পরাজিত হন আঁধারের শক্তি, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হয় তাকে, খণ্ডিতও করা হয়, কিন্তু তাঁর বিনাশ নেই। সর্পরাজ আবার ফণা তুলে আলো তাপ ও জীবনের দেবতাকে দংশন করতে ছুটে যায়—চূড়ান্ত পরাজয় তাঁর কখনও হয় না। অনেক দেশেই এই বিশ্বাস প্রচলিত যে গ্রহণ দেখা যায় তখনই—যখন কোন দানব সূর্যদেবকে গ্রাস করে—যেমন রাহুগ্রস্ত সূর্য, আর সেই সময় হৈ হল্লা ঢাক ঢোল পিটিয়ে সূর্যকে দানবের কবল থেকে মুক্ত করবার প্রথা রয়েছে। মিশরীয় কল্পনায়, সূর্যের ওপর দানবের আক্রমণ কেবল গ্রহণ-কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রতিনিয়ত সেই আক্রমণ চলছে নিশীথ রাত্রে পাতালপুরীর অন্ধকারে। এই প্রসঙ্গে এ-কথারও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাইবেলে ঈশ্বরের সঙ্গে শয়তানের আর জরথুষ্ট্র ধর্মের শুভঙ্কর দেবতার সঙ্গে অশুভ শক্তির বিরোধ-কল্পনার অগ্রদূত বলেই মনে হয়, সূর্যদেবের সর্পরাজের দ্বন্দ্বের এই মিশরীয় চিত্রকে।

সূর্যদেব ও অসিরিসের জীবন-সঙ্গীতের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা মানুষের জীবন। 'শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতেব শস্যমিবা জায়তে পুনঃ' (কঠোপনিষৎ),—অর্থাৎ,"মনুষ্য শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং শস্যের ন্যায় পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে"। মানুষকে অসিরিসের জীবনের পুনরভিনয় করতে হয়, তাই মৃত ব্যক্তির জীবন-যাত্রার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে মিশরীরা জীবন্ত মানবের সমান, হয়ত বা তার চেয়ে বেশি। মৃতের জীবন বিষয়ে যে-সব কথা বহুযুগ ধরে লিখে গেছেন মিশরীরা প্যাপিরাসে বা সমাধির ওপর, সেই লিখনগুলি সংকলন করে কয়েকটি গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়েছে—যেমন 'আম-দুয়াত গ্রন্থ' (Book of Amduat), 'ফটকের গ্রন্থ' (Book of the Gates) এবং 'মৃতের গ্রন্থ' (Book of the Dead)। পরলোক বা অধোজগতের (under world) বিবরণ আছে বলে প্রথম গ্রন্থটির নাম 'আম-দুয়াত গ্রন্থ'। দ্বিতীয়টির নাম 'ফটকের গ্রন্থ' দেওয়া হয়েছে এই জন্ম যে, পরলোকে প্রত্যেকটি 'ঘণ্টার ব্যবধানের' (Hour-space) মধ্যে একটি করে ফটক আছে, মৃতকে সেই ফটকের ভেতর দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়। গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে 'মৃতের গ্রন্থ'ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দুই হাজার প্যাপিরাসের তাড়ার লিখিত এই বইখানির বিষয় ও বিবরণ নানা সমাধি

মন্দির থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। নানাবিধ মন্ত্র ও ফরমূলার সমাবেশ রয়েছে এই গ্রন্থে, মৃতের জীবনকে ঠিকভাবে পরিচালিত করবার জন্য। অধিকাংশই পিরামিড-কালের রচনা, কতকগুলি রচনা তারও পুরানো। রচনাটি প্রজ্ঞার দেবতা থং-এর—এমন কি হাতের লেখাও সেই দেবতারই, এই ছিল মিশরীদের বিশ্বাস। মৃতের রাজ্যে মানুষের অবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

মৃত্যুর পর সকল মানুষই 'অসিরিসত্ব' প্রাপ্ত হয়, এই ধারণাটির সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ, কর্ম নির্বিশেষে সুকৃতি ও দুষ্কৃতিকারী সকলেই যদি পরলোকে 'অসিরিসত্ব' লাভের অধিকারী হয়, তাহলে ন্যায়নিষ্ঠা বা ঋতের আদর্শকে রক্ষা করা যায় না। তাই 'অসিরিসত্ব' লাভ করবে সুকৃতিকারী নর—এই ব্যবস্থাই করতে হয়। একটি চিত্রে দেখানো হয়েছে, সব সভায় মৃত মানুষের চরিত্র ওজন করে বিচার। মৃত্যুর রাজ্যে মৃতের চরিত্রের বিচার—যে দৃশ্যটি ছবিতে আঁকা রয়েছে, তারই বিস্তারিত বর্ণনা 'মৃতের গ্রন্থে' পাওয়া যায়। মৃতের যাত্রাপথ পশ্চিমদিকে প্রসারিত—সূর্য যেখানে অস্ত যান, সেই মরু-সিন্ধুর পরপারে চিরতৃপ্তির অমর নিকেতন। পায়ে হাঁটা পথ, নৌকা পথ—হিংস্র জন্তু শ্বাপদ ব্যালনক্র যাত্রাকে করে বিঘ্নসঙ্কুল। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে 'দুই-সত্যের সভাগৃহে' (**Hall of the Double Truth**) গিয়ে পৌঁছায় সে। সেখানে অসিরিস বসে আছেন সিংহাসনের ওপর, দেবগণ পরিবৃত হয়ে। শেয়াল-মুখো দেবতা 'আনুবিস' পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন মৃত ব্যক্তিকে অসিরিসের দরবারে। ধর্মাধিকরণে মহা-বিচারকের কাছে মৃতের আত্মা হয়ত বা এমনিভাবেই করুণা ভিক্ষা করে :

কালকুৎ আমি দেব ! বসতি তোমার জীবনের মর্মমাঝে, পুত্র আমি,
আমার পাপের ভার দেখে তুমি নত শির, লজ্জায় ম্লান, দুঃখে কাতর
শাস্তি দাও ওগো শাস্তি দাও—ধুয়ে ফেল পাপরাশি।
তোমার আমার মাঝে ব্যবধান চূর্ণ হোক।

অসিরিসের দরবারে এমনি অনুতাপ করে' মৃতের আত্মার চিত্তশুদ্ধির দরকার হয়। আর যদি সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা অনুতাপ না করে, তাহলে তাকে ৪২টি পাপের নাম করে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করতে হয়। ইতিহাসে মানুষের নীতিজ্ঞান বোধ করি সর্বপ্রথম প্রকাশ পেয়েছিল এই ঘোষণাটিতে :

"হে পরম ঈশ্বর, সত্যের ও ন্যায়ের প্রভু, তোমাকে প্রণাম। তোমার কাছে

এসেছি প্রভু সত্যকে বহন করে…আমি কোন ব্যক্তির প্রতি অবিচার করিনি, দরিদ্রের ওপর অত্যাচার করি নি…আমি স্বাধীন মানুষকে তার ইচ্ছার অতিরিক্ত শ্রম জোর করে করাই নি…কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করিনি, দেবতার অনভিপ্রেত কোন কাজ করি নি…ইত্যাদি…আমি পবিত্র, আমি পবিত্র।"

এই সত্যপাঠ যাচাই করেন জ্ঞানের দেবতা থৎ (Thoth) এবং অসিরিস পুত্র হোরাস। মৃতের হৃদ্‌পিণ্ড দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা হয়, একটি পাল্লায় ন্যায়ের প্রতীক (Symbol of Justice)-কে রেখে। তারপর ফলাফল ঘোষণা করেন থৎ। শাস্তি বা পুরস্কারে বিশেষ বর্ণনা নেই 'মৃতের গ্রন্থে'। শাস্তির বিষয় এই মাত্র হয়েছে যে, দুষ্কৃতিকারীকে কোন ভক্ষকের (Devourer) কাছে দেওয়া হয়, তাকে ধ্বংস করবার জন্য।

'ফটকের গ্রন্থ'ও এই বিচার দৃশ্যের বর্ণনা আছে, কিন্তু একটু ভিন্ন রকমের। পরলোকে নানা ফটকের মধ্য দিয়ে বিচার কামরায় ঢুকতে হয়। এই বিচার কামরার সংলগ্ন দুটি দ্বার দিয়ে স্বর্গ ও নরককুণ্ডে প্রবেশ করা যায়। পুণ্যাত্মারা 'আলু'-নামক (Field of Aalu) স্বর্গধামে গিয়ে মনের আনন্দে শস্যক্ষেত্র চাষ করে, আর পাপাত্মাদের নরককুণ্ডে পাঠিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় জলন্ত আগুনে অথবা গভীর সমুদ্রে তাদের নিক্ষেপ করা হবে বলে। এই সব কথা চিত্রে আমরা পাই ইহুদীদিগের 'শেষ বিচার দিনে'র (Day of Judgment) পূর্বাভাস, আর ইতালীয় কবি দান্তের (Dante) নরক-কল্পনা। পুণ্যাত্মাদের 'আ-লু'-বা স্বর্গকে কল্পনা করা হয়েছে 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' নদী উপত্যকা-রূপে, সেখানে দেবতাদের সঙ্গে বসবাস করেন মৃত ব্যক্তিরা, স্বর্গ সুখ উপভোগ করেন। অতি প্রাচীনকালের বেলায় স্বর্গের অবস্থান উত্তরায়ণেই নির্দেশ করা হয়েছিল, সেখানে রয়েছে ধ্রুবতারা স্থির অচঞ্চল। কিন্তু কালক্রমে অসিরিস-পন্থীরা পশ্চিমদিকে সূর্যের অস্তাচল অভিমুখে মৃতের যাত্রাপথ বলে ধরে নিয়ে ত্রিদিবের স্থান করে দিয়েছিলেন অধোজগতে এই ভরসায় যে সেখানে সূর্যের সান্নিধ্যে অমিত তেজপ্রভাবে মৃত ব্যক্তি সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার—মিশরীদের এই বিশ্বাস সর্বজনীন হয়ে ওঠে নি। পরলোক একই গতি পুণ্যবান ও পাপীর, এই বিশ্বাসটিরও প্রচলন ছিল। মৃত্যুর পরপারে মহাশূন্য রয়েছে মুখব্যাদান করে, সেখানে সুখ-দুঃখের স্থান নেই, হয়ত বা দেহের সঙ্গে আত্মাও ধ্বংস পায়, আধুনিক জগতে এরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে

নীতিজ্ঞানের কোন রকম বিরোধ না থাকারই কথা। অর্থাৎ কর্মের ফল-স্বরূপ পরলোকে শাস্তিভোগ ও পুরস্কার লাভ যারা বিশ্বাস করেন না, তাদের পক্ষেও নৈতিক জীবনের সুমহান আদর্শকে গ্রহণ করা বিচিত্র নয়, অযৌক্তিকও নয়। কিন্তু প্রাচীনকালে কর্মফলে বিশ্বাসের অভাব থেকে 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এমনি একটি উৎকট চার্বাক-দর্শন বা 'এপিকিউরিয়ানিজম্'-এর সৃষ্টি হয়েছিল। সেই আত্মম্ভরী দর্শনেরই সাক্ষাৎ পাই আমরা মিশরের কোন পরলোকগতা পত্নীর স্বামীর উদ্দেশে উপদেশ ছলে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলির মধ্যে : "হে আমার সাথী, আমার স্বামী, পান আহার বন্ধ কর না, মদিরা পানে মাতাল হয়ে থেকো, স্ত্রীসঙ্গ আনন্দ কিছুই যেন ছেড়ো না। পশ্চিম দেশে মৃতের যে বাসভূমি রয়েছে সেখানে আছে শুধু নিদ্রা আর অন্ধকার। ...সেখানে 'মামি'রূপে যারা ঘুমিয়ে থাকে, কখনও জেগে ওঠে না তারা, সঙ্গীদের দেখে না, পিতা মাতাকেও দেখে না। স্ত্রীপুত্রের জন্য তাদের হৃদয় ব্যাকুল হয় না। পৃথিবীতে সকলেই জীবনবারি পান করে, কিন্তু আমি চির-তৃষা অনুভব করি ...জল কাছেই আছে, আমি তা পান করতে পারি না। নদীতীরে এমন একটু মৃদুমন্দা বাতাস নেই যা আমার হৃদয়কে জুড়িয়ে দিতে পারে। যে-দেবতা এ-রাজ্য শাসন করেন তার নাম 'পূর্ণ মৃত্যু'। তার আহ্বানে মানুষ আসে তার কাছে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। তিনি দেবতা ও মানবের মধ্যে কোন প্রভেদ করেন না। তার চোখে বড় ছোট সকলেই সমান। তাকে যে-মানুষ ভালবাসে তার প্রতিও তিনি কোন অনুগ্রহ করেন না। তিনি মার কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যান। কেউ এই দেবতার উপাসনা করে না, তিনি উপাসকবৃন্দের ওপরও সদয় নন। যে তাকে নৈবেদ্য সাজিয়ে অর্ঘ্য-দান করে তার দিকে তিনি ফিরেও তাকান না।"

মিশরীরা মৃতের মামিকে নানা বসনভূষণে সাজাতো এমন করে যে দেখে মনে হয় যেন—ও-সব সাজ সজ্জার উদ্যোগ মামিটিরই মহাযাত্রার জন্য। আসলে কিন্তু মহাযাত্রায় চলেছে মামি নয়, আর একটি জিনিস যা দেখতে মৃত ব্যক্তিরই মত। আদিম-জাতির মধ্যে দ্বৈত-সত্তার (double personality) বিশ্বাসের চলন আছে—একটি কায়ারূপ, অপরটি ছায়ারূপ। মিশরীরা মৃত্যু-লোকের মানুষটিকে কল্পনা করেছে আদিম-জাতির সেই ছায়ারূপেরই মত। এই ছায়ারূপের নাম 'কা' (Ka)—মানুষের জীবনকালে থাকে দেহের সাথী হয়ে, মরণে দেহ ছেড়ে

যায় মৃত্যু-লোকে। একদিকে 'কা'ই মানুষের অজর অমর অংশ, 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ'-রূপী জীবাত্মারই মত। অপরদিকে 'কা'কে কল্পনা করা হয়েছে ব্যক্তির ইষ্টদেবতা রূপে। বাহু প্রসারিত করে তিনিই ব্যক্তিকে রক্ষা করেন (guardian spirit with protecting wings)। আবার দেখা যায়, সেই জীবাত্মা 'কা'ই হয়েছেন মৃত্যুলোকের অসিরিস। জীবন-দেবতা তিনি মৃত্যুর অন্ধকার থেকে নিয়ে যান জীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। অসিরিসই 'রে' বা সূর্য, তখন সূর্যস্থিত পুরুষকেই 'কা' বলে কল্পনা করতে পারা যায়—'যো সাবসৌ পুরুষ সোঽহমস্মি' (ঈশোপনিষদ্)। ছবিতে দেখা যায়, পক্ষী বা ক্ষুদ্রাকৃতি মনুষ্য-রূপী 'কা' রাজার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, রাজা করেন তার পূজা, আর 'কা' করেন রাজাকে আশীর্বাদ। মানুষের মত প্রত্যেক দেবতারও নিজ নিজ একটি 'কা' আছে। মেমফিসের নগর-দেবতা 'টা' (Ptah)-এর মন্দির শুধু 'টা' এরই ছিল না, সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল "টা'-এর দুর্গ" (Fortress of the Ka of Ptah)। আদিম মানুষের মনে এই 'দ্বৈত সত্তা'য় বিশ্বাস নানা কারণে হয়েছে, যেমন স্বপ্ন ও ছায়া-দর্শন। এখানে কিন্তু আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায়—সেটা হল, 'কা'র সঙ্গে অসিরিসের। সমীকরণ অর্থাৎ, যিনি 'কা' তিনিই অসিরিস। দ্বৈত-সত্তার আদিম বিশ্বাসের ক্ষীণ ধারাটি অসিরিস মিথের সঙ্গে মিশে গিয়ে কেমন জীবন্ত, কেমন আবেগ-চঞ্চল করে তুলেছে ধারণার প্রবাহকে, তা-ই লক্ষ্য করবার বিষয়। ছায়ারূপ আর এখন মামির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে পিরামিডের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, সে যায় মহাযাত্রায়, অসিরিসত্ব প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুলোক পাড়ি দেয়।

একটি মিশরীয় কল্পনার উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। পুণ্যবান মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সারাজীবন স্বর্গ ভূমিতে (Fields of Aalu) আবদ্ধ থাকতে হয় না। সে যদি কখনো ক্লান্তি বোধ করে তবে পৃথিবীর কোন প্রিয় স্থানে ফিরেও আসতে পারে। ইচ্ছা করলে সে কোন জীবের দেহ ধারণ করতে পারে —যেমন সারস, চড়ুই, সর্প, কুমীর। আত্মার এই পুনরাবর্তন বা দেহান্তর গ্রহণের সঙ্গে ভারতীয় জন্মান্তরবাদের প্রভেদ আছে। জন্মান্তরবাদ কর্মের শাশ্বত নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পুণ্য কর্মের ফলে জীব স্বর্গলোকে গিয়ে সুখভোগ করে, আর যখন তার সুকৃতির নির্ধারিত পরিমাণ ভোগ-সুখ ফুরিয়ে যায়, তখন পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করে সে,—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি' (গীতা)।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে কুৎসিৎ কর্ম করেছে, তারা শীঘ্র কুৎসিৎ জন্মলাভ করে, যেমন কুক্কুর-যোনি বা শূকর যোনি—'য ইহ কপূয়াচরণা অভ্যাসে হ যত্তে কপূয়াং যোনিং আপদ্যেরন, শ্ব যোনিং বা শূকর যোনিং বা'। মিশরীয় পুনরাবর্তন বা জন্মান্তর কল্পনায় এমনি কোনরূপ আত্ম-শুদ্ধির ব্যবস্থা নেই। বস্তুত পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন বা জীবের দেহধারণ আত্মার একটি বিশেষ অধিকার, আর সেই অধিকার লাভ করে কেবল তারাই যারা যাদু বিদ্যায় পারদর্শী কিম্বা অসিরিসের বিচারে যাদের ন্যায়নিষ্ঠ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ব্যালনক্র শ্বাপদের দেহ ধারণ করে তড়িদ্গতি যথেচ্ছ ভ্রমণ সম্ভব হয় তাদের, প্রভূত বলশালী হয় তারা। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, জীবজন্তুর দেহধারীর গোপন দৃষ্টিপাত অন্যের অলক্ষ্যে নানা বিষয় লক্ষ্য করতে পারে—এই সব সুবিধার কল্পনাই মতবাদটির সৃষ্টি করেছিল। তবে জন্মান্তর ব্যাপার নিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও মিশরের সুবিধাবাদী কল্পনার মধ্যে বিরাট প্রভেদ সত্ত্বেও এ-কথা মনে করা আদৌ অসঙ্গত নয় যে মৃত ব্যক্তির পুনরাবর্তন ও দেহধারণের কল্পনা যেমন মিশরে দেখা দিয়েছিল, তেমনই কোন আদিম ভাবই ভারতীয় জন্মান্তরবাদের অগ্রদূত।

অসিরিসের ভগ্নী ও স্ত্রী আইসিস। স্বামীর প্রতি ভালবাসা, তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর প্রেম দিয়ে জয় করেছিলেন তিনি মৃত্যুকে। শক্তি-রূপিণী তিনি, নীল-নদীর তটভূমির উর্বরতা শক্তি তিনি, আইসিস রূপী নীল-নদীর স্পর্শে যে ভূমি ওঠে শ্যামল হয়ে। শুধু তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের সৃজনী-শক্তি তিনি। সেই শক্তিই সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীকে, প্রাণীজগতকে, আর সন্তানের রক্ষক মাতৃস্নেহকে। ভারতের যেমন কালী করালী দুর্গা, ব্যাবিলোনিয়ায় ও আসিরীয়ায় যেমন ইসতার, গ্রীসে যেমন ডিমিটার, রোমে যেমন সিরিস—মিশরেরও শক্তিদেবী তেমনি আইসিস। সৃজন-শক্তির মূলাধার মাতৃত্বের প্রতীকরূপেই মিশরীরা তাকে পরম শ্রদ্ধা ভরে পূজা করতো। শীতকালে তার শিশু পুত্র হোরাসের মন্দিরে পূজা অর্চনা হতো, হোরাসকে তিনি দৈব বলে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। মায়ের কোলে শিশুর স্তন্যপান, আইসিস ও হোরাসের এই যুগ্ম-মূর্তি এবং আনুষঙ্গিক দার্শনিক কবি-কল্পনা খৃস্টীয় ধর্মভাবকে পর্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এমন কি, মাতা মেরী ও যিশুর চিত্রে সেই মিশরীয় কল্পনাকেই প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। প্রাচীনকালের খৃস্টানেরা মিশরের

সেই দেব-মাতা ও দেব-শিশুর মূর্তিকে রীতিমত পূজা করতেন।

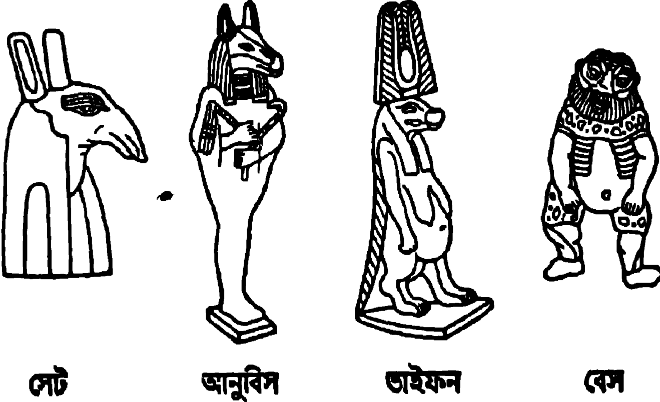
দেবতার সংখ্যা মিশরে যত, ভারত ও রোম ছাড়া আর কোথাও তত অধিক দেখা যায় না। উদ্ভিদ বা প্রাণী এমন বস্তু নেই বললেই হয়, মিশরীয়রা যা পবিত্র মনে করে নি। জলহস্তী, কুমীর, বাজপক্ষী, হাঁস, ছাগল, কুকুর, চড়ুইপাখী, শিয়াল, সাপ—সকলেই ছিল কোন না কোন দেবতার বাহুরূপ বা প্রতীক। যেমন, হাঁস বা মেষরূপী 'আমন', বৃষরূপী 'রে' বা 'অসিরিস', কুমীররূপী 'সেবেক', বাজপক্ষী-রূপী 'হোরাস', 'গাভী-রূপী 'হাথর', বানর-রূপী 'থৎ'। থৎকে দেখেছি আমরা প্রজ্ঞার দেবতা রূপে—তিনি আবার চন্দ্র দেবতাও বটেন। স্ত্রীলোককে উৎসর্গ করা হত বৃষরূপী অসিরিসের যৌন-সম্ভোগের জন্য। প্রসিদ্ধ রোমান লেখক প্লুটার্ক (**Plutarch**) বলেন, মিশরে 'মেনডিস' নামক স্থানে অতি-সুন্দরী রমণীর সঙ্গে ধর্মের ছাগের যৌন সংযোগ ঘটানো হ'ত। প্রজননের প্রতীক ছাগ ও বৃষ, অসিরিসের অবতার তারা, তাই বিশেষরূপে পূজিত হত এই দুটি প্রাণী। অসিরিস মূর্তির প্রধান অঙ্গই ছিল পুরুষাঙ্গ বা লিঙ্গ। ত্রিলিঙ্গ বিশিষ্ট অসিরিস মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরুতো মিশরীরা, কখনও বা মেয়েরাই মূর্তিটিকে বহন করতো এবং সেই সঙ্গে স্বভাব-ক্রিয়ার যান্ত্রিক অনুকরণ করা হতো সুত্রের সাহায্যে। নানারূপ অদ্ভুত উপায়ে লিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা দেখা যায় মিশরে। লিঙ্গ পূজার চিহ্ন চিত্রে ও পাথরের গায়ে খোদাই করা হয়েছে। হাতলযুক্ত 'ক্রস'কে (**Crux ansata**) দেখতে পাই আমরা যৌন মিথুন ও সতেজ জীবনের প্রতীক রূপে। এই মিশরীয় প্রতীকের সঙ্গে আমাদের শিব-লিঙ্গের সাদৃশ্য আছে, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। লিঙ্গ পূজার অধ্যাত্মতত্ত্ব, মিশরে যেমন ভারতেও তেমনি চলে এসেছে। পক্ষান্তরে খৃস্টধর্ম মিশরীয় অসিরিস-পন্থীদের লিঙ্গ পূজার 'ক্রস'কেই নীতি ও রুচির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা দিয়ে যিশুর পবিত্র ক্রসে রূপান্তরিত করেছেন, এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

ত্রিমূর্তির কল্পনা দেখা যায় মিশরে অসিরিস, আইসিস ও হোরাসকে নিয়ে। পরবর্তীকালে রে আমন ও টা-কে একই সর্বশক্তিমান দেবতার তিনটি রূপ বলে কল্পনা করা হত। এ-ছাড়া ক্ষুদ্র গণদেবতাও ছিলেন—যেমন শেয়ালমুখো আনুবিস, সু, টেফনুট, নেফথিস, নুট ইত্যাদি। গণদেবতার মধ্যে জীবজন্তুর প্রাচুর্য গোষ্ঠী-'টোটেমে'র কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে আদিকালের 'টোটেম'-ধর্মকে মিশর কোন দিন বর্জন করে নি। যুগে যুগে নূতন ভাব সমষ্টি এসে সেই

পুরনো ধর্মের ওপরই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। পেট্রি তার **Religion and Conscience of Ancient Egypt** গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, মিশরে ইন্দ্রজাল ছিল আদিবাসীদের আদিম ধর্ম, অসিরিস এসেছে লিবিয়া থেকে, বিশ্ব-শক্তির আধার সূর্যের উপাসনা আমদানি করা হয়েছে মেসোপটেমিয়া থেকে, এবং নৃপতিদের রাজশক্তিই দেবতাকে অনুরূপ শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী করে তুলেছে। ধর্ম যেখানে নানা স্থানের নানা ভাবের সমষ্টি, চিন্তার অসঙ্গতি ও ভাবের বিরোধ সেখানে অনিবার্য, যদিও সেই সব ভাবগত বিরোধের মীমাংসার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় না। মিশরীয় ধর্মচিন্তায় ঠিক এমনি ধরণের বিরোধ, বৈষম্য এবং নূতনকে পুরানোর সঙ্গে মিলিয়ে দেবার রক্ষণশীল মনোভাবের উল্লেখ করে মিশরতত্ত্ববিদ্ উইদ্‌ম্যান (**Weidemann**) প্রশ্ন করেছেন : **We may ask how it was possible for the Egyptian at one and the same time to believe all those contradictory doctrines, to hold that after death he would dwell in the gloomy regions of the under-world and he would travel the heavens with the sun, that he would till the grounds in the fields of the blessed, that his soul would fly to heaven in the likeness of a bird···etc etc."** অর্থাৎ কতগুলি পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব-কথা বিশ্বাস করা সম্ভব হল কিরূপে মিশরীয়দের যেমন, মৃত্যুর পর অন্ধকার পাতালপুরীতে বসবাস আবার সূর্যের সঙ্গে স্বর্গলোকে ভ্রমণ ; স্বর্গের ভূমিতে চাষবাস, পক্ষীর রূপ ধরে আকাশে উড়ে যাওয়া ইত্যাদি। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে আমরা শুধু এই কথাটি বলেই ক্ষান্ত হতে চাই যে, জগতে কেবল ধর্ম নয়, সংস্কৃতির যাবতীয় বস্তুই আমরা লাভ করেছি দেশী ও বিদেশী ভাবধারার সংমিশ্রণ থেকে এবং সাংস্কৃতিক জগতে ভাবালুতার প্রভাব দেখা যায় যত, সঙ্গতি বা যুক্তি বিচারের অবকাশ ততখানি নেই।

বহু দেবতার আসন রচনা করা হয়েছে মিশরীয় ধর্মে তত্ত্বগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করিলে নানারূপ অসঙ্গতিও দেখা যায় সত্য, যেমন দেবতাকে আঁকা হয়েছে কখনো মানুষ, কখনো বা বাজপক্ষী রূপে, রাজাকে বর্ণনা করা হয়েছে কখনো সূর্য তারা রূপে, কখনো বা বৃষ কুমীর সিংহ রূপে—রূপক ছলে নয়, জীবজন্তুর মূল প্রকৃতি কে অবলম্বন করে'। দেবতা মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, বিশ্বজগৎ,

সাধারণ যুক্তি বিচারে সকলেরই রূপ স্বতন্ত্র, প্রকৃতিও ভিন্ন—যেমন, রাজাকে মানুষ রূপেই দেখতে হয়, সূর্য বা বৃষরূপে বর্ণনা অসত্য। কিন্তু সর্বভূতের এই সব বাহ্য রূপের অন্তরালে একটি ঐক্য সূত্রের সন্ধান করেছিল মিশরীয়রা, তাই জড় উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বৈচিত্র্য কেবল একটি মাত্র সত্তার ধারাবাহিকতা বা বিকার, এমনি



সেট আনুবিস তাইফন বেস

কয়েকটি দেব-দেবী

কল্পনাই তাদের মনে জেগেছিল। রামধনুর সাতটি রং একই বর্ণের বিকার, পরস্পরের মধ্যে কোন মূলগত প্রভেদ নেই—অবস্থা বিশেষে এক বর্ণ আর একটি বর্ণে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে মানুষ ও দেবতার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ভেদরেখা টানা চলে না, 'দেবতা হয় তখন অমর-মানব আর মানুষ হয় মর-দেবতা'। এই জন্যই ফারাওকে দেবতার প্রতিরূপ বলে ধারণা করতে কল্পনা কখনো বাধা পায় নি। জগতের বিভিন্ন বস্তুর সমীকরণ প্রচেষ্টায় মিশরীয় চিন্তা মূলবস্তুর একত্ব (consubstantiality) কল্পনা করেছিল, এই তত্ত্বটিকে একেশ্বর বাদ বলেই অনেক মিশর-তত্ত্ববিদ্ অভিহিত করেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে যথেষ্ট। মূল সত্তাটি যে কোন আত্মিক বস্তু এই অনুভূতিটি তেমন সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে নি মিশরীয় চিন্তাধারায়, যেমন করেছিল ভারতে উপনিষদের গভীর তত্ত্বসমূহের মধ্যে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মূল সত্তার বিষয় বলা হয়েছে এইরূপ : 'স য এব অনিমা ঐতদাত্ম্যং ইদম্ সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা।' অর্থাৎ এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল সত্তা তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, সেই আত্মাই রয়েছেন

সর্ববস্তুর মধ্যে। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—'একমেবা-দ্বিতীয়ং'—সর্বভূতের অন্তরাত্মা বা প্রকাশক, 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' একেশ্বরবাদের এরূপ কল্পনা 'ধর্মভ্রষ্ট রাজা' ইখনাটনের পূর্বে মিশরীয় চিত্তে বড় একটা সজাগ হয়ে ওঠে নি। এইরূপ একেশ্বরবাদের স্থলে বরঞ্চ 'এক বস্তুবাদই' (Monophysiticism) যেন অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে মিশরের দর্শন ও ধর্মচিন্তায়—অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী এবং বস্তু কোন মৌলিক পদার্থের বিকার মাত্র।

কিন্তু 'এক বস্তুবাদ' বা মৌলিক-পদার্থ কল্পনা যেমনই হোক, দেবগণ যে প্রকৃতি-শক্তিপুঞ্জের নামান্তর, তার সুস্পষ্ট আভাস আছে হোরাস দেবের উদ্দেশে একটি স্তব কীর্তনের মধ্যে। খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে রচিত এই স্তবগান—স্তবটিতে প্লাবনের প্রাচীন কাহিনীর (Deluge Legend) ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে : "তোমার প্লাবনোচ্ছ্বাস উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত, তোমার মুখ-নিসৃত বারিরাশি ঝর ঝর শব্দে মেঘপুঞ্জ থেকে বর্ষিত হয়। সব দেশে আছে হোরাসের জল। হে হোরাস, ভূমি সকল জলমগ্ন হয়ে যেত, তুমি যদি না প্লাবনকে আনতে তোমার কর্তৃত্বাধীনে। জল প্রবাহিত হয় তোমার নির্দিষ্ট পথে। গতি-পথের যে প্রণালী নির্ধারিত করে দিয়েছ তুমি, জলের এমন সাধ্য নেই যে সেই পথটি ছেড়ে অন্য পথে গমন করে।" এই হোরাস-বন্দনায় জড়-প্রকৃতির অন্তরালে আমরা একটি আত্মিক সত্ত্বা বা প্রাণ-শক্তির সন্ধান পাই—যে শক্তি প্রকৃতিকে নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করছে। অসিরিস, আইসিস ও হোরাসকে নিয়ে মিশরীয় ত্রিমূর্তির (Trinity) একত্ব কল্পনার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এই তিন দেবতা একই বিশ্ব-শক্তির তিনটি রূপ। প্রকৃতির নিয়ন্তা হোরাস যিনি, জীবন-দেবতা অসিরিসও তিনিই—আর উর্বরা শক্তিরূপিণী আইসিস উভয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ও অভিন্ন। অন্তত এখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃত একেশ্বরবাদ মিশরী কল্পনার আয়ত্বের মধ্যে এসেছে।

২

ইখনাটনের একেশ্বরবাদ ঃ পুরোহিত-তন্ত্র

মিশরীয় চিন্তা বস্তুর বাহ্যরূপকে অতিক্রম করে গভীর দর্শন-তত্ত্বের দিকেই এগিয়ে চলেছিল। আধ্যাত্মিক অনুভূতিও জেগেছিল, যে-অনুভূতি থেকে সম্ভব হয় সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন, একমেবাদ্বিতীয়ম্ রূপ একেশ্বরবাদ। পরে আমরা দেখতে পাব 'মেমফাইট ধর্মতত্ত্বে' (Memphite Theology) এমনই একজন মহান অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়েছিল। এইরূপ একেশ্বরবাদী ধর্মতত্ত্বই মিশরীয় চিন্তার স্বাভাবিক পরিণতি, কিন্তু সেই ধর্মতত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছিল ইখনাটনের ছয় শো বছর পরে। ইখনাটন একেশ্বরবাদের অকাল-বোধন করে ধর্মের স্বচ্ছন্দ গতিকে বাধা দিয়েছিলেন। ঐতিহ্যের সঙ্গে নব-ধর্মের বিরোধ বাধিয়েছিলেন। সূর্য-দেবই একমাত্র ঈশ্বর, জীবনদায়িনী শক্তির আধার, বিশ্বের মূল কারণ। তাঁর এই একেশ্বরবাদের মধ্যে হয়ত মৌলিকত্ব বড় বেশি ছিল না, কেন না মিশরের ভৌগোলিক প্রকৃতিই ভাস্বর জ্যোতিষ্মান্ সূর্যদেবকে অন্যান্য দেবতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে। মিশরের অতিপ্রাচীন অসিরিস সাহিত্যেও সূর্যকে প্রাধান্য দান করা হয়েছে। ইখনাটনের বিশেষত্ব এই যে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি, দেবমঞ্চ থেকে সকল দেবতাকে অপসারিত করে, দেবতা নেই, আছেন একমাত্র সূর্যদেব আটন। ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় সত্তারূপে উপাসনা করতে হয়ত বা কোন আপত্তির কারণ হতো না, কিন্তু তিনি পিতৃপুরুষের আরাধ্য দেবদেবীকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করেছিলেন, তাদের যথেচ্ছ আক্রমণ করেছিলেন। যে-মিলনধর্মী গুণের দ্বারা ধর্মকে উদার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ইখনাটনের মধ্যে সেই চারিত্রিক গুণটির ছিল একান্ত অভাব, সেজন্য তাঁর নবপ্রবর্তিত ধর্মের পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে ইখনাটন ছিলেন একজন কীর্তিমান পুরুষ, মিশরের কৃতী সন্তান। একেশ্বরবাদের প্রথম দ্রষ্টা তিনি, অসাধারণ তাঁর কবি-প্রতিভা। ভক্তিমার্গের পথপ্রদর্শক, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ আর পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তির পবিত্র বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর শুধু মানুষের পিতা

নন, সর্বজীবের স্রষ্টা, তাঁর অপরিসীম দয়া সৃষ্ট জীবকে রক্ষা করে। পরম কারুণিক জগদীশ্বরের কৃপাবিন্দু পান করে মানুষ পশু পক্ষী জীবনের আনন্দে আত্মহারা হয়, পক্ষীকুল পাখার ঝাপটে প্রভুর বন্দনা করে, গাভীর দল গতির ছন্দে তাঁরই মহিমা কীর্তন করে। ইখনাটন তাঁর রচিত 'আটন-স্তোত্রে' একেশ্বর-কল্পনা সুন্দরভাবে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। রচনার ভঙ্গী স্তোত্রকে অপূর্ব সার্থকতা দান করেছে, এমন উৎকৃষ্ট এই রচনা যে পরবর্তীকালে বাইবেলের প্রসিদ্ধ 'সাম' গীতিকায় এই স্তোত্রের অপরূপ ভাবগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

আমরনা মন্দিরের দেয়ালের গায়ে ইখনাটনের আটন-স্তোত্র উৎকীর্ণ রয়েছে। এই স্তোত্রের ইংরেজি অনুবাদ ব্রেস্টেডের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক সাহিত্যের এই অপরূপ রত্নের সঙ্গে পাঠকের বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ স্তোত্রটির বাংলা রূপ নিয়ে দেওয়া গেল :

আটনের শাশ্বত জ্যোতি ও শক্তি

হে শাশ্বত জীবন-দেবতা আটন!
দিগমণ্ডলে কী অপরূপ তোমার উদয়!
পূর্ব অরুণাচলে তোমার আবির্ভাব
জগতকে করে জ্যোতির্ময়।
তুমি সুন্দর, মহীয়ান, দ্যুতিমান,
সকল দেশের মুকুটমণি।
তোমার বর্ণচ্ছটা তোমারই সৃজিত
জগতের মেখলা-বেষ্টনী।
হে সবিতা, প্রেমের যাদু দিয়ে
সকলকে তুমি বেঁধে রেখেছ।
অতি দূরে তুমি, কিন্তু তোমার রশ্মি কিরণ
ধরার আলিঙ্গনে ধরা পড়েছে।
ঊর্ধ্বে বিরাজ কর তুমি,
কিন্তু দিনগুলি তোমার পদচিহ্ন।

রাত্রি

পশ্চিম আকাশে তুমি যখন অস্তমিত
পৃথিবী তখন মৃত্যুর অন্ধকারে
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে,
ঘরে ঘরে প্রাণের স্পন্দন তন্দ্রার স্পর্শে স্তিমিত,
নমিত শীর্ষ, শ্বাস বুঝি স্তব্ধ হয়,
দৃষ্টি যায় নিভে,
তস্করের গোপন পদ-সঞ্চার,
মাথার তলের জিনিসটি কে হরণ করেছে,
কেউ তা জানতে পারে না।
সিংহ তার গহ্বর ছেড়ে শিকারের সন্ধানে ফেরে,
আর সর্প করে দংশন।
অন্ধকার···
বিশ্ব ডুবে গেছে নৈঃশব্দে
বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তার নিজের গগনে বিশ্রাম করেন।

দিবস ও মানুষ

হে আটন, আকাশে তোমার প্রকাশ
ধরণীকে করেছে উজ্জল।
তোমার ভাস্বর দীপ্তি অন্ধকার দূর করে।
তোমার বিচ্ছুরিত রশ্মি (মিশরের) দুই
ভূখণ্ডকে উৎসব-মত্ত করে তোলে।
জেগে উঠে দাঁড়ায় তারা তুমি যখন তাদের
তুলে ধর।
অঙ্গ স্নাত, বসন পরে তারা
উর্ধ্ব হস্তে করে উষার আরাধনা,
বিশ্ব মানবের কর্মজীবনের উদ্বোধন
তখন দেখা যায়।

দিবস ও প্রাণী উদ্ভিদের জগৎ

গোষ্ঠে ধেনু চরে,
বনস্পতি গুল্ম লতা নব শোভা ধরে।
পাখী উড়ে বেড়ায় জলার ওপর
ঝাপটে ঝাপটে পাখা দুলিয়ে,
গায় তোমার বন্দনা গান।
মেষ তালে তালে পা ফেলে নাচে,
পতঙ্গ ঘুরে ঘুরে ওড়ে,
তোমার প্রভা তাদের দেয় জীবনানন্দ।

দিবস ও জলরাশি

উজান ভাঁটা দুই ধারা পথে তরী বেয়ে চলে,
তোমার উদয়ে সব রাজপথ হয় মুক্ত।
নদীর সফরী তোমার আলোর ঝর্নায়
ঝাঁপ দেয়,
গভীর জলধিজলে প্রবেশ করে
তোমার রশ্মির জাল।

মানব সৃষ্টি

তুমি সৃষ্টি করেছ নারীর গর্ভ
আর পুরুষের বীজ।
মাতার জঠরে সন্তানকে দাও জীবন,
শান্ত রাখ তারে, সে যেন না কাঁদে।
ধাত্রী তুমি, গর্ভকালে প্রাণবায়ু দাও
সন্তানেরে।
ভূমিষ্ঠ সে হলে, জন্মদিনে তুমি তার
মুখ খুলে দাও গলার স্বরে,
তুমি জোগাও তার সকল প্রয়োজন।

প্রাণী সৃষ্টি

পাখীর ছানা যখন ডাকে ডিমের ভেতর
বায়ু দিয়ে তুমি তাকে বাঁচিয়ে রাখো।
যখন তাকে দাও তুমি ডিম ভাঙবার শক্তি
সে তখন বেরিয়ে আসে ডিম থেকে,
খুশীমত তারস্বরে ডাকতে থাকে।
ডিম থেকে বেরিয়ে সে দু পায়ে ভর করে চলে।

সারা জগতের সৃষ্টি

অসংখ্য তোমার সৃষ্ট বস্তু
(আমাদের) দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে তারা।
হে অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তোমার শক্তি ধরে
এমন কে আছে ?
যখন ছিলে একা, পৃথিবীকে সৃষ্টি করে
তুমি দিয়েছিলে মনের মত রূপ।
মানুষ, সকল রকম পশু, বড় হোক ছোট হোক,
যারা আছে ধরণী পরে, চলে পা ফেলে—
আর যারা খেচর, ডানা মেলে ওড়ে।
বিদেশ সিরিয়া ও কুশ,
মিশরভূমি—
প্রত্যেক মানুষকে তুমি তার নিজের
স্থানটিতে বসিয়েছ,
তুমি মিটিয়েছ তাদের প্রয়োজন।
প্রত্যেকের আছে নিজের বস্তু,
জীবনের দিনগুলি তার নির্ধারিত।
অনেক তাদের কণ্ঠের ভাষা
আকৃতি অনেক রকম, চর্মের বর্ণে আছে বৈশিষ্ট্য।
বিদেশীদের তুমি যে ভিন্নরূপে গড়ে তুলেছ।

মিশর ও বহির্দেশে ভূমির জলসেচ

নীল নদী পাতালে স্বজন করেছ,
ইচ্ছামত তুমি তাকে নিয়ে এসেছ,
মানুষ যেন প্রাণে বাঁচে।
তুমি মানুষকে সৃষ্টি করেছ তোমার নিজেরই জন্য,
সবার প্রভু তুমি, বিরাম তোমার তাদের মধ্যে।
হে পুষণ সবিতা, সর্ব দেশের প্রভু তুমি,
তোমার উদয় সর্ব দেশের কল্যাণের জন্য।
দূর বিদেশ,
সেখানে জীবন সৃষ্টি করেছ তুমি।
নীল নদীকে করেছ আকাশে প্রবাহিত,
সেখান থেকে জলধারা নেমে এসে
পাহাড়গুলিকে চলোর্মি-চঞ্চল করে তোলে,
নীল মহাসাগরের মত,
নগরের উপকণ্ঠে শস্যক্ষেত্র জলসিক্ত করে।
হে শাশ্বত দেব, কী চমৎকার তোমার পরিকল্পনা;
বিদেশী মানুষের জন্য, প্রতি দেশের জীবের জন্য
আকাশে আছে একটি নীল নদী*
(কিন্তু) মিশরে নীল নদী পাতাল ফুঁড়ে উঠেছে।

ঋতু

তোমার স্বর্ণ কিরণ প্রতিটি উদ্যানের শোভা বর্ধন করে—
তোমার উদয় তাদের করে প্রাণদান,
তোমার প্রভাবে তাদের সংবৃদ্ধি।

---

* আমাদের দেশের একটি অনুরূপ কল্পনা 'আকাশ গঙ্গা', কিন্তু সে কবি-কল্পনা। মিশরীয় নীল-নদীর পাতাল থেকে ওঠার কল্পনাকে নিছক কবি কল্পনা বলা যায় না, কেননা তার মূলে রয়েছে মরুবাহিনী নদীর প্রকৃতি। মিশরে বৃষ্টি হয় কদাচিৎ, বরফ-গলা জলে স্ফীত নদীকে মনে হয় যেন ভূগর্ভ থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। পাতালে আছে একটি সমুদ্র, তার নাম 'নুন'।

তুমি ঋতুকার,
তোমার সৃষ্টির জন্য ঋতুর প্রয়োজন :
শীত ঋতু আনে শীতলতা,
গ্রীষ্ম আগমনে জীব পায় তোমার স্পর্শের অনুভূতি।
দূর নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছ, উদয়ের পথে
দৃষ্টি-দীপে তুমি যেন তোমার সৃষ্টির
মোহন রূপ দেখতে পাও।
হে শাশ্বত জীবন-দেবতা আটন,
একা তুমি, দিব্য জ্যোতিরূপে বিরাজমান
উষসী, দ্যুতিমন্ত, দূরে যাও আবার ফিরে আস।
কোটি কোটি রূপের সৃষ্টি করেছ তুমি
আপনার (প্রকৃতির) মাঝ থেকে,
নগর, জনপদ, উপজাতি রাজপথ নদী।
তুমি যে আটন সবিতৃদেব, পৃথিবীর পানে
চেয়ে আছ ওপর থেকে।

রাজার কাছে আত্মপ্রকাশ

তুমি আছ আমার হৃদয়ে,
তোমার পুত্র ইখনাটন, সে ছাড়া
তোমায় কেউ জানে না।
তোমার দিব্য পরিকল্পনায়, অমিত শক্তির বলে,
তুমি তাকে করেছ প্রাজ্ঞ।
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি, সৃষ্টিকর্তা,
তোমার উদয়ে জীবনের সঞ্চার,
মৃত্যু নেমে আসে তুমি যখন অস্ত যাও।
তোমার তুলনা তুমি নিজে—
মানুষ বাঁচে তোমার শক্তির প্রভাবে,
জীবন-দায়িনী সে শক্তি,

তোমার রূপে তাদের নয়ন ভরে ওঠে।
সকল কর্মের হয় বিরতি,
তুমি যখন যাও পশ্চিমের অস্তাচলে।···
এই পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলে তুমি
তোমার পুত্রের জন্যে, সে তোমারই অঙ্গের অঙ্গ,
ঊর্ধ্ব নিম্ন মিশরের রাজা,
সত্যসন্ধ, দুই ভূখণ্ডের অধিপতি
নেফের-খেপরু রে, ওয়ান রে (ইখনাটন)
রে-পুত্র, সত্যাশ্রয়ী, রত্নেশ্বর, দীর্ঘজীবী ইখনাটন।
আর যার জন্য করেছিলে পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা,
সে নৃপতির প্রধানা মহিষী, প্রেয়সী,
দুই ভূখণ্ডের অধিশ্বরী, নেফের-নেফরু-আটন নেফ্রেটেটি,
শ্রীমতী আয়ুষ্মতী।

ইখনাটনের এই ভক্তিরসাপ্লুত, আবেগ-স্পন্দিত স্তোত্রটির প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'সাম' নামে বাইবেল-গ্রন্থের কয়েকটি মধুচ্ছন্দা গীতিকার মধ্যে। উভয়ের ভাব ও শব্দ বিন্যাসের মধ্যে সাদৃশ্য এমনই চমকপ্রদ যে 'সাম'-এর' সেই গানগুলি 'আটন'-স্তোত্রের অনুকরণে রচিত, এ-কথা বোধ করি না বলে উপায় নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি 'সাম' (**Psalm**) গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল :

হে প্রভু ঈশ্বর মহান গরীয়ান তুমি,
জ্যোতির্মণ্ডলের পুরুষ তুমি,
মহাশূন্য বিস্তার করেছ, দিগন্তের চক্রবাল যবনিকা।
তোমার মণিমালার দীপ্তি প্রবেশ করে সাগর গর্ভে।
তোমার রথ মেঘপুঞ্জ,
বায়ু-পক্ষে বিহার কর তুমি।···
সুদৃঢ় করেছ ধরিত্রীর ভিত্তিমূল,
সমুদ্রের নীলাম্বর পরিয়েছ তারে।
জলদ পটল
পর্বতের চুড়ায় চূড়ায় বেয়ে ওঠে প্রভুর আদেশে—
উপত্যকাভূমি সিক্ত করে নেমে যায়

জীবনের সঞ্জীবনী সুধা স্রোতস্বিনী…
শ্যাম শষ্প পত্র পুষ্প শস্য ভরা বসুন্ধরা
ধন্য তৃপ্ত কৃপাবারি বর্ষণে তোমার।
ঋতু আবর্তন
নিয়ন্ত্রণ করে শশী প্রভুর ইঙ্গিতে,
রবি জানে কখন সে ডুবে যাবে।…
প্রভু,
কিবা অপরূপ সৃষ্টি বৈচিত্র্য তোমার
ধরণী ঐশ্বর্যময়ী তোমার প্রজ্ঞায়
শ্রেয় যত কিছু সে ত তোমারই কৃপার দান
বিরূপ যখন তুমি বিপদ জীবের,
যায় প্রাণ বায়ু, মৃত্যু আসে নেমে,
ধূলি সাথে মিশে যায় প্রাণী।
দিব্য ধ্রুব জ্যোতি তুমি,
প্রভাবে তোমার জীবনের সৃষ্টি
ধরা ধরে নব রূপ।
চিরন্তন প্রভুর মহিমা
ফুল্ল তিনি সৃষ্টির গৌরবে।

(Psalm I04)

ভারতের ঋষি একটি বৈদিক মন্ত্রে বলেছেন,

বেদাহমেতম্ পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আঁধারের পরপারে সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষেরই বন্দনা করেছেন ইখনাটন তাঁর সুবিখ্যাত আটন-স্তোত্রে। এমন কবিত্বপূর্ণ সুমধুর ছন্দগান চতুর্দশ খৃষ্ট পূর্বাব্দের আগে কদাচিৎ শোনা গেছে।

পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণের দরুণ ইখনাটনের একেশ্বরবাদ ধ্বংস হয়েছিল, তারপর দেখা দিল পুরোহিত-তন্ত্রের অভ্যুত্থান। সুমেরদেশে রাষ্ট্র গঠনের গোড়ার কথা পুরোহিত-তন্ত্র, প্রধান পুরোহিত বা 'পটেশী-রা ছিলেন রাজা, তাই সেখানে রাজা ও পুরোহিত-গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ তেমন দানা বেঁধে

ওঠে নি। পক্ষান্তরে মিশরের ফারাওরা দেবতার অবতার 'সূর্যপুত্র রে' রূপে পূজিত হতেন, সুতরাং মর্যাদায় তাদের আসন ছিল পুরোহিতকুলের উর্ধ্বে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোন ফারাও পূজারীদের স্বার্থে আঘাত করেন নি। বরঞ্চ সাম্রাজ্যযুগের নৃপতিরা অনেক লুণ্ঠিত ধনসম্পদ মন্দিরে দান করেছিলেন। প্রথম আমেনহটেপ ছিলেন পুরোহিতদের পরম বান্ধব। আমনদেবের পূজারীদের একটি 'ভ্রাতৃকুল' গঠন করেছিলেন তিনি, তাদের সমৃদ্ধিও প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত করেছিলেন। এমনি করে রাজা ও পুরোহিতকুলের মধ্যে যে-সৌহার্দ্য আবহমান কাল ধরে চলে আসছিল, তার মধ্যে ফাটল ধরার প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়েছিল তৃতীয় আমেনহটেপের রাজত্বকালে। দেশাচার ভঙ্গ করে এই রাজা একজন বিদেশিনীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাই নিয়ে যে মনোমালিন্যের সঞ্চার হয়েছিল ইখনাটনের কালে সেইটেই রীতিমত দ্বন্দ্ববিরোধে পরিণত হলো রাজা ও পুরোহিতকুলের মধ্যে। তারপর মিশরে রাষ্ট্র-শক্তি যেরূপে পুরোহিতদের হাতে গিয়ে পড়েছিল, আমরা তা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

রুজি রোজগার বজায় রাখার জন্য পুরোহিতকুলের প্রধান কর্মই ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির প্রশ্রয় দান। নীতির বা অধ্যাত্মের আদর্শকে জনগণের সামনে না ধরে মন্ত্রতন্ত্রের ইন্দ্রজালকেই তাঁরা ধর্মাচরণ ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। জন সাধারণকে তাবিজ কবচ, মন্ত্র-তন্ত্রভরা প্যাপিরাসের তাড়া দিতেন তাঁরা মূল্যের বিনিময়ে, আর লোকেরা গ্রহণ করতো সেগুলি মহা আগ্রহে, পরলোকের সুখসাচ্ছন্দ্যের বীমা স্বরূপে। মন্ত্রতন্ত্রের কথায় মিশরের ধর্ম-সাহিত্য পরিপূর্ণ। পুরোহিতরা ছিলেন মহা-ঐন্দ্রজালিক, মন্ত্রবলে হ্রদকে শুকিয়ে দিতে পারতেন, (**wizards who dry up lakes with a word**) ইন্দ্রজাল বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে জোড়া দিতে পারে, মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে। মিশরে এই যাদুবিদ্যা যে কেবল পুরোহিতেরই একচেটে ছিল তা নয়। রাজা নিজেই ছিলেন যাদুকরদের পুরোধা, বৃষ্টি-বর্ষণের ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল তাঁর। জীবনকে নানা রকম বিভীষিকার সজারু-কাঁটায় কণ্টকিত করা হয়েছিল—আনাচে কানাচে ঝোপে-ঝাড়ে সর্বত্রই অপদেবতারা ওঁৎ পেতে আছে, আর মানুষ যাতে তাদের কবল থেকে রক্ষা পায়, সেজন্য তাবিজ মাদুলি মন্ত্রতন্ত্র গ্রহ-শান্তির অঢেল ব্যবস্থা! খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের একটি সাপের মন্ত্র এইরূপ: "সাপ বাছুরকে ধরেছে পেঁচিয়ে। ওগো জলহস্তী,

ভুঁইফোঁড় তুমি। যে-বস্তু বেরোয় তোমার নিজের দেহ থেকে তাই তুমি ভক্ষণ কর। হে সর্প, শুয়ে পড়, সরে যাও। দেবতা হেনপেসেটেট জলে আছেন, সর্প পরাভূত হয়েছে। চেয়ে দেখ সূর্যদেবতা রে'কে।" মন্ত্রটি কতকগুলি শব্দের সমষ্টি মাত্র। ছাড়া-ছাড়া ভাবে কথাগুলির অর্থ থাকলেও সমষ্টিগত ভাবে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য।

এমনি সব মন্ত্র-তন্ত্র অনুষ্ঠানাদির ফলে নীতির সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধের কথা মানুষ ভুলেই গিয়েছিল একরকম, পরলোকে সুখশান্তি লাভ করতে চাইতো সাধুভাবে নৈতিক জীবনযাপন করে নয়—মন্ত্র-তন্ত্রের অনুষ্ঠান এবং পুরোহিতদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে। পরলোকে অসংখ্য বিপদের বিভীষিকা দেখিয়ে প্রত্যেকটি দুরবস্থার জন্যই পুরোহিত একটি রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করেছেন। মৃত ব্যক্তির মুখ, মুণ্ড, হৃদপিণ্ড খসে পড়বে না, তার কবচ আছে। মৃত ব্যক্তি তার নাম যেন মনে রাখতে পারে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসের বা খাওয়া-দাওয়ার যেন কষ্ট না হয় পরলোকে—পানীয় জলে যেন আগুন না জ্বলে, আঁধারে যেন আলো দেখতে পাওয়া যায়, শ্বাপদ ও হিংস্র দানবেরা যেন কাছে আসতে না পারে, এমনি নানা কল্পিত বিপদ থেকে আত্মাকে রক্ষার ব্যবস্থা করতো পুরোহিতরা। প্রসঙ্গটির বিস্তারিত উল্লেখ করে। প্রখ্যাত মিশরতত্ত্ববিদ্ ব্রেস্টেড্ বলেছেন,—"Thus the earliest moral development which we can trace in the ancient East was suddenly arrested or checked by the detestable devices of a corrupt priesthood eager for gain." অর্থাৎ, দুর্নীতিপরায়ণ পুরোহিতকুলের ঘৃণিত কূটকৌশলের ফলেই প্রাচীন প্রাচ্য জগতে নৈতিক অভ্যুদয় অর্ধপথে এমন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

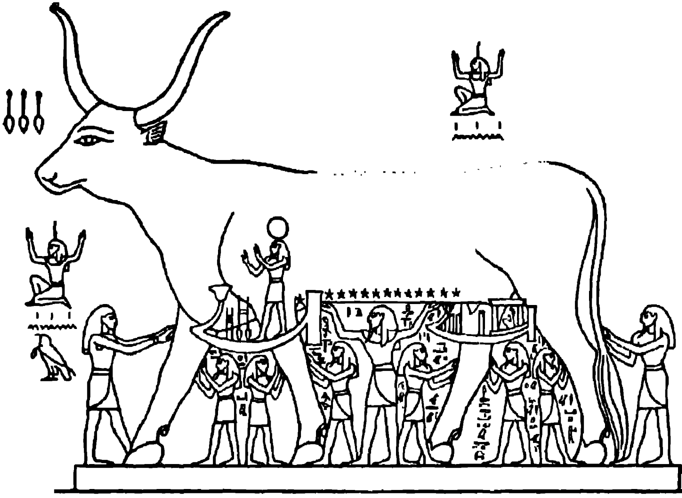
কিন্তু সভ্যতার হিসাব-খাতায় পুরোহিতগোষ্ঠী যে শুধু লোকসানের অঙ্কই লিখে গেছেন, লাভের কোন অঙ্কই বসান নি, এ-কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার করতেন তাঁরা লোকদের প্রতারিত করবার জন্য-নিজেরা সেগুলি বিশ্বাস করতেন না, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই—অন্তত সভ্যতার আদিযুগে বিজ্ঞান যখন মানুষের অন্তরে সবে উঁকি ঝুঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। জ্ঞানের অভাবকে তখন ইন্দ্রজাল দিয়েই পূরণ করতে হয়েছে, যেমন দেখা যায় আদিম সমাজে। কুসংস্কারের কারণ,—পুরোহিতের কারসাজি নয়, প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে পুরোহিত যে

ইন্দ্রজাল পরিত্যাগ করেন নি, তার কারণ স্বার্থ-বোধ যেমন, জাতীয় ঐতিহ্য ও রক্ষণশীল মনোভাবও তেমনি। ফলে অন্তকে প্রবঞ্চনা করবার আগেই তাঁরা আত্মপ্রতারণা করেছেন নিজেদের অজ্ঞাতসারে। লিখন-বিদ্যা সৃষ্টি করেছেন এই পুরোহিতগোষ্ঠী, দীর্ঘকাল পর্যন্ত একমাত্র তাঁরাই ছিলেন লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তি, চিন্তাশীল পণ্ডিতমানুষও ছিলেন তাঁরাই। ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, রাজনীতি—সব রকম বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, বিজ্ঞানের অনুশীলন চিরকাল ধরে পুরোহিতরাই করে এসেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'থাক্-কাটা পিরামিড'-নির্মাতা ইম্‌হটেপের নাম করা যেতে পারে। তিনি ছিলেন রাজার প্রধান পুরোহিত, ইঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিক, গণিত শাস্ত্রবিদ এবং রাজমন্ত্রী। গ্রীক সভ্যতার যুগে হিরোডোটাস যে-সব দেশ পরিদর্শন করেছিলেন সেই দেশগুলির নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনি তত্রত্য পুরোহিতদের কাছ থেকে, তারা সকলেই মনে প্রাণে তাঁকে সাহায্য করেছিল। সে-যুগে সংস্কৃতির ধারক ও বাহকই ছিল পুরোহিতমণ্ডলী। এই মণ্ডলীর বাইরে জনসাধারণ ছিল নিরক্ষর, কল্পনা-বর্জিত—প্রতিদিনের জীবনযাপন ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই তাদের ছিল না। পুরোহিতকুলের প্রতি তাদের ছিল গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অনুরাগ। এমন কি বিজেতারাও তাদের সম্মান করতেন।

৩

বিশ্ব প্রকৃতি ও সৃষ্টিতত্ত্ব : দর্শন

মিশরবাসীর অন্তরে সূর্য ও নীল নদী নানা বর্ণ বৈচিত্র্যের গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিল, তেমনি রেখাপাত করেছিল সেখানে আর একটি প্রাকৃতিক অবস্থা। নীল উপত্যকার দুই পাশে দেখা যায় একই প্রকার সু-উচ্চ মরু-প্রান্তর, নদীর উভয় তীরে কোথাও বা একই ধরনের পাহাড়ের শ্রেণী। পূর্ব ও পশ্চিমে এই দৃশ্যের সাদৃশ্য যেন মানুষের দুই হস্ত দুই পদেরই মত। সূর্য চন্দ্রও আকাশের দুটি দিব্য চক্ষু। এই রকম যুগ্ম অবস্থার মিলন-সৌষ্ঠবকে বলা হয় 'সিমেট্রি' বিশ্ব-



দিব্য গাভী—ধারণ করে আছেন দেবতারা—মাঝখানে বায়ুদেবতা "সু" তলদেশে নক্ষত্র-মণ্ডিত আকাশ—সূর্যদেবের দিব্য বজরা ভেসে চলেছে

প্রকৃতির রূপ-কল্পনায় মিশরীয় মনের মিলন-সৌষ্ঠবের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। উপরে যেমন আকাশ রয়েছে, পাতালের স্থান তেমনি নিচে। আকাশ যদি হয় একটি গোলাকৃতি চাকতি বিশেষ, তবে পাতালকেও তেমনি একটি চাকতির আকৃতি দান করে বিশ্বের 'সিমেট্রি' বজায় রাখতে হবে। কিন্তু সেই

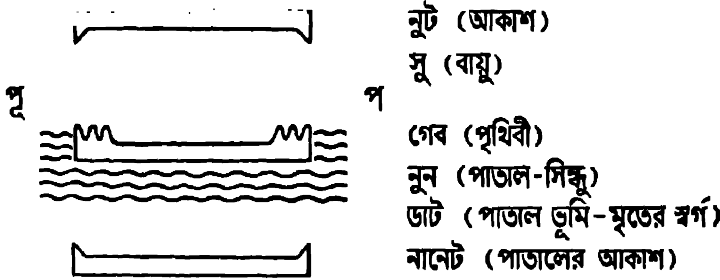
সঙ্গে এ-কথা মনে করতে বাধা নেই যে আকাশ একটি গাভী, তলভাগটি তার নক্ষত্র-খচিত, পৃথিবীর চার কোণে চারটি পা রেখে দাঁড়িয়ে। কল্পনা, যেমন ইচ্ছা করা চলে, ক্ষতি নেই—খুঁটি দিয়ে বিধৃত আকাশ, কিম্বা দেয়ালের ওপর ছাদের মত বিছানো আকাশ, অথবা গাভী-রূপী আকাশ। তিন হাজার বছর ধরে মিশরীয় কল্পনা গড়িয়ে চলেছে যেন চলচ্ছবির মত, সেই ছবির মতই তরল বহমান প্রবাহ। আমরা কিন্তু চাই চলমান কল্পনাকে ফটোগ্রাফের স্থির রূপ দিয়ে ফ্রেমে বেঁধে বর্ণনা করতে। কাজেই এখানে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের যে-চিত্র অঙ্কিত করবো সেটি জীবন্ত প্রবাহের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি নয়, নানা রূপ-কল্পনার ফটো থেকে একটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে মাত্র।

মিশরীয়া মনে করতো পৃথিবী একটি ঢেউ-খেলানো কাঁধা-যুক্ত থালার মত। কাঁধাগুলি পাহাড় ও বিদেশ, আর কাঁধার নিচের ভাগই মিশর। পৃথিবীরূপী থালাটি পাতাল-সিন্দুর ওপর ভাসমান। আদিম পাতাল-সমুদ্রের নাম 'নুন' (Nun)। আদিম পয়োধি-সলিল থেকে জীবনের উদ্ভব, সূর্যকে প্রাণ-শক্তি দান করে পাতালের পয়োধি-বারি, নীল নদীর জলধারা পাতালেব পয়োধি থেকে উৎসারিত।* পৃথিবীর ওপর আকাশ রয়েছে চারটি খুঁটির ওপর দণ্ডায়মান, খুঁটিগুলি পৃথিবীর চার প্রান্তে প্রোথিত। এই ভাবটি প্রকাশ পায় দেবতার উদ্দেশে জনৈক রাজার এই প্রশস্তি বাক্যে: "তোমার প্রতি ভয়কে প্রসারিত করেছি আমি, দিক দিগন্তে আকাশের চারটি স্তম্ভ পর্যন্ত।" আকাশ-দেবী 'নুট' আর পৃথ্বী-দেবতা 'গেব'-এর মধ্যে অবস্থান করেন বায়ু দেবতা 'সু'। বায়ু দেবতা তার বাহু দিয়ে আকাশকে ধারণ করেন। আকাশ দেবী 'নুট'-কে স্বর্গের গাভী-রূপেও কল্পনা করা হয়েছে, তলপেটটি তার নক্ষত্র-খচিত। পাতাল-সিন্ধু 'নুন'-এর নিচেই রয়েছে পাতালভূমি 'ডাট'। 'ডাটই'-ই মৃত ব্যক্তির চির শান্তিময় অমর লোক। মিশরের আকাশে সকল নক্ষত্রেরই উত্থান পতন দেখা যায়, কিন্তু উত্তর দেশের ধ্রুবতারা ও সেই নক্ষত্রকে ঘিরে যে সব জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বিরাজ করছে তারা স্থির, অনির্বাণ। তাদের নেই মৃত্যু, নেই ক্ষয়। মৃতের স্বর্গ 'ডাট'-এর

*পূর্ব অধ্যায়ে 'ইখনাটন স্তোত্র' দ্রষ্টব্য। সেখানে বলা হয়েছে, আকাশে আছে একটি নীল নদী, জলধারা বর্ষণ করে, আর মিশরে নীল নদী পাতাল থেকে উঠেছে:

"বিদেশী মানুষের জন্ত, প্রতি দেশের জীবের জন্ত আকাশে আছে একটি নীল নদী;
(কিন্তু) মিশরে নীল নদী পাতাল ফুঁড়ে উঠেছে।"

স্থান প্রথমে নির্দেশ করা হয়েছিল উত্তরায়ণের সেই ধ্রুবলোকে। কিন্তু 'অসিরিস মার্গে'-র (Osiris cult) অভ্যুত্থানের সঙ্গে স্বর্গলোকের স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। সূর্য যেদিকে অস্তাচলে যান সেই পশ্চিমদিকই মৃতের গন্তব্য পথ বলে নির্দিষ্ট হল, আর যে অন্ধকার পাতাল-পুরীর মধ্যে সূর্য পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, সেই পাতালই মৃতের স্বর্গে পরিণত হয়েছিল। পাতালের নিচে আছে আর একটি আকাশ—উর্ধ্বাকাশ 'নুট'-এরই প্রতিরূপ অধোদেশের আকাশ —তার নাম 'নানেট'। নানেটের আকারও একটি কাঁধা-যুক্ত থালার মত। বায়ু দেবতা 'সু' যেমন পৃথিবীকে আকাশ থেকে পৃথক করে রেখেছেন, তেমনি পাতাল-জগতের 'ডাট' অবস্থান করেন পাতাল-সিন্ধু 'নুন' ও পাতালের আকাশ 'নানেট'-এর মধ্য স্থানে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ডায়াগ্রাম বা রেখা-চিত্র এইরূপ :



রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলেছেন,

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে…

মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্বেও আদি জননী সিন্ধু (primordial waters) থেকেই পৃথিবীর জন্ম। কিন্তু পৃথিবী সিন্ধুর একমাত্র কন্যা নন। জীবনের উদ্ভব, সূর্যের প্রতিদিনকার নব অভ্যুদয় জলধিগর্ভ থেকেই হয়ে থাকে। এমন কি দেব-দেবীরাও সেই আদি সিন্ধুরই সন্তান। পয়োধি-সলিলের মাঝ থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছিল একটি আদি পাহাড়ের চূড়া (primeval rock) যেখানে সৃষ্টি-দেবতার (creator-god) প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল। সেই আদি পাহাড়ের প্রতীক রূপেই সুউচ্চ পিরামিডগুলি তৈরি করা হয়েছিল মৃতের জীবনের নব উন্মেষকে ইঙ্গিত করে। "মৃতের গ্রন্থে" (Book of the Dead) সৃষ্টি-দেবতার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে : "আমি আটুম তখন, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে

ছিলাম (আদি-সিন্ধু) নুনের মধ্যে একলাটি। রে (সূর্য) রূপেই আমার প্রথম আবির্ভাব যখন রে শাসন করতে লাগলেন তাঁর নিজের সৃষ্টিকে। কথাটার অর্থ কি? রে নিজের সৃষ্টিকে শাসন করলেন, কথাটির অর্থ এই যে আকাশকে যখন পৃথিবী থেকে পৃথক করে উর্ধ্বে তুলে ধরলেন বায়ু-দেবতা সু, তার পূর্বেই রে অবস্থান করছিলেন আদি পাহাড়ের চূড়ায়। সেই পাহাড়টি ছিল 'হারমোপলিস' নগরে।"

এই বর্ণনা থেকে যে-বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায় তা এই যে সৃষ্টির পূর্বে আকাশ পাতাল পৃথিবী দেব-দেবী কিছুই ছিল না। এমন কি, সৃষ্টির পূর্বে রে নিজেও ছিলেন না, আদি-সিন্ধু নুনই ছিল একমাত্র সত্ত্বা। ভাষার ব্যঞ্জনা-শক্তির সীমা আছে, সেই জন্যই আদি সত্ত্বা নুনকে আদি-সিন্ধু বলেই ভাষায় প্রকাশ করতে হয়েছে। আসলে পদার্থটি আদি প্রকৃতির নাম-রূপ শূন্য বিশৃঙ্খলা (formless chaos) এবং অন্ধকার। সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা সম্বন্ধে বাইবেলে বলা হয়েছে: পৃথিবী ছিল পতিত ও শূন্য, সাগরের মুখটি ছিল আঁধারে ঢাকা ("The Earth was waste and void, and darkness was upon the face of the deep")। বাইবেলের এই আকৃতি প্রকৃতির সঙ্গে মিশরীয় কল্পনার সাদৃশ্য থাকলেও সৃষ্টির তত্ত্ব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটি বিরাট প্রভেদ এই যে, বাইবেলের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বিশৃঙ্খল আদি প্রকৃতির পাশেই অবস্থান করছিলেন (deus ex machina), আর মিশরীয় চিন্তায় আদি-প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকে সৃষ্টিদেবতার আবির্ভাবের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। আদি পাহাড়ের চূড়ায় যে আটুমকে দেখা যায় সূর্যরূপে, তিনি স্বয়ম্ভূ। 'আটুম' শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ,—'সব কিছু ও কিছুই নয়'। একদিকে সর্বব্যাপক (all inclusive) অন্য দিকে আবার 'সর্বশূন্য' (emptiness)—যে-শূন্যকে দেখা যায় আরম্ভের পূর্বে ও সমাপ্তির অন্তে। ঝড়ের পূর্বে যে অর্থপূর্ণ নৈস্তব্ধকে অনুভব করা যায় আটুমের বিরাট শূন্যতাও তেমনিধারা কোন নিষ্ক্রিয়া, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে ক্রিয়াশক্তির অফুরন্ত সম্ভাবনা।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে এমনি নানা কথা বিনিয়ে বলা যায়, নানা স্থানে তার ভিন্ন রূপ বর্ণনাও আছে। 'মৃতের পুস্তকে' বলা হয়েছে যে, স্বয়ম্ভূ সূর্যদেবতা নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশের নামকরণ করলেন এবং সেই নাম থেকেই দেবগণের উৎপত্তি হয়েছিল। দেবগণকে স্বয়ম্ভূর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে কল্পনা করে শুধু যে

অংশগুলির মধ্যে যোগাযোগের পথ মুক্ত রাখা হয়েছে তা নয়, বর্ণনায় এক ও বহুর দার্শনিক সমন্বয়ের ভাবও পরিস্ফুট। নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে দেবগণের সৃষ্টি হল, কথাটার একটি তাৎপর্য আছে। নাম জিনিসকে তার বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্ব ও শক্তি দান করে, তাই নামের উচ্চারণ বা শব্দ সৃষ্টিরই নামান্তর। একটি চিত্রে এঁকে দেখানো হয়েছে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে বসে সৃষ্টিকর্তা কেমন করে তার চার জোড়া অঙ্কের আটটি নাম সৃষ্টি করলেন, এবং প্রতিটি নামের সঙ্গে কিরূপে একটি করে দেবতার আবির্ভাব হলো। 'পিরামিড টেক্সট' (Pyramid Text) নামক সংকলন গ্রন্থে ভিন্ন রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আদি পাহাড়ের চূড়ায় উপবিষ্ট সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে বলা হয়েছে সেখানে : "নিষ্ঠীবন-রূপে নিক্ষেপ করেছ তুমি 'সু'-কে উদ্গার করে বের করেছ 'টেফনুট'কে।" 'সু' পবন দেবতা, আর 'টেফনুট' তার স্ত্রী আর্দ্রতার (moisture) দেবী। এই দুই দেবতা—বায়ু ও আর্দ্রতা—জন্ম দিলেন পৃথিবী ও আকাশকে। পৃথিবীর দেবতা 'গেব' আর আকাশের দেবী 'নুট' থেকে জন্মগ্রহণ করলো দুইটি দেব-দম্পতি—অসিরিস ও তার পত্নী আইসিস, 'সেট' ও তার পত্নী নেফথিস (Nephthys)। জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব এরা, এদের সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলা যায় না। এমনি করে সূর্যদেব 'আটুম'কে নিয়ে নয়টি দেবতার (Ennead) সৃষ্টি কল্পনা করা হয়েছিল।

সু—টেফনেট
গেব—নুট
অসিরিস—আইসিস
সেট—নেফথিস

মাইথলজির কল্পনাকে বাদ দিয়ে যে সার বস্তু বের করা যায় এই বর্ণনা থেকে তা এই : নানা সম্ভাবনাপূর্ণ 'শূন্য'—আটুম (বা আটন) যার নাম—তিনিই নিজেকে বিভক্ত করেছেন দুই ভাগে, এক ভাগ বাতাস, অন্য ভাগ আর্দ্রতা। সেই বাতাস ও আর্দ্রতা জমাট বেঁধে পৃথিবী ও আকাশের রূপ নিয়েছে। আর পৃথিবী ও আকাশ থেকেই যাবতীয় জীবের জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লা-প্লাস (La-place) নীহারিকার বাষ্প-কণাগুলি (nebulae) ঘনীভূত হয়ে তাই থেকেই বিশ্ব-সৃষ্টি হয়েছে, এই মতবাদ প্রবর্তন করেন। এই মতবাদকে বৈজ্ঞানিকরা বলেন Nebular Theory. মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্বের বাতাস

ও আর্দ্রতার আধুনিক নাম যদি দেওয়া হয় নীহারিকা, তাহলে লা-প্লাসের থিওরির সঙ্গে সেই প্রাচীন তত্ত্বকথার প্রভেদ থাকে খুবই অল্প।

নয়টি দেবতা বা Ennead-এর বিবরণ থেকে বিশ্ব সৃষ্টির যে-রকম সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়, মানুষের জন্ম সম্বন্ধে তেমনটি সম্ভব নয়। এ-কথা বলা হয়েছে বটে যে ছাগ-রূপী দেবতা 'নুম' মানুষকে কুমারের চাকায় তৈরী করেছিলেন, কিন্তু এরূপ কাহিনীর তত্ত্বকথা বিক্ষিপ্ত ছিটে-ফোঁটা, ধারাবাহিক বর্ণনা নয় যে সৃষ্টির মূলতত্ত্বের সঙ্গে ধাপে ধাপে মিলে যাবে। বস্তুত মনুষ্য সৃষ্টিকে পৃথকভাবে কল্পনা করবার প্রয়োজন ছিল না মিশরীদের, কেন না তাদের চিন্তা কখনো দেবতা মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে কোন প্রভেদরেখা টেনে দেয় নি। দেবত যেমন সৃষ্টি হল, তেমনি হল মানুষ, অন্যান্য জীব-জন্তুও তেমনই। কিন্তু মিশরীয় ভাবধারা এমনি কোন সঙ্গীতপূর্ণ দৃষ্টির আভাস দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, বিষয়টিকে ভিন্ন রূপেও প্রকাশ করেছে। যেমন, একটি লেখনে সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে,— "সৃষ্টি-দেবতা মানুষকে তার প্রতিরূপ করেই তৈরি করেছিলেন (Mankind was made in the image of God)। মানুষ সৃষ্টি-দেবতার প্রতিমূর্তি তারই দেহ থেকে বেরিয়েছে।" মানুষের প্রতি অপরিসীম স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা দেবতার, "মানুষ দেবতার পশুপাল, তাই মানুষের যত্ন করেন দেবতা।" সৃষ্টিদেবতা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন মানুষেরই অভিপ্রায় মত, সব বকম প্রাণী পশু পক্ষী উদ্ভিদের সৃষ্টি করেছেন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। মানুষের জন্যই বিশ্বসৃষ্টি এই কল্পনার নূতনত্ব লক্ষ্য করবার বিষয়। 'মিথে' থাকে শুধু কাহিনী ও বর্ণনা, সেখানে উদ্দেশ্যকে এমনধারা স্পষ্ট করে ব্যক্ত কববার কথা নয়। একটি নৈতিক অভিপ্রায়ের (moral purpose) অভিব্যক্তি দেখা যায় এখানে। মানুষকে ধ্বংস করেন তিনি, যখন সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মানুষের অধঃপতনকে বন্ধ করবার চেষ্টাও করেন তিনি, আর শত্রুকে করেন বিনাশ। বস্তুত এই বর্ণনায় মিশরের সৃষ্টি-দেবতার যে রূপটি আমরা দেখতে পাই, সে-রূপ অনেকটা হিব্রু ধর্মের বাইবেল-বর্ণিত দীনদুনিয়ার মালিক শত্রুধ্বংসকারী জাভে-(Javeh)-রই মত।

সৃষ্টি বিষয়ে সবচেয়ে সূক্ষ্ম কল্পনাটি রয়েছে 'মেমফিসের ধর্মতত্ত্বে' (Memphite Theology), সে-সম্বন্ধে কিছু না বললে মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ-পর্যন্ত আমরা যে-সব পুরাণ-কথা বা 'মিথে'র বর্ণনা দিয়েছি, তার

সঙ্গে 'মেমফাইট থিওলজি'র প্রভেদ আকাশ পাতাল। মিশরে কেবল 'মিথ'ই আছে, দর্শন নেই। তাই যখন এই ধর্মতত্ত্বে বিশ্বজগতের প্রকৃতি বিষয়ে দার্শনিক গবেষণার অবতারণা দেখতে পাওয়া যায়, তখন মনে হয়, এটা যেন মিশরের জিনিসই নয়—ছটকে এসে পড়েছে অন্য কোথাও থেকে। কিন্তু এ-কথাও ঠিক, প্রভেদটা বাইরে থেকে যত বড় বোধ হয় আসলে ততখানি নয়। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক তত্ত্বগুলি টুকরো টুকরো ভাবে ছড়ানো ছিল 'মিথে'র মধ্যে, 'মেমফাইট থিওলজি' সেগুলিকে কুড়িয়ে সাজিয়ে সুসম্বদ্ধ আকার দান করেছে। খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে ফারাও সাবাকা তত্ত্বকথাগুলিকে একখণ্ড পাথরে খোদাই করেছিলেন, পাথরটি এখন আছে ব্রিটিশ মিউজিয়মে। ইতিহাস থেকে মিশরের নাম মুছে যাবার প্রাক্‌কালের এই শিলালিপি, কিন্তু কথাগুলি নূতন নয়। ফারাও নিজেই বলেছেন, তিনি মাত্র পূর্বপুরুষের তত্ত্বকথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন। তা ছাড়া, শিলালিপির ভাষাও পুরানো দেখা যায়। মেমফিস প্রাচীন শহর। প্রথম বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল এখানে, উত্থান-পতনের পর আবার জেগে উঠেছিল শহরটি। এখানকার নগর-দেবতা 'টা' (Ptah)-কেই কেন্দ্র করে দর্শনতত্ত্ব রচনা করা হয়েছিল। নগরের কারিগরদের দেবতা ছিলেন টা। কারিগরি সৃজন-শক্তির মূলাধার তিনি, বিশ্বকর্মা দেবতা, যাঁর প্রসাদে কারিগর ও শিল্পী কার্যে দক্ষতা লাভ করে। যে-সৃজন-শক্তি মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্য, কুম্ভকারের ঘট পট, ধাতু শিল্পীর বিবিধ সামগ্রীর আকার দান করে, সেই বিশ্বকর্মা দেবতাকেই ব্যাপক ভাবে নিরীক্ষণ করে মেমফিসের পুরোহিতরা বিশ্বস্রষ্টার কল্পনা করেছিলেন।

মেমফাইট দর্শন-তত্ত্বে চিন্তা ও বাক্য বা শব্দকে সৃষ্টির মূল বলা হয়েছে। কার চিন্তা ও বাক্য ? 'টা'-এর। চিন্তার উৎপত্তি স্থান হৃদয়, বাক্যের উৎপত্তি স্থান জিহ্বা। হৃদয় যে রূপের কল্পনা করে, বাক্য সেই রূপকেই প্রকাশ করে। বাক্যই আদেশ—'টা'-এর হৃদয়ের চিন্তা বা কল্পনা জিহ্বাগ্রে দেখা দেয় আদর্শ বাক্য রূপে, আর সেই আদর্শ বাক্যই বাহ্যত সৃষ্ট বস্তুরূপে পরিদৃশ্যমান। টা'-ই সৃষ্টির আদি কারণ (First Cause), সূর্য-দেবতা আটন-রে'রও পরাৎপর। "টা বিরাট, মহান, একমেবাদ্বিতীয়ম্ (The Great One)। নয়টি দেবতা (Ennead) তাঁরই সৃষ্ট। তিনিই নবদেবতার হৃদয় ও জিহ্বা। আটন তারই মানস-জাত সন্তান, তারই আদেশ-বাক্যের অভিব্যক্তি।" বিরাট, মহান, নিগু́ন সত্তা, তিনি অসৎ (nothing)। তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রে—'অসদেব

অগ্রে আসীৎ' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)। সেই অসৎ-এর গর্ভে মানসী কল্পনা-রূপে আটনের আবির্ভাব হয়েছিল। আমরা আশ্চর্য হই এই দেখে যে 'আটন' এখানে বৈদিক 'হিরণ্যগর্ভে'র প্রতিরূপ ছাড়া আর কেউ নন।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্য জাতঃ পতিরেকো আসীৎ ॥

(ঋক্ বেদ)

হিরণগর্ভ বা প্রজাপতির আবির্ভাব হয়েছিল সকলের পূর্বে। তিনিই বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর :

আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভঃ

তিনি দেবগণের আত্মা, সারা বিশ্বের গর্ভস্বরূপ। আটনের যে তত্ত্বকথা পূর্বে বলা হয়েছে তার সঙ্গে হিরণ্যগর্ভের এই বৈদিক বর্ণনার প্রভেদ ভাষাগত, মৌলিক নয়। আদি সত্তা থেকে সৃষ্টিশক্তিকে (creative principle) পৃথক করে গ্রীকরা সেই সৃষ্টিশক্তির নাম দিয়েছিলেন 'লোগোস' (Logos)। এই 'লোগোসে'রই ভারতীয় রূপ 'হিরণ্যগর্ভ'। গ্রীক দর্শনের লোগোস-তত্ত্বকে অবলম্বন করে বাইবেলের নব-বিধান (New Testament) বলেছেন : "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." অর্থাৎ সর্বাগ্রে ছিলেন শব্দ, ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন শব্দ, আর সেই শব্দই ছিলেন ঈশ্বর। মিশরীয় ভাষায় 'টা'র হৃদয়ে দেখা দেয় কামনা। এই কথাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, 'স অকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়'—অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলেন বহু রূপে জন্ম গ্রহণ করবো। 'টা'র হৃদয়ের কামনাকে শব্দ রূপ দান করেছে তার জিহ্বা আর এই সৃষ্টি কার্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন 'আটন'। মিশরের সৃষ্টি-দেবতা (creator god) আটনের সঙ্গে যে-লোগোসতত্ত্ব বাইবেলের নববিধানে দেখা যায় সেই তত্ত্বের গভীর সাদৃশ্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিক ব্রেস্টেড।*

'টা'র সৃজন শক্তি সৃষ্টিকর্তার জন্মের সঙ্গে অথবা দেবতাদের সৃষ্টির সঙ্গেই শেষ

* "This primitive "logos" is undoubtedly the incipient germ of the later logos doctrine which found its origin in Egypt. Early Greek philosophy may also have drawn upon it." (Breasted's History of Egypt—p. 358).

হয় নি। সৃষ্টি চলেছে নিরন্তর। যেখানেই হৃদয় চিন্তা করে আর জিহ্বা আদেশ বাক্য উচ্চারণ করে সৃষ্টির আবির্ভাবও সেখানে। "হৃদয় ও জিহ্বা দেহের প্রতিটি অঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে। দেব মানব জীব জন্তু সকল প্রাণীর শরীরে 'টা' হৃদয়রূপে আসীন, সকল প্রাণীর মুখ বিবরে জিহ্বারূপে বিরাজমান। সকল প্রাণী জীবন-ধারন করে, হৃদয়ে ও জিহ্বায় অবস্থিত 'টা'র চিন্তা ও আদেশবাক্যের কল্যাণে।" এখাণে আমরা পাই সৃষ্টির আর একটি তত্ত্ব। সৃষ্টি এমন কোন অত্যাশ্চর্য অনৈসর্গিক ব্যাপার (miracle) নয়, যা একটিবার মাত্র ঘটেছিল বিশ্বের ইতিহাসে সৃষ্টি-দেবতা আটনের সৃজন-কালে। যেখানে দেখি চিন্তা, যেখানে শুনি আদেশবাণী, সেখানেই বুঝতে হবে 'টা' তার সৃজন কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, আশ্রয়-স্বরূপ।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আত্মবোধ ও বিশ্বরূপের চিন্তা মিশরীদের মনে যথেষ্ট জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে কল্পনা করা হয়েছিল মিশরের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মিশরীদের অভিজ্ঞতা থেকে। যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাব সেখানে বিশ্ব-রূপের চিত্র-অঙ্কন কল্পনা নিয়ে খেলা মাত্র। নিছক কল্পনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য কদাচিৎ ধরা দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাটি বিস্মৃত হলে চলবে না যে, দর্শনচিন্তার পথে অগ্রগতির একটি বড় ধাপ অতিক্রম করেছিল মিশর, যখন বিশ্ব-সৃটিকে কামার-কুমারের বস্তু নির্মাণের মত একটি বাহ্যিক ক্রিয়া বলে মনে না করে আত্মার চিন্তা ও বাক্যের অভিব্যক্তি রূপেই কল্পনা করা হয়েছিল। এই দর্শন-চিন্তাকে দার্শনিকের ভাষায় ব্যক্ত করে নি মিশরীরা, 'হৃদয়' 'জিহ্বা' প্রভৃতি স্থূল ভাষার ব্যবহার করেছে। কিন্তু কথা-গুলির তাৎপর্য বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।

৪

সাহিত্য : নীতি

খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে সামন্তদের গৃহে জগতের সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার স্থাপনার কথা আমরা বলেছি মধ্যম রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে। সামন্তদের গৃহ-লাইব্রেরীতে সুদীর্ঘ প্যাপিরাস কাগজ মুড়ে জালার মধ্যে ভরা হত। তারপর লেবেল মেরে জালাটিকে তাকের ওপর তুলে রাখা হত। সেইসব গ্রন্থের কিয়দংশ পাওয়া গেছে সমাধিমন্দিরে সংরক্ষিত—পৃথিবীর প্রাচীনতম কথা-সাহিত্য, রহস্যকাহিনী, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি ইন্দ্রজাল। সাম্রাজ্যযুগে টেল-এল-আমরনায় আমরনা-পত্রাবলীও আমাদের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন লেখন—পদ্যে রচিত ধর্মবিষয়ক স্তোত্র আর ঝাড় ফুঁকের ছড়া, যা পঞ্চম ও ষষ্ঠ বংশীয়দের রাজত্বকালে পাঁচটি পিরামিডের গায়ে খোদাই করা হয়েছিল। এই লেখনগুলিকে সংকলন করে যে-গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, তার নাম 'পিরামিড টেক্সট'। যেমন যুগের পরিবর্তন হতে লাগলো, সাহিত্য-রচনাও অমনি ধর্মকথা ছেড়ে পার্থিব জীবনকেই আশ্রয় করেছিল। অবশ্য অতি প্রাচীন কালেও যে প্রেমের কাহিনী রচিত হয় নি, তা নয়। কোন অপ্সরার একজন রাখালের প্রতি আসক্তি জন্মেছিল—সেই প্রসঙ্গে কাহিনীতে বলা হয়েছে : "রাখাল দেখলে অপ্সরাকে পুকুর পাড়ে। অপ্সরাও দেখলে রাখালকে, কাপড় ছুড়ে ফেলে চুল এলিয়ে দিলে।" কিন্তু রাখাল তার কাছে প্রেম নিবেদন করলে না। অপ্সরার সেই নগ্ন সৌন্দর্য দেখে দেহটি তার কাঁটা দিয়ে উঠলো। মন শঙ্কায় ভরে গেল। ব্যাপারটির বর্ণনা দিয়েছে রাখাল খুবই সংযতভাবে : "সে আমায় যা করতে বলেছিল আমি তা কখনো করতে পারবো না। আমার সারা দেহটিকে বিভীষিকা আচ্ছন্ন করে রেখেছে।"

সাহিত্যে প্রেমের কবিতা বিস্তর, রসবস্তুও রয়েছে তাতে প্রচুর, কিন্তু অনেকগুলিই ভাই বোনের প্রেমের কথা, যা আমাদের নৈতিক রুচিকে আঘাত করে। একটি কবিতার শিরোনামা—"তোমার প্রেয়সী ভগ্নীর আনন্দ-গান" (**The Beautiful Joyous Songs of thy sister whom thy heart**

loves)। সাম্রাজ্যের শেষভাগের একটি রচনায় আমরা যেন আধুনিক গানের সুরকেই শুনতে পাই পুরানো বাঁশীর মধ্যে :

দেখে দয়িতারে হর্ষভরে হৃদয় আমার নাচে,
আমি চাই তারে বাঁধিবারে বাহু পাশে,
ধূপ-গন্ধ চৌদিকে ছড়ায় যখন সে আসে।
কুসুম কোমল প্রিয়ার সে আলিঙ্গন,
মনে হয় যেন কোন রম্য উপবনে প্রবেশ করেছি।
অধরে পীযূষ ক্ষরে, চুম্বনে মদিরা,
মত্ত হই মদ্য পান বিনা।

রচনাটি কবিতা কি না বোঝবার জো নেই, একটানা লেখা ছন্দ, ভাগ করা নয়। মিশরীয় কবিতায় সুর ও অনুভূতিই সার বস্তু, বাইরের আকার গৌণ। অবশ্য আদিকাল থেকেই সেখানে ছন্দ রচনা দেখা যায়। অনুপ্রাস পিরামিডের মতই পুরানো। ছত্র ছন্দ ও ভাবের পুনরাবৃত্তি (parallelism of members), আমরা যাকে বলি ধ্বনি আর গানে যেমন থাকে ধুয়া, তেমনি ধ্বনির ও ধুয়ার ব্যবহার মিশরেও ছিল যেমন ছিল ব্যাবিলোনিয়ায়। এই ধ্বনিরই পরিপূর্ণ রূপ সৌন্দর্য হিব্রুদের ধর্মগান 'সাম' (Psalm)-এ ফুটে বেরিয়েছে।*

---

* রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত "প্রাচীন মিশরের প্রেমের কবিতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা ভাষায় কয়েকটি মিশরীয় কবিতার সুষ্ঠু পদ্যরূপ দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি কবিতায় বৈষ্ণব কবির বিপ্রলব্ধা নায়িকার মর্মন্তুদ হৃদয়োচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধকারের অনবদ্য ছন্দবন্ধের কয়েক ছত্র এখানে আবৃত্তি করা হল :

হায় সখি হায়
বধূয়া গিয়াছে ভুলে
আমার ঘরের পথ বেয়ে যায়
তাকায় না আঁখি তুলে।
কত না যতনে পরি আভরণ
তাকায় না ফিরে কভু
ভালোও বাসে না হায় ভগবান
বেঁচে আছি আজও তবু।

কবিতাটি স্মরণ করিয়ে দেয় কবি চণ্ডীদাসের অপরূপ রচনা: "আমারই বঁধুয়া আনবাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।" প্রাচীন মিশরের ঐ কবিতাটি কিন্তু সার্ধ দুই সহস্র বছর আগেকার।

মিশরীয় সমাজে নারীজাতির স্থান ছিল খুবই উঁচু। পুরুষের সমান অধিকার ছিল স্ত্রীলোকের। বস্তুত কোন কোন বিষয়ে নারীর প্রাধান্যই সমাজে দেখা যায়। অনেক প্রেমের কবিতা নারীর রচিত। একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া গেল :

আমি যে তোমার প্রথম বোনটি
তুমি যেন আমার বাগান।
ফুল চাষ সেখানে করেছি আমি,
ফলিয়েছি ফুলের ফশল,
সাজিয়েছি বীথিটিরে সুরভিত
বনলতা দিয়ে।
সেথা আমি নিয়ে গেছি জলধারা—
দুটি হাত ধুয়ে সেই নীরে
তুমি যেন বসো এসে পাশে,
উত্তরা মলয়া বয় যেথা
স্নিগ্ধ মন্দ মধুর নিশ্বাসে।
কী সুন্দর স্থান! সেথানে বেড়াই
হাতে হাত রেখে,
পাশাপাশি তুমি আর আমি,
চিত্ত ভরা আনন্দে উচ্ছ্বাসে।
দেবকণ্ঠ তোমার সে স্বর শুনে
আবেগে আপন হারা আমি
দেখে অপরূপ রূপ কত যে তরঙ্গ
খেলে প্রাণে,
রসের সে স্বাদ নাই রাজভোগে,
নাই সুধাপানে।

তৃতীয় থাটমোসের দিগ্বিজয় উপলক্ষে কোন অজ্ঞাত নামা কবি একটি 'বিজয় স্তোত্র' (**Hymn of Victory**) রচনা করেছিলেন। সেই স্তোত্রটি কারনাকের মন্দিরে খোদাই করা রয়েছে। স্তোত্রটি মিশরীয় পদ্যের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমন-দেব তাঁর বিজয়ী পুত্রের প্রশস্তি গান করেছেন এই বলে :

বলেন আমন-রে, কারনাকের প্রভু,—
তুমি এসেছ আমার কাছে, পুলকিত তুমি
আমার সৌন্দর্য দেখি,
হে পুত্র, দণ্ডদাতা মেনখেপেরা,
চিরঞ্জীব তুমি,
আমায় উজ্জ্বল করেছে তোমার প্রেম,
মন্দিরে তোমার শুভ আগমনে হৃদয় আমার প্রসারিত,
আমার দুটি বাহু তোমার অঙ্গ ঘিরে
প্রাণ রক্ষা করে।
তোমার বাঁহুবল অতি প্রিয় আমার কাছে।
তোমায় প্রতিষ্ঠিত করেছি আমার আবাসে,
অসাধ্য সাধন করেছি আমি তোমার জন্য,
তোমায় দিয়েছি শক্তি, তোমাকে করেছি দিগ্বিজয়ী,
তোমার ইচ্ছাকে করেছি শক্তি বেগবতী,
আকাশের চারটি স্তম্ভ পর্যন্ত তোমার
দণ্ড ভয়কে করেছি প্রসারিত।

মিশরীয় সাহিত্যের বহু রচনা যে ধ্বংস পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 'অসিরিস মিথ' নিয়ে যে দীর্ঘ নাটক রচিত হয়েছিল তা আর নেই। প্রতি বছর উৎসবকালে জনমণ্ডলীর সামনে এই নাটকটি অভিনীত হত। নাটকের বিকাশের জন্য। সেই সময়ের এক প্যাপিরাসের তাড়ায় বিষয়বস্তু ছিল অসিরিসের জীবন মৃত্যু পুনরুজ্জীবন (resurrection)। পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন নাটক এটি, ভাবের আবেগে পূর্ণ নাটক (passion play)। এমনি কত কবিতা, গান, কথাসাহিত্য নষ্ট হয়ে গেছে, তা কে জানে? ছোট গল্প, ভূতের গল্প, রোমাঞ্চকর অদ্ভুত গল্প, এমনি কত কথিকা আছে মিশরের সাহিত্যে যার রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন রাজ্য যেমন পিরামিড নির্মাণের জন্য খ্যাত, তেমনি মধ্যম রাজ্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল কথা-সাহিত্যের অপরূপ বিকাশের জন্য। সেই সময়ের এক পাপিরাসের তাড়ায় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভ্রমণ ও অভিযানের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। জাহাজ ডুবি একজন নাবিকের কাহিনী, আরব্য-রজনীর সিন্ধবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নাবিক আরম্ভ করেছে এই বলে "আপদ কালের শেষে বিপদের কথা বর্ণনা করতে কত আনন্দই না হয় ভুক্তভোগীর।" তারপর যে-কথাকটি সে বলে গেল তা এইরূপ : খনির কাজে সমুদ্রযাত্রা করেছিল নাবিক একটি জাহাজে। জাহাজটি ১৮০ ফুট লম্বা, ৬০ ফুট চওড়া, নাবিকের সংখ্যা ১২০ জন। সমুদ্র মধ্যে তুফান উঠলো, উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে জাহাজ ডুবে গেল। কেউ বাঁচলো না, শুধু সেই নাবিক ভাসতে ভাসতে গিয়ে উঠলো জনমানবশূন্য একটি দ্বীপে। সেখানে থাকতো একটি সর্পরাজ, ৩০ হাত লম্বা, দাড়ির দৈর্ঘ ২ হাত। দেহটি তার সোনা দিয়ে মোড়া। নাবিকের কাছে এসে মুখ বিবৃত করলেন নাগরাজ। ভয়ে জড় সড় হয়ে নাবিক করলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। সর্পরাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে তুমি কেন এসেছ বাছা ?" নাবিক তখন তার দুর্দশার কথা বললে। তাই শুনে দয়া পরবশ হয়ে সর্পরাজ তাকে মুখে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, এবং যত্ন করে চার মাস রাখবার পর তাকে মিশরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সাগর স্ফীত হয়ে উঠে দ্বীপটিকে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

আরব্য রজনীর 'আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যু'র অনুরূপ একটি কাহিনীও আছে। সাম্রাজ্যযুগের জনৈক সেনাপতি প্যালাস্টাইন অভিযানে যাত্রা করেছিলেন, এবং সেই সময় কোন সুরক্ষিত শহরে প্রবেশ করেছিলেন তিনি বণিকের ছদ্মবেশে। সওদাগরের সঙ্গে ছিল কতগুলি পিপা, আর পিপার মধ্যে ছিল সশস্ত্র সৈন্য। এমনি ধারা গোপনে সৈন্য আমদানি করে সেনাপতি শহরটি অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সিনুহে (Senuhe) নামে একজন রাজকর্মচারীর অভিযানের বর্ণনা আছে আর একটি কাহিনীতে। প্রথম আমেনহটেপের মৃত্যুর পর তিনি দেশত্যাগী হন। বিদেশে প্রভূত ধনসম্পত্তি ও সম্মান লাভ করেও তার মনটি দেশেই পড়ে ছিল। দেশের জন্য প্রাণ কেমন আকুলি-বিকুলি করে, সে-কথা বলে আর্তস্বরে কেঁদে উঠেছেন তিনি,—"মৃত্যুর পর জন্মভূমিতে দেহের সমাধির চেয়ে বড় আকাঙ্খা আমার আর কিছু নেই। জগদীশ্বর, দয়া কর।"

সাহিত্যিক মূল্য ইখনাটনের স্তোত্রগুলির যে কত বেশি, রচনা পড়লেই তা বোঝা যায়। খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দে সাহিত্যক্ষেত্রে নবযুগ দেখা দিয়েছিল মিশরে। ইখনাটনের নব-সাহিত্য পুরানো বন্ধনগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে আবেগপূর্ণ চঞ্চল বাস্তবতার সৃষ্টি করেছিল। ফলে, লিখিত ভাষার সনাতনী রূপ বদলে গিয়ে,

কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়েছিল। স্মৃতি-মন্দিরের লিখনগুলিও কথ্য ভাষায় লেখা হয়েছে,—এমন অনাচার আগেকার দিনে পুরোহিতরা নিশ্চয়ই বরদাস্ত করতেন না। যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত সাহিত্যের নদী, অকাতরে তা-ই সৃজন করে চলেছে ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, কথা ও কাহিনী, চির-পুরাতন সাহিত্যিক ভাষায়। সেই সনাতন ভাষার রূপ পরিশেষে এমন পরিবর্তিত হয়েছিল যে, প্রাচীন ভাষার অনুবাদ করতে হয়েছে ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে। মিশরে অতি প্রাচীন কাল থেকে ধারাবাহিক রচনা শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান সমাজনীতি রাজনীতি, অর্থাৎ সমগ্র সংস্কৃতির ওপরই প্রচুর আলোকপাত করেছে। প্রাচীনকালের রাজারা তাদের রাজত্বকালের বিশেষ ঘটনাগুলিকে সুসম্বদ্ধভাবেই প্রাচীরগাত্রে খোদাই করে বা লিখে গিয়েছেন। সাম্রাজ্যযুগের নৃপতিরা যখন যুদ্ধে বা অভিযানে বেরুতেন, তাদের সঙ্গে থাকতো লেখকের দল (scribes) যুদ্ধের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এই লেখকবৃন্দ। ইতিপূর্বে টেল-এল-আমরনায় প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক পত্রাবলীর কথা বলা হয়েছে। রাজনীতির অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে এই পত্রগুলিতে।

পুরোহিতের পরের সম্মানের স্থান অধিকার করতো পেশাদারী লেখক। আর কলমধারী লেখক যে-পরিমাণ জনগণের শ্রদ্ধা লাভ করতো, সামরিক বৃত্তির প্রতি অশ্রদ্ধাও ছিল তাদের সেই পরিমাণ। মিশরে রেমিসাইড্‌দের আমলের লেখক-কুল অনেকটা চীনা পণ্ডিত বা ম্যাণ্ডারিন (**mandarine**)-দের মতই হয়ে পড়েছিল—ঠিক তেমনি ছিল তাদের সম্মান প্রতিপত্তি। এই সময়ের লেখকেরা শুধু নকল করতেই অভ্যস্ত ছিল, মৌলিক রচনা বেশি করে নি। কিন্তু তাদের সেই নকলগুলি থেকেই প্রাচীনকালের অনেক ধর্ম-সাহিত্য-কাব্যে, কথা ও কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে।

সাহিত্যের রূপান্তর ঘটেছে যেমন যুগে যুগে, সমাজ-নীতির বিবর্তনও তেমনি দেখা যায়। পিরামিড যুগে যে অপরিসীম উদ্যম উৎসাহ জেগে উঠেছিল, সেই কর্মযোগ জাতিকে আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল করেছিল বটে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বোধও (**individualism**) প্রকাশ পেয়েছিল সেই সঙ্গে। এই বোধ বা অভিমান মানুষের দৃষ্টিকে ব্যক্তিমুখী করে তোলে, কাজের মূল্য নির্ধারণ করা হয় তখন ব্যক্তিস্বার্থের দিকে চেয়ে, আর এ-রকম দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক গণতন্ত্র থেকে স্বভাবতই জাতিকে রাখে দূরে সরিয়ে। সেই কারণে ইতিহাসের আদিযুগে

ব্যাবিলোনিয়ায় যে গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো খাড়া হয়েছিল, তেমনি কোন গণতন্ত্রের সাক্ষাৎ মিশরে পাওয়া যায় না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলে মিশর দেশটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত—কিন্তু তা যে হয় নি তার কারণ, ফারাওরা ছিলেন দেবতা, তাঁদের দেবত্বই মিশরের বিভিন্ন অংশকে অচ্ছেদ্য সূত্রে গেঁথে রেখেছিল। মিশরীরা ঐক্যবদ্ধ ছিল সার্বজনীন ধর্ম বিশ্বাসের বলে।

মিশরীদের কাছে, জীবনের লক্ষ্য ছিল ইহলোকে সাফল্য অর্জন আর পরলোকে ইহ জীবনের সুখ-সম্ভোগের সম্প্রসারণ। ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিল তারা, দুটি লক্ষ্যের কোনটির জন্যই দেবতার মুখ চেয়ে থাকতো না। জীবন ছিল হাসিখুশিতে ভরা, জীবনকে উপভোগ করতে বেশ ভালই জানতো তারা। 'টা-হটেপে'র কালের একটি লোক-নীতির গ্রন্থ ((Book of etiquette) রয়েছে। মনোহর মিষ্টি কথা বলে কিরূপে সুবিধা আদায় করা যায় লোকের কাছ থেকে, সে-বিষয়ে বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া হয়েছে বইখানিতে। আর এই হিতোপদেশের অপলাপ করলেই বা কি ক্ষতি হয় তাও বলা হয়েছে। উপদেশের মর্ম এইরূপ: "আবেগ উচ্ছ্বাসকে পরিহার করে প্রশাসন ও সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে কথায় ও কাজে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়াই শালীনতা-পরায়ণ মানুষের কর্তব্য। রাজপুরুষরূপে সেই ব্যক্তির পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ভাল-মন্দ নিয়ে কোন নীতির প্রশ্ন ওঠে না এখানে। বরঞ্চ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পরিচয়—অর্থাৎ চালাক চতুর মানুষের প্রকৃতি কি আর মূঢ়ের স্বভাবই বা কেমন ধারা তাই নিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। ছিমছাম চতুর ভাব (smartness) শিক্ষার দ্বারা লাভ করতে পারা যায়…সুতরাং মানুষের জীবন যাত্রার নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সে যেন সকল রকম অবস্থায় সুচতুরভাবে কাজগুলি নিয়ন্ত্রিত করে জীবনকে সার্থক করতে পারে।" বইখানিতে রয়েছে উচ্চ, নীচ ও সমান শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হয়, সে-সম্বন্ধে উপদেশ। কয়েকটি হিতোপদেশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া যাক এখানে। যেমন,—'নিজের চেয়ে ভাল বক্তার যুক্তি-তর্কের প্রতিবাদ করতে নেই', 'প্রভুর সঙ্গে আহারে বসে কোন জিনিস চাইতে নেই, তিনি যখন হাসেন তখনই হাসতে হয়, তাহলেই অধীনের প্রতি অনুগ্রহ করেন তিনি।' সত্য, এই সব উপদেশ বস্তুতন্ত্রের নিছক সুবিধাবাদ, কিন্তু এমনধারা সুবিধাবাদই যে মিশরীয় নীতি শাস্ত্রের শেষ কথা, তা নয়। একটি উপদেশবাক্যে সাধুতাকেই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার-নীতি বলা হয়েছে (Honesty is the best policy)।

"যদি নেতা হয়ে জনসাধারণের কার্যের পরিচালনা করতে চাও, তাহলে সর্বক্ষণ সন্ধান করবে জনহিতের সুযোগ সুবিধা, যাতে তোমার আচরণ সবরকমে ত্রুটি-শূন্য হয়। ন্যায় নিষ্ঠা (justice) মানুষের অনেক সুবিধা করে দেয়, ব্যবহারিক প্রয়োজন তার যথেষ্ট। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ন্যায়ের বিধান নিরঙ্কুশভাবে চলে এসেছে। বিধানকে অমান্য করেছে যে তাকেই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। অসৎ কর্মের দ্বারা অনেক সময় ধন লাভ হয় বটে, কিন্তু ন্যায়-নিষ্ঠা অর্থাৎ নীতি-সম্মত সৎকর্ম দৃঢ় শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে তা স্থায়ী ফল প্রসব করে। আর তখনই মানুষ বলতে পারে, এ-জিনিস ছিল আমার পিতার।" পিতৃপুরুষের সৎকর্মের ফলই মানুষের উত্তরাধিকার। অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দেয় যে, সাধু নীতির অনুসরণ করে মানুষ শ্রেয় লাভ করে থাকে। এই শ্রেয় ব্যবহারিক, ব্যক্তির জীবনে সাফল্য লাভ ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে আমেনেমহেটের একটি নীতিকথার উল্লেখ করা যেতে পারে,—"যার প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ কর, সর্বক্ষণ তার কাছে বন্ধুভাব দেখাবে।" আর একটি মিশরীয় নীতিবাক্য এই রূপ : "যে-ব্যক্তির সাহায্য লাভ করতে চাও, তার চরিত্রের খুঁটি-নাটি মনে না করাই ভাল।"

পিরামিড যুগে যেমন দেখা দিয়েছিল অপরিমিত কর্মপ্রেরণা ও নির্মাণকার্যে উদ্যম উৎসাহ, তেমনি উচ্চতর জীবনের আদর্শে নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রচেষ্টা জেগে উঠেছিল সামন্তযুগে। দুর্বলের প্রতি দয়ালু ও ন্যায়বান হবার জন্যে অনেক কথা বলা হয়েছে এ-যুগের অনুশাসনে। একটি সামন্তের সমাধিমন্দিরে প্রজার প্রতি তার ব্যবহার সম্বন্ধে বলা হয়েছে এইরূপ : "এমন কোন নাগরিক কন্যা নেই, যার সঙ্গে আমি কুব্যবহার করেছি। কোন বিধবাকে নির্যাতন করি নি। কোন প্রজাকে উৎখাত করি নি। কোন রাখালকেও উচ্ছেদ করি নি। আমার এলাকায় কোন ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত বা বুভুক্ষু ছিল না। দুর্ভিক্ষের সময় মহালের সকল ক্ষেত্রগুলি কর্ষণ করে খাদ্য শস্য বৃদ্ধির দ্বারা প্রজাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমি সমৃদ্ধ ব্যক্তিকে দরিদ্রের ওপর স্থান দেই নি কখনো।" সমাধি গুহার গায়ে লেখা আছে এমনি সব কথা।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আত্মপরায়ণ বৃত্তিগুলি 'প্রাচীন রাজ্যে'র পতনের অন্যতম কারণ। পতনের পর মধ্যম রাজ্যের প্রথম ভাগে অরাজকতার শোচনীয় দুর্দশায় মানুষের মন বিষাদে ভরে উঠেছিল, তখনই দেখা দিয়েছিল বিষাদের দর্শন-তত্ত্ব

বা নৈরাশ্যবাদ (Pessimism)। এক কালে নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, তখন অনেক মৃতদেহ কুমীরের খাদ্য হয়েছিল। আত্মহত্যা করতে উদ্যত এমন কোন ব্যক্তি তার আত্মা বা 'কা'র সঙ্গে যে-আলাপ আলোচনা করেছে, সেই কথোপকথনটি মিশরীয় সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এখানেও অপমৃত্যু থেকে নিরস্ত হবার কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আত্মা যে-উপদেশ দান করেছে তাতে সাধু-জীবনের কোন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বা নৈতিক মূল্যের বিষয় অবতারণা করা হয় নি, শুধু দুঃখ-কষ্ট ভুলে ইন্দ্রিয়সুখের উপভোগকেই শ্রেয়রূপে খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু ভোগের আদর্শ নৈরাশ্যবাদের কণ্ঠরোধ করতে পারে নি। প্রশ্ন ওঠে, ভোগ-সুখের সন্ধান কি সুনামের হানি করে না? অখ্যাতির কলঙ্ক কালিমা যদি সুনামকে ঢেকে দেয় তবে বেঁচে লাভ কি? তারপর পদ্যের তিনটি পদে সমাজের নৈতিক অধঃপতনের বর্ণনা করা হয়েছে :

কারে বলি আজ ?
লোক জন সব মন্দ
বন্ধুরা বাসে না ভালো।

কারে বলি আজ ?
নম্র যে জন সে-ই মরে,
হিংস্র মানুষের সবার কাছে আনাগোনা;

কারে বলি আজ ?
অতীতের শিক্ষা মনে নেই কারো,
প্রতি-উপকার কেউ করে না আজ উপকার পেয়ে।

জীবনের দুর্ভোগ থেকে মুক্তিলাভ করা যায় মৃত্যুকে বরণ করে। তাই মৃত্যুকে আর্তের পরম আশ্রয় বলে কল্পনা করা হয়েছে।

মৃত্যু আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে,
রোগ-মুক্তির মত,
বদ্ধ দরজার বাইরে আরামের মত।

মৃত্যু আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে,
ফুরফুরে হাওয়ায় ছায়াতলে বিশ্রামের মত।

মৃত্যু আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে,
মানুষ যেমন দেখতে চায় আবার তার গৃহটিরে।
বহুবর্ষ বন্দী-জীবনের পর।

মৃত্যু অন্তিম নয়, জীবনের পূর্ণ পরিণতি। মৃত্যুলোকেই মানুষ মন্দকে পরাভূত করে যখন সে দেবতার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। সে তখন জীবন্ত দেবতা হয়ে দুষ্কৃতিকারীকে দণ্ড দেয়।

খৃঃ পূঃ ২২০০ অব্দের একটি পাথর লিডেন মিউজিয়ামে রাখা আছে, তাতেও নৈরাশ্যবাদ সম্বন্ধে একটি কবিতা খোদাই করা রয়েছে :

আমি শুনেছি ইমহটেপের বাণী হারড়ডেফের কথা…
দেখ চেয়ে তাদের বাসস্থানগুলি,
দেয়াল ধ্বসে পড়েছে,
বাড়ি নেই, যেন ছিল না কোন দিন।
ফিরে আসে না কেউ সেথান (পরলোক) থেকে—
কেউ বলে না, কেমন আছে তারা (মৃত ব্যক্তিরা)।…
হৃদয় যেন ভুলে যায় (হৃদয়ের দুঃখ গ্লানি)
সুখকর হয় যেন কামনার পিছে ধাওয়া
বেঁচে আছ যত কাল।
মাথায় পর গন্ধ লতা
অঙ্গে ধর বেশভূষা……

আনন্দ বর্ধন কর
হৃদয় যেন শীর্ণ না হয়—
মিটাও প্রাণের আকাঙ্খা, শ্রেয় তাই,
ভোগলিপ্সা চরিতার্থ কর
হৃদয়ের অভিরুচি মত,

যত দিন বিলাপ না আর্তনাদ করে ওঠে
যে-বিলাপ মৃতের স্তব্ধ অন্তর শোনে না কখনো।

জীবনের নশ্বরতার কথা চিন্তা করেই কামনার অনুসরণ ও ইন্দ্রিয়সুখের উপভোগকে পরম শ্রেয় বলে মনে করা হয়, আবার সেই নশ্বরতার চিন্তাই মানুষকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করে তোলে। চার্বাক-নীতি ও সংসার-বৈরাগ্য উভয়বিধ মনোভাবের সৃষ্টি হয় নৈরাশ্যবাদের দর্শন থেকে। নৈরাশ্যবাদ একটি পরাজয়-মনোবৃত্তি বিশেষ। গ্রীসের জাতীয় অবনতি ও অপমানের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে পরাজয়ের মনোভাব সেখানেও দেখা দিয়েছিল, এবং সেই থেকে 'স্টোইকদের নৈরাশ্যবাদ (Stoicism) ও এপিকিউরাসের চার্বাক-নীতির (Epicureanism) উদ্ভব হয়েছিল। মিশরেও তেমনি এই যে চার্বাক-দর্শনের আবির্ভাব তারও মূল কারণ হয়ত বা জাতীয় অধঃপতন, হিকসোসদের আক্রমণ ও পরাধীনতা। অল্পকালের জন্য এই দর্শনের চলন হয়েছিল, এবং তাও কখনও সর্বজনীন হয় নি। অধিকাংশ লোকই দেবদেবীর আরাধনা, ইহকাল পরকালের চিন্তা চিরাগত প্রথা মতই করে যেত এবং কখনো সন্দেহ করতো না যে ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী—যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ—আর ইহলোকের দুঃখ কষ্ট গ্লানি পরলোকে অনন্ত সুখ শান্তিভোগের মূল্য স্বরূপ। মধ্যম রাজ্যের সময়ের একটি বাণী এইরূপ: "মন্দ কর না, কদাচারী হও না, দয়াশীলতাই পরম শ্রেয়। প্রেম ও অনুরাগ দিয়ে তুমি যেন তোমার স্মৃতিকে (লোকের মনে) চিরস্থায়ী করতে পার। তখন দেবতার প্রশস্তিই হবে তোমার পুরস্কার।" আজ একটি ছত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে দেবতারা অর্ঘ্য নৈবেদ্যের চেয়ে উপাসকের চরিত্রের মহত্ত্বকেই বেশি পছন্দ করেন। "দুষ্কৃতিকারীর বৃষ বলিদানের চেয়েও অধিকতর গ্রহণীয় ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রবান ব্যক্তির আরাধনা।"* চারিত্রিক মহত্ত্বের আদর্শকে এমনি উঁচু করে তুলে ধরে দরিদ্রের পক্ষে দেবানুগ্রহ লাভের পথ নূতন করে খুলে দেওয়া হয়েছে, সেটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়।

*পরবর্তীকালে ইসরাইলে এই কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন ঈশ্বরের বাণীরূপে বাইবেলের প্রফেট আমোস: "যজ্ঞানুষ্ঠান করলেও, বলিদান দিলেও, আমি তোমাদের অর্ঘ্য নৈবেদ্য গ্রহণ করবো না। শ্রেয়ের সন্ধান কর, মন্দের নয়। নির্ঝরের মত প্রবাহিত হোক ঋত সত্যের ধারা।" (Amos 5)

অকাতরে অর্থ ব্যয় করেও ধনী পারে না দেবতার অনুগ্রহ লাভ করতে, আর সেই জিনিসটি গরীব মানুষ চরিত্রবলে সহজেই পেতে পারে। অভ্যাস ও চেষ্টার দ্বারা চরিত্রবল অর্জন করতে পারে সকলেই। চরিত্রবলকে পরম শ্রেয়রূপে ধরে নিলে, সৃষ্টিকর্তা যে সকল মানুষকেই সমান করে সৃষ্টি করেছেন, সে-কথাটি বুঝতে বিলম্ব হয় না। মিশরীয় নীতিধর্মে মানুষের এই সাম্যভাবটি বাদ যায় নি। কথাটা সৃষ্টিকর্তার মুখ দিয়ে বের করা হয়েছে এইভাবে : "চারিদিকে বায়ুর সৃষ্টি করেছি আমি, সব মানুষ যেন সমানভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে।...প্লাবন জলের সৃষ্টি করেছি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে—সকলেই যেন সমভাবে জলের অধিকারী হয়।...প্রত্যেকটি মানুষকে একে অন্যের সমান করে সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের মন্দ কাজ করতে আদেশ দেই নি, কিন্তু তাদের অন্তর আমার কথা অমান্য করেছে "...রাজা দেবতা, পুরোহিত ধর্মগুরু, অভিজাতবর্গ শাসক সম্প্রদায়, আর সকলেই এরা শোষণ করেছেন শ্রমিক ও কৃষকদের—এই ত মিশরের সমাজ। সেই সমাজে যখন সাম্যবাদের আদর্শ লোক সমক্ষে ধরা হয়, যেমন এই মন্ত্রটিতে—"সকল মানুষই সমান, সৃষ্টিকর্তা তাদের পৃথক (অর্থাৎ বড় ছোট) করে তৈরী করেন নি"—তখন সেই আদর্শের কথাটা কি ক্রুর পরিহাসের মত শোনায় না ? তবে এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, এমনি সব ক্রুর পরিহাস নিয়েই মানব সভ্যতার ইতিহাস রচিত হয়েছে—তাই এ-বিষয়ে কেবল মিশরকেই দোষী করা চলে না।

মিশরীয় পরিভাষার 'মা-আট' শব্দটির সঙ্গে আমাদের পূর্বেই পরিচয় ঘটেছে। শব্দটির অর্থ, সমতা ঋজুতা, ঔচিত্য—এই ভাব থেকেই যোগরূঢ় অর্থ দাঁড়িয়েছে, ঋত সত্য ন্যায়নিষ্ঠা। মধ্যম রাজত্বের সময়ে সামাজিক দায়িত্ব-জ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে সত্যকে আশ্রয় করে পরস্পরের প্রতি আচরণে যে ন্যায়-নিষ্ঠার (social justice) প্রয়োজন, 'মা-আট'-এর সেই বিশেষ গুণধর্মের ওপরই জোর দিয়েছিল মিশরীরা। তখনকার একটি কৃষকের কাহিনীতে আসল বক্তব্য ছিল এই যে, রাজপুরুষদের কাছ থেকে সুবিচার লাভ করবার দাবী প্রজার একটি নৈতিক অধিকার। বিবেকবুদ্ধির নির্দেশমত ন্যায়সঙ্গত কাজ করাই সামাজিক দায়িত্বের ন্যূনতম বিধান। "বঞ্চনা ন্যায়নিষ্ঠাকে খর্ব করে। কুনকে ভর্তি করে মাপই ন্যায়বিচার—বেশিও দিতে নেই, কমও নয় (filling to good measure neither too low nor overflowing—is

justice)।" পুরাকালে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের মূল্যকে সমাজের উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, মধ্যমযুগেই সেই মূল্যের ভারকেন্দ্রের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল সামাজিক বিবেকবুদ্ধির জাগৃতির সঙ্গে। কিন্তু বিবেকের জাগরণ সত্ত্বেও, ঐহিক সুখভোগ, যা ছিল জীবনের চিরন্তন লক্ষ্য, সেই ব্যবহারিক শ্রেয়ের স্থানটি কোন মহত্তর আদর্শ তখনও অধিকার করে নি, দেবতার কাছে আত্মসমর্পণের ভাবও দেখা দেয় নি।

জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের প্রয়োজন বোধ যেমন হিকসোসদের আক্রমণ কালে জেগে উঠেছিল, এমনটি পূর্বে কখনো হয় নি। বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রস্থল মিশর, মিশরীরাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি,—এই আত্মশ্লাঘার মূলে কুঠারাঘাত পড়লো, হিকসোসরা যখন মিশর দখল করেছিল। অবশ্য সমগ্র মিশর ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। জাতি তখন সচেতন, দেশাত্ম-বোধও জন্মেছিল, আর সেই সঙ্গে হিটাইট প্রভৃতি বিদেশী জাতির অভ্যুত্থান মিশরের নব-সাম্রাজ্যকে বিপন্নও করেছিল। এমন অবস্থায় দেশ জয় করে অধীন জাতিদের ওপর নিজেদের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়াই যে মিশরের 'ভাগ্যের সুস্পষ্ট লিখন' ('**manifest destiny**') এরূপ স্পর্ধা জেগে ওঠা বিচিত্র নয়। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন যা-ই হোক না কেন, ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদই যে সাম্রাজ্যকে রূপায়িত করেছে, সাম্রাজ্যের সার্থকতাও ধর্মেরই ক্ষেত্রে, এই ভাবটিকে আঁকড়ে ধরে' মিশর ভৌমিক সম্প্রসারণে মনোযোগী হয়েছিল। ফলে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিত্বের প্রাধান্যকে বর্জন করে পুরো-পুরিভাবেই সাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছিল। সমষ্টির স্বার্থরক্ষার কর্মেই ব্যক্তির কল্যাণ, সমাজের ইষ্টসিদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ ব্যক্তির প্রধান কর্তব্য, এই নূতন আদর্শ মিশরীয় দৃষ্টিতে সমাজের একটি নূতন মূল্য নির্ধারিত করেছিল। মূল্যের গুরুত্ব ব্যক্তি থেকে সমষ্টির ওপর যেমন ঝুঁকে পড়লো, অমনি শ্রেয়ের আদর্শও বদলে গিয়েছিল। ইন্দ্রিয় সুখের উপভোগ যা ছিল এতদিন পরম শ্রেয়, তার জায়গায় পরলোক চিন্তার আবির্ভাব হয়েছিল। মিশরের আদিকালের সঙ্গে পরবর্তী সাম্রাজ্যযুগের চিত্রাবলীর তুলনা করলে নৈতিক আদর্শের এই পরিবর্তন বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। প্রাচীনকালের চিত্রে ক্ষেত, খামার, বাজার, দোকান প্রভৃতি দৃশ্য আঁকা রয়েছে। পরবর্তী কালের স্মৃতিমন্দিরে যে-সব ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠানের (**rituals**) বিষয় চিত্রার্পিত করা হয়েছে, সেগুলি এই ইঙ্গিতই করে যে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে তখন পরলোকের দিকে।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন একটি আকস্মিক ব্যাপার নয়। বহু শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে চিন্তাধারার বিবর্তন ঘটেছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-সব নীতি-সন্দর্ভ আমাদের গোচরে এসেছে আদিযুগ থেকে সাম্রাজ্যযুগ পর্যন্ত, তার পূর্বাপর বিবেচনা করে বাইরে থেকে বিশেষ কোন প্রভেদ নজরে পড়ে না। লৌকিক ব্যবহার, ব্যক্তির জীবনে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ পিরামিড যুগে ও মধ্যম রাজ্যকালে যেমন দেওয়া হত, সে শিক্ষার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি সাম্রাজ্য যুগে। লৌকিক আচরণের যে-সব কারণ দেখানো হয়েছে প্রাচীনকালে, সেই কারণগুলির পরিবর্তন করে নূতন ব্যাখ্যা দেওয়াই ছিল সাম্রাজ্যযুগের বিশেষত্ব। যেমন, আদিকালে স্ত্রীকে যত্ন করবার বিধান দেওয়া হয়েছিল এইজন্য যে, "সে তার প্রভুর সুবিধার ক্ষেত্র বিশেষ" (**she is a field of advantage to her master**)। সাম্রাজ্যযুগে স্ত্রীকে আর সেই চোখে দেখা হয় না—তাই বলা হয়েছে, কত স্নেহ মমতা নিয়ে কত ধৈর্য ধরে মাতা সন্তানের লালন পালন করেন, সেই মাতৃঋণের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত। রাজপুরুষকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দরিদ্রের প্রতি সুবিচার করতে, এখন কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধু বিচারের মানদণ্ড ধারণ নয়, সক্রিয়ভাবেই তার হিতসাধন করতে বলা হয়েছে। "যদি দেখ যে দরিদ্র ব্যক্তি ঋণজালে জড়িত হয়ে পড়েছে তাহলে সেই ঋণকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দু'ভাগকে বাতিল করবে আর একভাগ মাত্র রেখে দেবে।" এরকম কাজ কেন করবে? না, তাহলে তুমি বিবেকের দংশন থেকে অব্যাহতি পাবে। "সুখে নিদ্রা যাবে তুমি। প্রভাতে প্রফুল্লমনে জেগে উঠবে, মনে হবে যেন কোন সুসংবাদ পেয়েছ। লোকের প্রশংসা ও ভালবাসা লাভ ভাণ্ডারে সঞ্চিত ধনরত্নের চেয়ে বেশিমূল্যবান। ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ ভারাক্রান্ত চিত্তে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়া অপেক্ষা সুখী অন্তর নিয়ে এক টুকরো রুটি ভক্ষণও শ্রেয়।" বেশ বোঝা যায় যে, আগের মত ব্যক্তির মর্যাদা ও সমৃদ্ধিই একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু নয়, নীতিধর্মের আদর্শ হয়েছে এখন সমাজ জীবনে ব্যক্তির সদাচার। ব্যক্তি এখন আর শুধু নিজের জন্যই বেঁচে নেই, সে সমাজেরও সম্পদ বিশেষ।

সাম্রাজ্য-যুগে নীতিধর্মের উন্মেষ লোক-চরিত্রের আর একটি আদর্শের সন্ধান দিয়েছে, যে-আদর্শ প্রকৃতই মহান। এই নৈতিক আদর্শকে 'তুষ্ণীভাব' বাক্যটির মধ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। তুষ্ণীভাব বা মৌনতার অর্থ এখানে,—শান্ত অনুদ্বিগ্ন

অনাসক্ত ভাব, বিনয়, নম্রতা, আত্মসমর্পণ। এ-কথা অবশ্য বলা যেতে পারে যে, মৌনীভাবকে অনেকক্ষেত্রেই দুর্বলতা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দেওয়া হয়েছে—যেমন, আমনকে বলা হয়েছে 'মৌনীর রক্ষক দরিদ্রের উদ্ধারকর্তা'। কিন্তু মৌনব্রত শুধু দরিদ্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। একজন প্রতিপত্তিশালী রাজপুরুষও নিজেকে 'প্রকৃত মৌনী' বলে বর্ণনা করেছেন। আমনদেবের পুরোহিতও বলেছেন, তিনি যথার্থ মৌনব্রতী। এ-কথাও বলা হয় যে, 'মৌনী-ব্যক্তিই দেবতার প্রিয়'। ফলকথা, মৌনীর যে শান্ত সমাহিত নিরাসক্তভাব চরিত্রের আদর্শ হয়ে উঠেছিল মিশরে, সেই ভাবকেই ব্যক্ত করা যেতে পারে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করে :

যস্মাৎ ন উদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ যুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষঃ শুচি দক্ষঃ উদাসীনো গত ব্যথঃ
সর্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স চ মে প্রিয়।
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্খতি
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ।
তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ।

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাহার দ্বারা লোক সকল উদ্বিগ্ন হয় না, এবং লোকের দ্বারাও যে ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হয় না, এবং যে হর্ষ-দ্বেষ-ভয়-উদ্বেগ শূন্য, সে ব্যক্তি আমার প্রিয়। ফল কামনাশূন্য, পবিত্র, কর্মপটু, উদাসীন, ক্লেশ পরিশূন্য সর্বপ্রকার সকাম-কর্মত্যাগী এবং মদ্ভক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি হৃষ্টও হয় না, দ্বেষও করে না, শোকও করে না কামনাও করে না, শুভ ও অশুভ উভয় বিষয়ে উদাসীন এবং ভক্তিমান্ সে ব্যক্তি আমার প্রিয়। নিন্দা ও প্রশংসায় অনবহিত, মৌনী, সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, ভক্তিমান, গৃহ-মায়া শূন্য ব্যক্তি আমার প্রিয়।··· গীতার অননুকরণীয় ভাষায় মৌনব্রতীর এই যে লক্ষণগুলি প্রকাশ করা হল, মিশরে তেমন কোন দার্শনিক বর্ণনাভঙ্গির চলন ছিল না বলেই বোধ করি 'তুষ্ণীম্ভাব'কে বোঝানো হয়েছে একটি বিরুদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যা করে। তুষ্ণীম্ভাবের বিরুদ্ধ গুণ 'গলাবাজি' (loud of voice)। গলাবাজির দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে : "ব্যসনাসক্ত আবেগ-আকুল মানুষ মুক্ত প্রান্তরের বৃক্ষের মত। অকস্মাৎ

ঝরে পড়ে তার পত্র, অন্তিমশয্যা তার জাহাজ নির্মাণের 'কারখানা'য় অথবা তাকে কেটে অন্যত্র নিয়ে খণ্ড খণ্ড করা হয়। কিন্তু সত্যকার মৌনব্রত নিজেকে রাখে পৃথক করে। সে যেন উদ্যানের ফলবান বনস্পতি—বৃদ্ধি পায়, দাঁড়িয়ে থাকে তার প্রভুর সামনে, সুমিষ্ট ফল ও ছায়া দান করে। অন্তিম অবস্থা প্রাপ্ত হয় সে সেই বাগানের মধ্যেই।" ফলবান বৃক্ষের মত মৌনীর আত্মসমর্পণের মধ্যে ভক্তিযোগের তত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। "ভক্তিপূর্ণ-চিত্তে দেবতার আরাধনা কর (মৌনী হয়ে)। স্তব-স্তুতির বাক্যগুলি যেন গোপনই থাকে। তা হলেই দেবতা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।" আবার মৌনতাকে জ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। "জ্ঞানের পথ তার কাছে বন্ধ যার মুখটি থাকে খোলা।" মৌনীর কাছে জ্ঞানের পথ মুক্ত (It is open to him who is silent)।" কথাটি মূল্যবান সন্দেহ নেই। মানবজাতির ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে যে, সংসারের কল-কোলাহল থেকে সরে এসে নির্জনে চিন্তার দ্বারাই মানুষের পক্ষে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়েছে।

দেবতার কাছে আত্মসমর্পণের বিধান যেমন দেখা দিল, ব্যক্তির আর কোন প্রাধান্যই রইলো না। দেবতার ইচ্ছাই সর্বেসর্বা, মানুষ দুর্বল শক্তিহীন। "মানুষ যে সাফল্য অর্জন করে তার কৃতিত্ব দেবতার, কিন্তু বিফলতার কারণ মানুষের নিজের দুষ্কৃতি।" এই মিশরীয় বাক্যটির প্রকারভেদ পরবর্তীকালের একটি প্রসিদ্ধ ল্যাটিন প্রবচনে পাওয়া যায়, **Homo proponsuit sed Deus disponit (Man proposes but God disposes)** অর্থাৎ মানুষ প্রস্তাব করে আর কার্য হয় ঈশ্বরের নির্দেশ মত। একদিন মিশরে প্রাকৃতিক নিয়মের কাঠামোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব জেগেছিল, যার জন্য অসাধ্য-সাধনও সম্ভব হয়েছিল—সেই মনোবৃত্তির তিরোধানের সঙ্গে মানুষ রইলো শুধু দেবতার মুখাপেক্ষী হয়ে এই মনে করে যে দেবতার বিধান মত কার্য না করলে অকৃতার্থতা অনিবার্য। এমনি করে আত্ম-শক্তির ওপর বিশ্বাসের স্থলে অপরিজ্ঞাত ঐশী শক্তির প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হল অদৃষ্টবাদ। দেবতা মানুষের ব্যক্তিত্বের বাইরে থেকে অদৃশ্যভাবে তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাই বলা হয়েছে একটি বাক্যে : "ঐশ্বর্যের পিছে ধাওয়া বৃথা, যেহেতু অদৃষ্ট ও ভাগ্য উপেক্ষনীয় নয়। বাইরে বস্তুর ওপর মনোনিবেশ কর না যেহেতু প্রত্যেক মানুষেরই কাল পূর্বাহ্ণে নির্ধারিত রয়েছে।"

মানুষের ইষ্টলাভ ঘটে দেবতার কল্যাণে, কিন্তু অনিষ্টের মূল কারণ নিজের দুষ্কৃতি—এই ধারণা থেকেই জন্মে পাপের চেতনা। অবশ্য পাপের স্বরূপ কি তা কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয় নি। পাপ কি শুধু নৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতি, না ধর্মের আনুষ্ঠানিক ভ্রম প্রমাদকেও পাপকর্ম বলে ধরা হবে? এই প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত জবাব মিশরীয় নীতিধর্মে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কতিপয় আত্ম-ধিক্কার থেকে বেশ বোঝা যায় যে, নৈতিক ত্রুটির ওপর বিলক্ষণ জোর দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তি, সম্ভবত রোগাক্রান্ত হয়েই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের স্বীকারোক্তি করে বলেছে, "সত্যের দেবতা 'টা' (Ptah) আমাকে শাস্তি দিয়ে উচিত কাজই করেছেন।" কর্মে অকর্মে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পাপের অনুষ্ঠান, সজারুর কাঁটার মতই পাপ যেন বিঁধছে সংসার-ক্ষেত্রের প্রতিপদে, তার ওপর আছে দুঃখ কষ্ট গ্লানি। জীবনের এই সব দুর্বিসহ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে মিশরে সাম্রাজ্যযুগের সন্ন্যাস-ধর্মে, পরলোকে অনন্তশান্তির আশ্বাসপূর্ণ দৈব-বাণীর মধ্যে (apocalyptic promise)। কিন্তু পরলোক—সে ত অনেক দূর, ইহলোকে শান্তির ব্যবস্থা করা যায় কিরূপে? তাই আত্মগ্লানি ও আত্ম-নিগ্রহের সঙ্গে দেখা দিয়েছে আর একটি বিশেষ অনুভূতি—দেবতার সান্নিধ্যের ও দয়ার অনুভূতি। করুণাময় দেবতা আছেন খুবই কাছাকাছি স্থানে। এক হাতে অপকর্মের কঠোর শাস্তি দেন তিনি, অপর হস্তে করুণা-বারি সিঞ্চনে মর্মক্ষত ধৌত করেন। অন্তর মধ্যে দেব-দেবীর আবির্ভাবের কথা, করুণা বিতরণের কাহিনী এ-যুগের অনেক লেখনে পাওয়া যায়। যেমন,—"কেঁদে উঠলাম আমি দেবীর উদ্দেশ্যে। তার পর দেখলাম, তিনি এসেছেন তার অভয় রূপ নিয়ে। মুক্ত হস্তে দয়া করলেন তিনি আমাকে। করুণাভরা দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, ব্যাধির জর্জরতাকে দিলেন ভুলিয়ে। তার পানে চেয়ে আর্তের আর মৃত্যুভয় থাকে না।"

সাম্রাজ্যযুগের শেষভাগে এই যে আত্ম-শুদ্ধির চেতনা, দেবতার সঙ্গে মানুষের নিবিড় জীবন্ত সম্বন্ধের এই যে সূত্রপাত, সেই ভক্তিযোগই উদ্যোগী পুরুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থান অধিকার করেছিল, তেমনি সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যক্তির অপরিহার্য আত্ম-নিয়োগের গ্লানিকেও লঘু করে দিয়েছিল। ভক্তিযোগের এই যুগটির নাম দিয়েছেন ব্রেস্টেড্, "ব্যক্তির ধর্মাচরণের যুগ" (Age of Personal Piety)। ভক্তের হৃদয়ে আছে প্রেম ও বিশ্বাস আর দেবতার হাতে রয়েছে ন্যায় ও করুণা।

এখানে স্পষ্টই দেখতে পাই আমরা জীবনের একটি নীতিগত পরিবর্তন, যাকে বিপ্লবও বলা চলে। আদর্শ জীবন এখন আর ব্যক্তিত্বের চর্চা নয়। জীবনের আদর্শ,—ব্যক্তিত্বকে দেবতার পদে বিসর্জন, ইহকালে করুণা ও পরকালে সুখ-শান্তি লাভের আশায়। কিন্তু ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন জীবনের আনন্দকে বিসর্জনেরই নামান্তর, এই বোধটি জাগতেও বেশি দেরী হয় নি। আত্ম-শক্তির ওপর নির্ভর করে মহিমার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল মিশর সুদূর অতীতে, সে-যুগের সেই গৌরবময় স্মৃতি মুছে যায় নি তখনো মিশরীর মন থেকে, বরঞ্চ তা-ই নানাবিধ প্রাচীন অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণে (archaism) প্রকাশিত হয়েছিল। একদিকে পুরুষকার বা আত্মশক্তির জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত, অপর পক্ষে দেব বা দেবানুগ্রহের ওপর নির্ভরশীলতার ধর্মীয় অনুশাসন—এই দোটানা থেকে মুক্তিলাভ করে নি মিশর, ব্যষ্টি ও সমষ্টির দাবী নিয়ে কোন সামঞ্জস্যও করতে পারে নি। এ-বিষয়ে হিব্রু চিন্তা কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জগৎ আজ পর্যন্ত সেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায়ই পড়ে আছে। পাশ্চাত্য দর্শনে এই দ্বন্দ্বটি প্রকাশ পেয়েছে Free Will and Determinism-এর মধ্য দিয়ে।

এরূপ কথা ওঠা বিচিত্র নয় যে, আধুনিক সূক্ষ্মদৃষ্টির বিচারে দর্শননীতি ও বিশ্বচেতনার বিকাশ তেমন দেখা যায় না মিশরের চিন্তায়, যেমন সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনার পরিচয় পাই আমরা হিব্রু ধর্মগ্রন্থে, ভারতীয় ও গ্রীক দর্শন-চিন্তায় এবং চীনা বাস্তব নীতির মধ্যে। এমন কথাও বলা যেতে পারে যে, মিশরের সংস্কৃতির তিন সহস্র বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘকাল ও স্মৃতি-স্তূপগুলির বিরাট আকারের তুলনায় চিন্তাজগতে অবদানের পরিমাণ সামান্য, এবং সভ্যতার দ্বার-দেশে পদার্পণের সঙ্গে যে অসামান্য প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল মিশরে, তার অগ্রগতি বেশি দূর পর্যন্ত চলে নি। এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ প্রাচীন মিশরের প্রতি অবিচার করা ছাড়া আর কিছু নয়,—কেন না, যে-হিব্রুদের ধর্মতত্ত্বের ও গ্রীকদের সংস্কৃতির প্রশংসায় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পঞ্চমুখ, সেই হিব্রু ও গ্রীকদের ওপর মিশরীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল এমনই অসামান্য যে মিশরীদের প্রভূত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয় ("all the wisdom of the Egyptians") গ্রীকরা সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের সহিত উল্লেখ করতো। ইহুদী ও খৃস্টধর্মের অনেক উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে মিশরের ভগ্নস্তূপ থেকে, ধর্মতত্ত্বের পদে পদে তা উপলব্ধি করা যায়। শিল্প বিজ্ঞানেও মিশরের কাছে গ্রীসের ঋণ অপরিমেয়।

৫

বিজ্ঞান-চর্চা

মিশরে বিদ্যার চর্চা করতেন পুরোহিতশ্রেণীর লোক। জীবনের কল কোলাহলের অন্তরালে মন্দিরের নিভৃত কোণে বসে জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা বিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করেছিলেন তাঁরা। মিশরীরা বিশ্বাস করতো, জ্ঞান বিজ্ঞানের দেবতা থৎ (Thoth) তিন সহস্র বছর রাজত্ব করেছিলেন, এবং সেই সময় মানুষকে তিনি বিদ্যাশিক্ষা দিয়েছিলেন। এই দেবতার রাজত্বকাল না কি খৃঃ পূঃ ১৮০০০ অব্দে আর তখন না কি তিনি চব্বিশ হাজার গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এ-সব প্রবাদ বাক্য, মূলে সত্য তেমন না থাকারই কথা। কিন্তু মিশরে বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কোন তথ্যই জানা নেই।

বস্তুত ইতিহাসের প্রদোষেই গণিত-বিদ্যার উৎকর্ষ দেখা যায় মিশরে পিরামিড নির্মাণের কাজে। গণিতের বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এমন আশ্চর্যরূপে নিখুঁত কোন বিরাট নির্মাণ কার্য সম্ভব হয় না। বৃহৎ পিরামিডের প্রত্যেকটি পার্শ্বদেশ ২৫৪ গজ দীর্ঘ। একটি পার্শ্বের সঙ্গে আব একটি পার্শ্বের দৈর্ঘেব তুলনায় ব্যতিক্রম এক ইঞ্চির ২/৩ অংশেরও কম। কোণগুলির মাপে ক্রটির পরিমাণ ১/২৭০০০ ইঞ্চি। পঞ্চাশ টন ওজনের পাথরগুলি ১/১০০ ইঞ্চি ঢালু করে খাড়া বসানো, ১/৫০ ইঞ্চ পুরু মশলা দিয়ে জোড়া। পূর্ব মুখ (Orientation) যেন কম্পাস ধরে মিল করেই নির্ধাবিত কবা হয়েছে। উষার অব্যবহিত পূর্বক্ষণে 'সিরিয়াস' (Sirius) নক্ষত্র যখন উদিত হয় এবং তখন আকাশের যে-স্থানটি অধিকার করে, পিরামিডের লম্বা গ্যালারীর অক্ষটি ঠিক সেই দিকে ফেরানো ('The axis of the long gallery was directed at the Dog Star at its heliacal rising')। জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান যে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল সভ্যতার সেই অদিযুগে, তা এই থেকেই বোঝা যায়।

মিশরে অঙ্ক লিখনের ধারা ছিল এইরূপ: একটি দাগ বোঝায় ১, দুই দাগে ২, তিন দাগে ৩, এমনি করে নয় দাগে ৯, তারপর দশের একটি নূতন চিহ্ন। দুইটি দশের চিহ্ন দিলে বোঝায় ২০, তিনটিতে ৩০, এমনি করে নয়টি চিহ্নে

৯০, তারপর শ'-এর একটি নূতন চিহ্ন। দুটি শ'-এর চিহ্নে ২০০, তিনটি শ'-এর চিহ্ন ৩০০ ইত্যাদি। আবার হাজারের একটি নূতন চিহ্ন, তারপর লক্ষের চিহ্ন। দশ লক্ষের চিহ্ন, একটি মানুষ শিরে করাঘাত করছে, সংখ্যার বিশালত্ব দেখে স্তম্ভিত হয়েই যেন। মিশরীরা দশমিক (decimal system) ব্যবহার করে নি, শূন্য (zero) সংখ্যাটিও তখন দেখা দেয় নি। ১, ২, ৩ প্রভৃতি পৃথক পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করে দশটি অক্ষর চিহ্নে সমুদয় সংখ্যাকে ব্যক্ত করবার প্রণালী জানা ছিল না তখন। ৯৯৯ লিখতে সাতাশটি চিহ্ন ব্যবহার করতে হত। অবশ্য অঙ্কে ভগ্নাংশ ছিল, তবে প্রত্যেক ভগ্নাংশের উপরের অঙ্কটি ছিল এক—যেমন $\frac{৩}{৪}$ না লিখে লেখা হত $\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}$। মিশরের যে প্রাচীনতম গণিত পুস্তক আবিষ্কৃত হয়েছে তার নাম, 'আহামেস প্যাপিরাস' (Ahmes Papyrus), রচনা কাল খৃঃ পূঃ ২০০০-১৭০০—কিন্তু গ্রন্থখানিতে পাঁচ শো বছর পূর্বের রচনার উল্লেখ দেখা যায়।

পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন সম্বন্ধে মিশরীদের জ্ঞান কিরূপ ছিল তা আমরা জানি না। জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাবিলোনিয়া মিশর অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয়েছিল। একটি যন্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে যা দিয়ে মিশরীরা জ্যোতির্মণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতো। যন্ত্রটি দেখতে একটি মাছ-ধরা ছিপের মত, হাতলে একটি ছিদ্র, আর ডগায় সুতোর সঙ্গে একখণ্ড শিসা বাঁধা। সুকৌশলে যন্ত্রটিকে বসাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে সূত্ররেখাটি ধ্রুবতারার সঙ্গে মিশে গেছে দেখা যায়। এমনি করে উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্ধারিত করে নিয়ে আকাশে অন্যান্য নক্ষত্রের স্থান নির্ণয় সম্ভব হত। গ্রহ নক্ষত্র পরিবীক্ষণের ফল লিপিবদ্ধ করে রাখবারও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ভূগোল ও পাটিগণিতের যেমন অনেক বিষয় নষ্ট হয়ে গেছে, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও অনেক লেখার সেই দশাই ঘটেছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মিশরে ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা হত। প্রকৃতপক্ষে একটি বছরে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন থাকে, কাজেই গণনায় প্রতি বছরে $\frac{১}{৪}$ দিন ঘাটতি পড়ে। ঘড়ির কাঁটা নিয়মিতভাবে এগিয়ে বা পিছিয়ে চলতে থাকলে কোন একটি সময় বিশেষ ঠিক ঘণ্টা ও মিনিটের জায়গায় এসে উপস্থিত হয়। যেমন, কোন ঘড়ি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট স্লো চলতে থাকলে, ১২ ঘণ্টায় ১ ঘণ্টা স্লো, ২৪ ঘণ্টায় ২ ঘণ্টা স্লো—এমনি করে ৬ দিনে কাঁটা পূর্বস্থানে ফিরে আসে। তেমনি মিশরে বৎসর গণনায় এক-চতুর্থাংশ দিনের ঘাটতি ১৪৬০ বছরে পূরণ হয়ে বৎসরটি আবার ঠিক জায়গায় ফিরে আসতো। বৎসরে $\frac{১}{৪}$ দিনের

ব্যতিক্রমের ফল ছিল এই যে, পূজা পার্বণ অনুষ্ঠানের কাল বসন্ত গ্রীষ্ম শরৎ ও শীত ঋতুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আবার বসন্তে গিয়ে পৌছোতো ১৪৬০ বৎসর পরে। এই কালচক্রটির মিসরীয় নাম, 'সোথিক চক্র' (Sothic Cycle)। কালচক্রটির প্রারম্ভ ধরা হয়, উষার পূর্বক্ষণে সিরিয়াস নক্ষত্রের অভির্ভাব থেকে (heliacal rising of the Sirius)। এরূপ আবির্ভাব হয়েছিল ১৩৮ খৃস্টাব্দে, খৃঃ পূঃ ১৩২২ অব্দে, খৃঃ পূঃ ২৭৮২ অব্দে—মিশরীয় জ্যোতিবিদেরা এ-কথা বেশ জানিতেন। আরও পূর্বে খৃঃ পূঃ ৪২৪১ অব্দের অবির্ভাব। সেই বছর থেকেই মিশরীয় পঞ্জিকার গণনা আরম্ভ হয়েছিল, এরূপ মতবাদও প্রচলিত আছে, তবে সেটি বিতর্কের বিষয়।* বৎসর গণনায় এই যে ¼ দিনের ত্রুটি, মিশরীরা এই ভ্রম কখনও সংশোধন করে নি। বহু বৎসর পরে খৃঃ পূঃ ৪৬ অব্দে রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সিজারের নির্দেশ মত আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিদেরা গণনা পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেছিলেন, চার বছর পর একটি অতিরিক্ত দিন যোগ করে। এই নূতন পঞ্জিকার নাম 'জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার (Julian Calender)। তারপর ১৫৪২ খৃস্টাব্দে পোপ গ্রিগারী (Pope Gregory XIII) আরও নিখুঁত গণনা পদ্ধতির নির্দেশ দিলেন, যে-সব বছর ৪০০ সংখ্যা দিয়ে বিভক্ত নয়, সেই বছরগুলি থেকে অতিরিক্ত দিনটি (২৯ শে ফ্রেব্রুয়ারি) বাদ দেবার বিধান করে। এই গ্রিগারীয় পঞ্জিকাই (Gregorian Caiender) আধুনিক জগতে প্রচলিত।

গ্রীক বিজ্ঞানের পূর্বে জীবন-তত্ত্ব বা biology বিষয়ে কোন আলোচনা দেখা যায় না মিশরে, কিন্তু চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার বিদ্যার আবির্ভাব হয়েছিল অতি প্রাচীনকালে। ইতিহাসের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সেখানে দেখা যায়, চিকিৎসা-ক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন ব্যবস্থার যুগপৎ প্রয়োগ—একটি ব্যবস্থা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার, অপরটি ঔষধ প্রয়োগ করে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা। মন্ত্রতন্ত্র মনের ওপর ক্রিয়া করে, আর ঔষধের ক্রিয়া শরীরের ওপর। এই দুই ভিন্নরকম ব্যবস্থার প্রভেদ সম্বন্ধে মিশরীয় চেতনা যে সজাগ হয়েছিল তা মনে হয় না। ব্যবস্থা দুটি ছিল এমনই জট-পাকানো অবস্থায় যে সে-জট ছাড়িয়ে একটিকে আর একটি থেকে

---

* বর্ষপঞ্জী দ্রষ্টব্য। সেখানে পঞ্জিকার এই গণনা অনুসারে মিশরীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠার কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

আলাদা করা যায় না। ব্যবস্থা নিয়ে এমনধারা তালগোল পাকানোর কারণ এই যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল ইন্দ্রজাল (magic) থেকে এবং সেই ইন্দ্রজালে বিশ্বাস মিশরীরা কোনদিন পরিত্যাগ করে নি। প্রত্যেকটি ব্যাধির উৎপত্তির কারণ, 'ভূতে পাওয়া'—তাই ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে শরীর থেকে ভূতকে নামানো দরকার। সর্দির ভূতকে নামাবার মন্ত্র এইরূপ : "পালা রে সর্দি, সর্দির পো সর্দি। হাড় গুঁড়িয়ে দিস তুই, মাথার খুলি দিস ভেঙে। মাথার সাতটি দরজা দিয়ে ঢুকে ব্যাধির সৃষ্টি করিস। দূর হ অধঃপাতে যা"…এমনি ধারা ঝাড়ফুঁক হয়ত ওষধির সমান কাজ করতো রোগীর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই ব্যাবিলোনিয়ার মত মিশরেও যে কবিরাজের বড়ির চেয়ে ঐন্দ্রজালিক তাবিজ তুক-তাক মন্ত্রতন্ত্র ছিল অধিকতর জনপ্রিয়, এতে বিস্ময়ের কারণ নেই। একদিকে যেমন দেখা যায় এইসব কুসংস্কার, অন্যদিকে তেমনি আবার সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, অস্ত্রোপচারক ও বিশেষজ্ঞেরও অভাব ছিল না। তাঁরাই করেছিলেন প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন। তাঁরাই ছিলেন গ্রীসের চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক হিপোক্রাটিসের (Hippocrates) পথ-প্রদর্শক। বিশেষজ্ঞেরও আবির্ভাব হয়েছিল তাদের মধ্যে—কেউ বা ধাত্রী-বিদ্যা ও জরায়ুর ব্যাধির, কেউ বা পরিপাক যন্ত্রের রোগের, কেউ বা চোখের ব্যারামের। এদের খ্যাতি দেশ বিদেশে এমনি বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে পারস্য সম্রাট কুরুস বা সাইরাস তাদের একজনকে পারস্যে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ, অস্ত্রোপচার বিষয়ক প্যাপিরাস, আবিষ্কারক এড্উইন স্মিথের নামে পরিচিত (Edwin Smith Surgical Papyrus)। আবিষ্কৃত গ্রন্থ ৩৬০০ বছর পূর্বে লেখা, কিন্তু সেটি খৃঃ পূঃ ৩০০০-২৫০০ অব্দে লিখিত একটি প্রাচীন পুঁথির প্রতিলিপি। কে জানে, হয়ত বা এই গ্রন্থ 'থাক-কাটা পিরামিড' নির্মাতা ইমহটেপের রচিত, যে-ইমহটেপ ছিলেন একাধারে উজির বৈদ্য ও স্থপতি এবং যিনি পরবর্তীকালের মিশরের ইতিহাসে দেবতার আসনলাভ করেছিলেন। অতি প্রাচীনকালেও মিশরীয় সমাজে বৈদ্যের স্থান ছিল খুবই উর্ধ্বে। রাজবৈদ্যের নাম ছিল 'উদরের চিকিৎসক' (Physician of the Belly), 'গুহ্যদ্বারের অভিভাবক' (Guardian of the Anus)। গ্রন্থকারের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ, তিনি অস্ত্রোপচার বিদ্যায় পারদর্শী। বিদ্যালব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করতেন তিনি, মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি ইন্দ্রজালের ওপর

নয়। প্যাপিরাসে লিখিত অস্ত্রোপচারের বিষয়টি অসম্পূর্ণ, শুধু মাথা ঘাড় ও বুকে অস্ত্রপ্রয়োগের কথাই বলা হয়েছে—মূল গ্রন্থে মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গের বিষয় লিখিত ছিল। ভাঙা হাড় কাষ্ঠখণ্ড (splint) দিয়ে বেঁধে কিরূপে চিকিৎসা করতে হয়, মচ্‌কানো হাড়ই বা সোজা করা যায় কেমন করে, ক্ষতস্থান সেলাই করার পদ্ধতি—গ্রন্থকার এ সব বিষয় ভালই বুঝতেন। তা ছাড়া, তার আর একটি শক্তি ছিল, সেটি ভবিষ্যদ্বাণী করবার শক্তি। অর্থাৎ, রোগী আরাম হবে কি না উপসর্গ দেখে তাও তিনি বলে দিতে পারতেন। শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল এই যে, চিকিৎসা যেন করা হয় এমন ব্যক্তির যার রোগ আরোগ্য হবে বলেই মনে হয়। আর যার ব্যাধি দুরারোগ্য তাকে সরাসরি বলতে হবে, "আমি এ-রোগের চিকিৎসা করবো না।" এই উপদেশ মত কাজ করলে 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্য সহস্র মারী চিকিৎসক' হবার যো নেই।

আর একতাড়া কাগজ পাওয়া গেছে ৬৬ ফুট লম্বা, সেটির নাম 'এবার্স প্যাপিরাস' (Ebers Papyrus)—সম্ভবত খৃঃ পূঃ ১৫৫০ অব্দের রচনা। পুরোপুরিভাবেই রোগের চিকিৎসা বিষয়ক, কিন্তু কি রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, কি ঔষধ পত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা কোনটিতেই গবেষণার কৃতিত্ব তেমন দেখতে পাওয়া যায় না, যেমন দেখা যায় অস্ত্রোপচারের গ্রন্থে। অবশ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে সাত শো রকম ব্যারামের—সর্পাঘাত থেকে সূতিকার জ্বর পর্যন্ত। সে-ও আবার এমন সব ব্যবস্থা যা দেখে আমাদের দেশের প্রবাদ বাক্যটি মনে পড়ে,—"যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।" টিকটিকির রক্ত, শুয়োরের কান ও দাঁত, পচা মাংস ও চর্বি, প্রসূতির দুধ, মানুষ গাধা কুকুর বিড়াল সিংহ প্রভৃতির বিষ্ঠা—এমনি সব ঘৃণাকারজনক ঔষধ প্রয়োগ রোগের পক্ষে যত না হোক, 'ভূত তাড়ানো'র আদর্শ ব্যবস্থা সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-কথাও ঠিক নয় যে, চিকিৎসা ব্যবস্থার সবটাই ছিল ইন্দ্রজাল বা ঐ জাতীয় পদার্থ। নানা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছিল যা প্রকৃতই রোগের উপশম করে, এবং তার কতকগুলি ঔষধ, যেমন 'ক্যাস্টর অয়েল' আমরা এখনও ব্যবহার করে থাকি। আবার কতকগুলি ঔষধ ছিল একেবারেই বাজে—তেমন বাজে ঔষধের চলন ত আজও আছে। মিশরীদের অনেক ব্যবস্থা গ্রীক ও রোমানরা গ্রহণ করেছিল, আর আধুনিক জগৎ সেগুলিকে পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে।

মৃতদেহকে মামিতে পরিণত করবার সময় ব্যবচ্ছেদ দ্বারা শরীর-যন্ত্রের বিষয়

জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটেছিল মিশরীদের, কিন্তু সুযোগের তুলনায় জ্ঞান তাদের তেমন জন্মে নি। নাড়ী প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাদের। হৃদয় ও উদরকেই মনে করতো তারা মনের আবাসস্থল। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, তারা ঐ দুটি শব্দ এমন অর্থে ব্যবহার করেছিল যে অর্থের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। শরীরে রক্ত চলাচল ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল হৃদ্‌পিণ্ড, এবং সেখান থেকে মাথায় কপালে হাতে পায়ে রক্ত সঞ্চালিত হয় নাড়ীর মধ্য দিয়ে, এই কথাটির উল্লেখ 'এবার্স প্যাপিরাসে' আছে। হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার এই বর্ণনা থেকে আর এক ধাপ উঠলেই হার্টলের (Hartley) আবিষ্কৃত রক্তচলাচল (circulation of the blood) তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছানো যায়। কিন্তু এই ধাপটি উঠতে লেগেছিল তিনটি হাজার বছর!

স্বাস্থ্য রক্ষার যে সব উপায় অবলম্বন করতো মিশরীরা তার মধ্যে ছিল সুন্নৎ (circumcision) এবং পিচকারীর ব্যবহারে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা। জন-স্বাস্থ্যের প্রতি তাদের লক্ষ্য ছিল কিরূপ সে-কথার উল্লেখ করে হিরোডোটাস বলেছেন, "লিবিয়ানদের পরেই পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান মানুষ মিশরীরা।"

৬

শিল্প-সৃষ্টি

কেউ যদি বলেন, মিশরের ইতিহাস প্রধানত শিল্পেরই কাহিনী, যে-শিল্প ধর্মকে কেন্দ্র করে, পরলোককে জড়িয়ে ধরে প্রস্তরসৌধ, প্রস্তরমূর্তি, কারুকর্ম ও চিত্রাবলীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তাহলে তার সেই বর্ণনা অসত্য হবে না। হিকসোসদের আক্রমণের পূর্বে যুদ্ধবিগ্রহ মিশরে দেখা দেয় নি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পৃথক অবস্থান শিল্প চর্চায় আত্মনিয়োগ করবার প্রচুর সুযোগ দিয়েছিল মিশরীদের। ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকেই এমন উন্নত ধরনের শিল্প-সৃষ্টি দেখতে পাই আমরা সেখানে, যার বিরাটত্ব শৈলী ও সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তারপর সাম্রাজ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ফলে যখন ধনরত্ন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো, তখন আবার সৃষ্টিকার্যে নূতন উদ্যম দেখা দিয়েছিল, প্রাচীনকালের বিরাট সৌধ ও বিশাল মূর্তি নির্মাণ পর্বের পুনরভিনয় আরম্ভ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অন্যদেশে প্রগতিকে যেমন ধাপের পর ধাপ বেয়ে উঠতে দেখা যায়, মিশরে তেমনটি ঘটে নি। অকস্মাৎ বিরাট নির্মাণ কার্যগুলির মুখো-মুখী দাঁড়িয়ে প্রগতি যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে।

প্রাচীন শিল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদ্যা। আকারের সৌষ্ঠবে ও দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের প্রভাবে এই শিল্পের রূপসৃষ্টি স্বভাবত চিত্তাকর্ষক। তা ছাড়া স্থপতির নির্মাণকার্যের ব্যবহারিক মূল্যও আছে। প্রাচীন রাজ্যে এই শিল্প কিরূপে পিরামিড-গুলিকে গড়ে তুলেছিল তার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। খাফরুর 'স্ফিন্‌কসে'র সংলগ্ন যে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল তার হলের দেয়ালে ছাদের নীচে তেরছা ধরনের কাটা জানালা (**clerestroy windows**) রয়েছে, তেমনি তেরছা জানলার ব্যবস্থা পরবর্তীকালে গ্রীস ও রোমের সৌধ নির্মাণ কার্যে দেখা দিয়েছিল। পরিশেষে এই স্থাপত্য পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছিল খৃস্টানদের গীর্জায় 'ব্যাসিলিকা' নামক হলের মূল অংশটিতে (**the nave of the Christian basilica Church**)। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপে খৃস্টানদের 'ক্যাথিড্রেল'

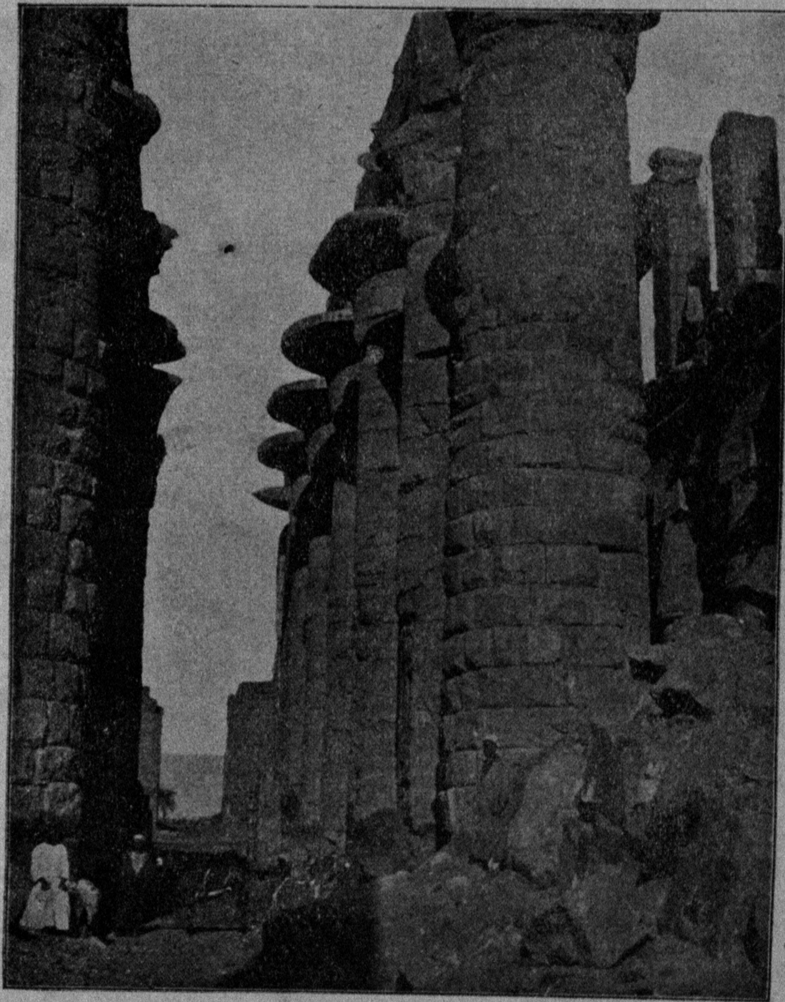
বা গীর্জাগুলির পরিকল্পনা ৩৫০০ বছর আগেকার ফারাও খাফরুর সেই হলের আদর্শেই রচনা করা হয়েছিল।

পিরামিড যুগের আদর্শ কিন্তু মিশরে স্থায়ী হয় নি। এক শতাব্দীর মধ্যেই মিশরীদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও সৌষ্ঠববোধ হলের বড় বড় চৌকা থামের পরিবর্তে সুদৃশ্য, লঘু, গোল স্তম্ভ এবং তার ওপর চূড়া (capital) নির্মাণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। এরূপ গোল থামের শ্রেণী মিশরে খৃঃ পূঃ ২৮শ শতাব্দী থেকে নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্বে কখনও এই ধরনের থাম পৃথিবীর কোথাও তৈরি হয় নি। সামন্তযুগে মন্দির নির্মাণ করা হত পাথর দিয়ে নয়, পাহাড় কেটে, যেমন দেখা যায় আমাদের দেশের অজন্তা ইলোরা প্রভৃতি স্থানে। জগতে গুহা-শিল্পের প্রারম্ভ সামন্তযুগের মিশরে। তখন পিরামিড তৈরি না করে অভিজাতবর্গ পাহাড় কেটে গুহা সমাধিমন্দির (cliff tombs) নির্মাণ করতেন, এবং সেখানেই শবাধারে তাদের মামিকে রাখা হত। মধ্যম রাজ্যের দ্বাদশ বংশীয় নৃপতিদের সময় বেনি-হাসান নামক স্থানে 'আমেনির সমাধি' (Tomb of Ameni) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে সমাধি-কক্ষ। গোলাকৃতি থামগুলির সৌন্দর্য অতুলনীয়। হাওয়ারার মন্দিরে একটি গোলক-ধাঁধা (Labyrinth of Hawara) আছে সেটি তৈরী করেছিলেন তৃতীয় আমেন-এম-হেট। গোলক ধাঁধার করিডরটি নানা রকম পাথর দিয়ে গাঁথা ছিল, নির্মাণ কৌশল এমনই চমৎকার যে তাই দেখে অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস।

সাম্রাজ্যযুগের কীর্তির অবশেষগুলির অধিকাংশই রয়েছে রাজধানী থিবিস নগরে ও তারই নিকটবর্তী কারনাক ও লাকসার নামক স্থানে। কায়রো থেকে ৪০০ মাইল দক্ষিণে নীল নদীর তীরে থিবিসের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়—বিস্তৃত গোরস্থানের বিরাট মন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ। গিজের দিগন্তপ্রসারী গোরস্থানে আমরা পেয়েছি পিরামিডযুগের মানুষের জীবনযাত্রা, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয়, তেমনি সাম্রাজ্যকালের সকল তথ্যই সংগ্রহ করতে হয় থিবিস, কারনাক, লাকসার ও আমরনা থেকে। কীর্তি-সৌধগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান কারনাকের ভুবনবিখ্যাত বিশাল মন্দির। মন্দিরের খিড়কি দরজা থেকে নদীতীরে সদর দেয়াল পর্যন্ত $\frac{1}{4}$ মাইল। মন্দিরের এই বিস্তৃতি দুই হাজার বছর ধরে প্রসারের ফল—প্রাচীনতম অংশ মধ্যম রাজ্যে রাজাদের আমলে তৈরি, আর সর্বশেষ

নির্মাণ কার্য হয়েছিল গ্রীক রাজা টোলেমিদের (Ptolemy) কালে। মন্দিরের মধ্যস্থলে রানী হাটসেপস্থটের ওবেলিস্ক (Obelisk) স্তম্ভ। পূর্বে এখানে রানীর আরও একটি ওবেলিস্ক ছিল। তারপর দেখা যায়, স্তম্ভযুক্ত বিরাট হলঘর, যার নাম 'কারনাকের হাইপোস্টাইল হল' (Hypostyle Hall of Karnak)। এই হলের নির্মাণকার্য স্থরু হয় প্রথম সেটির আমলে এবং তা শেষ করেন দ্বিতীয় রেমেসিস। প্রাচীর গাত্রে সাম্রাজ্য কালের বড় বড যুদ্ধের দৃশ্য খোদাই করা হয়েছে (bas-reliefs)। সারি সারি গোলাকৃতি বিরাট স্তম্ভ, প্রত্যেকটির উপরিভাগের চূড়াদেশে (capital) একশো জন লোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সমুখের প্রকাণ্ড প্রাচীর থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত দুই সারি 'মেষে'র বা স্ফিংকসের এভিনিউ' (Avenue of Rams or Sphinxes)। এই 'মেষের এভিনিউ'র বাঁ দিকে ছিল একটি পবিত্র হ্রদ। এখন সেটি একটি এঁদো পুকুরে পরিণত হয়েছে। নদীর পশ্চিম প্রান্তস্থিত পর্বত-সমাধিগুলিতে সাম্রাজ্যযুগের রাজা ও অভিজাতকুলের ব্যক্তিরা শায়িত রয়েছেন।

স্তম্ভযুক্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ লাকসার, দের-এল-বাহেরিতে রানী হাটসেপস্থটের বিশাল স্তম্ভ-শ্রেণী (Colonnades) ছাড়াও রয়েছে 'রামেসিয়াম'। 'রামেসিয়াম' দ্বিতীয় রেমেসিস নির্মাণ করেছিলেন তাঁর স্থপতি ও ক্রীতদাসদের সাহায্যে। বিরাট আকৃতির প্রস্তরমূর্তি (colossal statues) ও স্থবিশাল স্তম্ভশ্রেণীর একটি অরণ্যভূমি বললেও হয় রামেসিয়ামকে। সারি সারি মূর্তি, সবগুলিই রেমেসিসের। ইখনাটনের রাজধানী আমরনা—প্রাচীন নাম 'আখেটেটন'—খনন করে রাজপ্রসাদ ও গৃহ-প্রাচীরের নিম্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। একজন ভাস্করের কর্মশালাও উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে পাওয়া গেছে ভাস্কর্যের অনেকগুলি স্থন্দর নমুনা, যা সে-যুগের শিল্প বিষয়ে জ্ঞানকে গভীরতর করেছে। নগরের পিছন দিকে পাহাড়ের শ্রেণী, সেখানে ইখনাটনের অনুগত ব্যক্তিদের সমাধি। স্মরণ থাকতে পারে, পুরোহিতদের পীঠস্থান থিবিস নগর ছেড়ে দিয়ে আমরনায় রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন ইখনাটন এবং তাঁর মৃত্যুর পর রাজধানী আবার যেমন থিবিসে স্থানান্তরিত হল, অমরনাও সেই সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পাহাড়ের সমাধি মন্দিরগুলির গাত্রে সেই বিস্তৃত শহরটির জীবনযাত্রার দৃশ্যগুলি অতি স্থন্দরভাবে খোদাই করা রয়েছে—আর আছে সেখানে ইখনাটনের অবিস্মরণীয় স্তোত্রগুলি দেয়ালের গায়ে উৎকীর্ণ।



হাইপোস্টাইল হল (কারনাক)



দ্বিতীয় রেমেসিস
(কৃষ্ণ গ্রানাইট্ প্রস্তর)—টুরিন মিউজিয়াম

মিশরের স্থাপত্য যেমন অতুলনীয়, ভাস্কর্যও তেমনি উচ্চাঙ্গের। ইতিহাসের প্রবেশ দ্বারে সর্বপ্রথম চোখে পড়ে সেই বিরাট 'স্ফিন্‌কস্‌', মুখটি তার রাজা খাফরুর আর দেহটি সিংহের, রাজার অমিত শক্তির পরিব্যঞ্জক। মেমেলুকদের কামানের গোলায় নাকের ডগাটি ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও—সেই মূর্তিটিতে যে-শক্তি ও গাম্ভীর্য পরিস্ফুট, যে-স্থৈর্য ও স্বপ্রতিষ্ঠা বিরাজমান, এবং সর্বোপরি যে-সূক্ষ্ম অব্যক্ত হাসির রেখা রহস্যের একটি যবনিকা টেনে দিয়েছে মুখের ওপর—তাই দেখে অনেক মনীষী মনে করেন, ওটি শুধু একটা পাথরে-গড়া প্রতিমূর্তি মাত্র নয়, ওর মধ্যে একটি গোপন রহস্যের আভাস ফুটে উঠেছে, 'যে-রহস্যের সাড়া পাওয়া যায় সর্বত্র, কিন্তু পূর্ণ বিকাশ হয় নি কোথাও' (**"It seeks to give expression to a secret hinted at everywhere but nowhere fully manifested"—Edward Caird**)। এমনি রহস্যের আভাস দিয়েছেন ইতালীয় শিল্পী লিওনার্ডো-দা-ভিন্‌সি তাঁর বিখ্যাত ছবি 'মোনা লিসা'য়। স্ফিন-ক্সকে মোনা লিসার প্রস্তর সংস্করণ বলা যেতে পারে।

কায়েরো মিউজিয়মে খাফরুর একটি প্রস্তর মূর্তি আছে, পিছন দিকে স্কন্ধের ওপর বসে বাজপক্ষীরূপী হোরাস পক্ষপুট দিয়ে তাঁকে রক্ষা করছেন। ভাস্কর্যের এমন নিপুণ সৃষ্টি সত্যই বিরল। প্রায় পাঁচ হাজার বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু কালের কোন চিহ্নই পড়ে নি এই মূর্তিটির ওপর। সে-যুগের প্রধান শিল্পীরাই ছিলেন মূর্তি নির্মাতা। মূর্তি তৈরী হত পাথর বা কাষ্ঠ দিয়ে, তারপর রং করা হত। চোখ দুটিতে বসানো স্বচ্ছ স্ফটিক যেন জীবনের রশ্মি ঠিকরে বের করে। ভাস্কর্যের ইতিহাস তখন সবে সুরু হয়েছে, কিন্তু সেই অল্প কালের মধ্যে এমন জীবন্ত মূর্তি-সব তৈরী করা হয়েছিল যার তুলনা কোন যুগেই বড় একটা পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি মূর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে—একটি পাথরের তৈরি, অপরটি দারুমূর্তি। প্রস্তরমূর্তিটি একজন লেখকের (scribe)—লুভার মিউজিয়মের রক্ষিত। লিপিকার আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন, নগ্ন দেহে, কোলের ওপর প্যাপিরাস রেখে কলম দিয়ে লিখতে উদ্যত, আর একটি অতিরিক্ত কলম রয়েছে কানে গোঁজা। দেখলেই মনে হয়, লোকটি বিশেষ পরিশ্রমী, হিসাব নিকাশ না কি একটা রচনা নিয়ে খুবই চিন্তা করছেন। কাষ্ঠমূর্তিটি কায়রো মিউজিয়মে রয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে,—'সেখ-এল-বেলেদ' অর্থাৎ গ্রামের প্রধান। আসলে, সে প্রধান নয়, মজুরদের পর্যবেক্ষক।

পরিপুষ্ট দেহ, হাতে দীর্ঘ যষ্টি, প্রভুত্বের নিদর্শন। বুর্জিয়া শ্রেণীর মানুষের মতই স্থূল কটিদেশ, হাসি-হাসি ফুলো-ফুলো মুখ—যেন নিজের পদ-মর্যাদা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। মাথায় টাক, কটিবাস অবিন্যস্তভাবে জড়ানো। সেই আদিযুগে, উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদেরও পরিধেয় ছিল কটিবাস, উর্ধভাগ নগ্নই থাকতো, পদদ্বয় পাদুকা-বিহীন। কাষ্ঠ-নির্মিত হলেও সৌভাগ্যক্রমে মূর্তিটির সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ বজায় আছে। কী নিপুণ হস্তেই না সেই সরল মানবতার সৌষ্ঠব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মাসপেরো বলেন,—"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পের যদি কোনো প্রদর্শনী খোলা হয় তবে মিশরীয় শিল্পের সম্মান রক্ষার জন্য আমি এই মূর্তিটিকে প্রতিনিধিরূপে স্থান দেব সেখানে" (If some exhibition of the world's masterpieces were to be inaugurated I should choose this work to uphold the honour of Egyptian Art.)

প্রাচীন রাজ্যের সময় প্রস্তর ও দারুমূর্তি ছাড়াও দেখা যায় পেটা-তামার বৃহৎ আকারের শিল্প-সৃষ্টি, বিশেষত মূর্তি নির্মাণ। ১৮৯৬ সালে হায়েরোকন-পলিশের ভগ্ন-স্তূপ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক কুইবেল প্রথম পেপি ও তার পুত্রের যে-দুটি তাম্র-মূর্তি উদ্ধার করেছিলেন তারই মধ্যে সে-যুগের ধাতু-শিল্পীর অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মুখের আকৃতি ও অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, মুখে চোখে, দাঁড়াবার ভঙ্গিমায় জীবন যেন টল টল করছে। রাজার মূর্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে দীর্ঘতর, হাতে দণ্ড, শিশু মূর্তিটি দু ফুট লম্বা।

প্রাচীন রাজ্যের শিল্পী হাস্য-রস বর্জিত নয়। একটি শুঁড়ি (beerbrewer) আর বামন নেমহেটেপ-এর বিখ্যাত মূর্তি দুটিতে হাস্য রস সৃজন করা হয়েছে যথেষ্ট। এ-কথা সত্য যে প্রথম দিকটায় এ-যুগের শিল্প ছিল স্থূল ও অমার্জিত। কতিপয় নির্দিষ্ট রীতিনীতি শৈলীকে সারা যুগ ধরে বেঁধে রেখেছিল, তার নড চড বড় হয় নি। যেমন, বিভিন্ন ব্যক্তির দেহের স্বাভাবিক গঠনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে একই প্রণালী মত সকল দেহকেই এক রকম করে নির্মাণ করা, সকল নারীকে যুবতী আর সকল রাজাকে বলিষ্ঠ পুরুষ করে সৃষ্টি করা, আর মূর্তি এমনভাবে তৈরী করা যেন দেহ ও চক্ষু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে দেখা যায়। কিন্তু এত সব বাঁধা-ধরা নিয়ম সত্ত্বেও, সে-যুগের শিল্পীর শক্তি ও কল্পনার গভীরতা সূক্ষ্ম জীবন্ত রূপ-রেখায় সৃষ্টিকে বৈশিষ্ট্য দান করতে ত্রুটি করে নি। বস্তুতঃ লেখক ও সেখ মূর্তির ক্ষেত্রে রীতি-পদ্ধতির ব্যতিক্রমই দেখা গেছে। সামন্ত

যুগে কয়েক শতাব্দী ধরে ভাস্কর্যের অধোগতি চলেছিল, তার কারণ—ধর্মের রক্ষণশীল মনোভাব শিল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মূর্তির প্রয়োজন হত মন্দির ও সমাধিক্ষেত্রে যেখানে ছিল পুরোহিতের প্রাধান্য। মূর্তিকে রূপদানের রীতিনীতিগুলি পুরোহিতদের চাপে বিশেষ করে মেনে চলতে হত, শিল্পীর স্বাধীনতার অবকাশ বড় একটা ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও একাদশ বংশীয় নৃপতি নেবহটেপ-রার রাজত্বকালে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। রাজ-শিল্পী ছিলেন তখন মারটিসেন। তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখে গেছেন, "এক দক্ষ শিল্পী ছিলাম আমি। জীবন্ত রূপের ছবি আঁকতে হলে, প্রতিটি অঙ্গের প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে যে-জ্ঞানের প্রয়োজন, আমার সেই জ্ঞান আছে। পুরুষের চলে বেড়াবার সময়কার মূর্তি আর নারীর গতিভঙ্গী, উভয়ই আমার জানা ছিল। জল-হস্তী শিকারের সময় অস্ত্র-ক্ষেপনের ভঙ্গী আমি জানি। দৌড়াবার কালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমাও আমার অজানা নেই।" দ্বাদশবংশীয় পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের শাসনকালে শিল্প যেন নূতন উদ্যমে আবার জেগে উঠে পুরানো দক্ষতা কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছিল, যেমন দেখা যায় তৃতীয় আমেন-এম-হেট ও সেন্থুসার্টদের মূর্তিগুলিতে। কিন্তু হিকসোসদের আক্রমণের ফলে দেশ যেমন পরাধীন হয়েছিল, শিল্প সৃষ্টির উদ্দীপনাও তখন আর রইলো না। আর এক দফা অধঃপতন দেখা দিল সেই সঙ্গে, বস্তুতঃ শিল্প একরকম অন্তর্ধানই করেছিল।

শিল্পের দ্বিতীয় পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল অষ্টাদশ-বংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালে। রানী হাটসেপসুট, কতিপয় থাটমোস, কয়েকজন আমেনহটেপ এবং পরিশেষে ইখনাটনের আমলে শিল্প যে-উন্নতির পর্যায়ে উঠেছিল, তারই জের টেনে গিয়েছিলেন উনবিংশ বংশীয় রেমেসিসেরা। সাম্রাজ্যের নানা স্থান থেকে ধন-দৌলতের অজস্র সমাগম রাজপ্রসাদ ও দেউলগুলির সৌষ্ঠব বর্ধন আর শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব করে তুলেছিল। হাটসেপসুটের একটি সুন্দর প্রস্তর মূর্তি রয়েছে নিউইয়র্কের মিউজিয়মে। তৃতীয় থাটমোসের বিরাট প্রতিমূর্তি আর আবু সিমবেল নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে দ্বিতীয় রেমেসিসের ৭৫ ফুট উচ্চ গগনস্পর্শী প্রস্তর মূর্তিগুলি যেন খাফরুর বিখ্যাত স্ফিংক্সের সঙ্গে আড়া-আড়ি আরম্ভ করেছিল। কায়রো মিউজিয়মে তৃতীয় থাটমোসের একটি পাথরের 'বাস্ট' আছে। ভাস্কর্য যে-কতদূর উৎকর্ষ লাভ করেছিল সে-যুগের মিশরে তা বোঝা যায় এই থেকে যে, 'বাস্টে'র মুখের ছাঁদের সঙ্গে থাটমোসের মামির মুখাকৃতির অবিকল মিল রয়েছে। তৃতীয়

আমেনহটেপের একটি স্ফিংকস্ মূর্তি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। লুভার মিউজিয়মে ইখনাটনের উপবিষ্ট প্রস্তর মূর্তি অপরূপ শিল্প মাধুর্যের প্রতীক। ইখনাটনের পত্নী নেফ্রেটেটির মূর্তিগুলিও জীবন্ত সৌষ্ঠবের প্রতিচ্ছবি। ইখনাটনের কন্যার ভগ্ন প্রস্তর-মূর্তি, হাত পা মাথা নেই এমন একটি 'টরসো'র (**torso**) মধ্যে যৌবন-শ্রী যেন পুষ্প শয্যা বিছিয়ে রেখেছে। বস্তুত ইখনাটনের সময়ে পুরানো বাঁধা-ধরা রীতিগুলি বর্জন করে স্বচ্ছন্দ সাবলীল স্বভাব-ধর্মী শিল্প-শৈলীর (**Naturalism**) প্রবর্তন হয়েছিল। সেই বাস্তবতাকেই প্রতিফলিত দেখতে পাই আমরা মন্দির গাত্রে রেমেসিসের প্রিয় যুদ্ধ-দৃশ্যগুলিতে। দ্বিতীয় রেমেসিসের অর্ঘ্য দানে রত অর্ধশয়ান মূর্তিটির ভঙ্গী অতুলনীয়। টুরিনে রক্ষিত আছে আর একটি বিখ্যাত প্রস্তর মূর্তি এই নৃপতির। পরিচ্ছদ সাধারণ রকমের, কোন জাঁক-জমক নেই—রেমেসিসের যৌবনের প্রতিমূর্তি। কেবল মনুষ্য-মূর্তি নয়, পশু মূর্তি নির্মাণেও শিল্পীর দক্ষতা ও নৈপুণ্য অসাধারণ। দের-এল-বেহরির 'ভাবগ্রস্ত গাভী' মূর্তি (**meditative cow**) শিল্প সৌকর্যে গ্রীক ও রোমান শিল্পের সমকক্ষ।

এখানে ইখনাটনের কালের আমরনা-শিল্প সম্বন্ধে একটা বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। অনেকেরই ধারণা এই যে এ-সময়ে একেশ্বরবাদী নবধর্ম প্রবর্তনের ফলে এমন কোন নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যার মধ্যে শিল্প তার যুগযুগান্তের ধারা-পারম্পর্য বিসর্জন দিয়ে একটি চমৎকার অভিনবত্ব লাভ করেছিল। আপাত-দৃষ্টিতে কথাটা সত্য বলে মনে হয় বটে, কিন্তু সমীক্ষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে দেখা যায়, ইখনাটনের ধর্ম বা শিল্পের সঙ্গে মিশরের চিরাগত ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে নি। তিনি শুধু সেই ঐতিহ্যেরই একাংশের ওপর পরম গুরুত্ব আরোপ করে মিশরীয় ধর্মচিন্তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে ত্বরান্বিত করে তুলে-ছিলেন, আর সেই সঙ্গে শিল্পের ধাঁচ ও শৈলীকে প্রাচীনকালের আড়ষ্ট বন্ধন থেকে মুক্তিদান করেছিলেন। সূর্যদেবতা আটনকে তিনি পুরোহিত-তন্ত্রের অন্যান্য দেবদেবী থেকে স্বতন্ত্র করে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর মূর্ত প্রতীকরূপেই কল্পনা করেছিলেন, এমনি একেশ্বরবাদই ধর্মতত্ত্বের স্বাভাবিক পরিণতি। ঠিক তেমনি ভাবেই আত্ম-সচেতন শিল্প আগেকার মামুলি গতানুগতিক পথের অনুসরণ না করে পরিণত স্বভাব-সুন্দর কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে কেমন সৃষ্টিমুখর হয়ে উঠেছিল তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা আমরনা-শিল্পে দেখতে পাই।' ইখনাটনের তিরো-



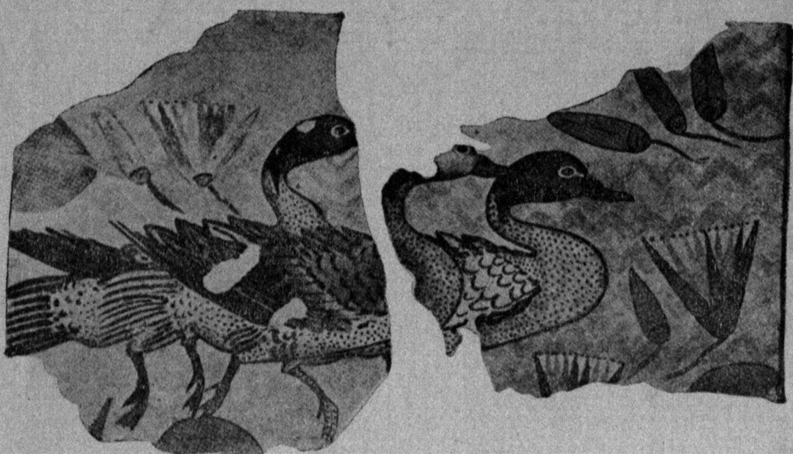
ইখনাটন দুহিতার মূর্তির ভগ্ন অংশ



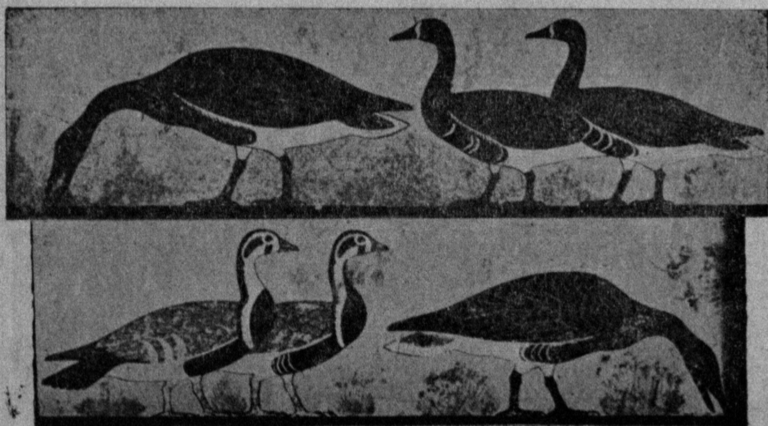
একটি অভিজাতবংশীয় পুরুষ ও স্ত্রী



স্ফিংক্স মার্গ (কারনাক)



পদ্মবনে হংসদের জলকেলী
(থিবিসে তৃতীয় আমেনহটেপের প্রাসাদের মেঝের উপর অঙ্কিত)



প্রাচীন রাজ্যের কবরে চিত্রিত হংসশ্রেণী (মেডাম্)

ধানের সঙ্গে পুরোহিতকুলের আনুকূল্যে যখন সনাতন-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল, লক্ষ্যের বিষয় এই যে, শিল্প তখন তার নবরূপ পরিত্যাগ করে প্রাচীন শৈলীর আঁট-সাঁট খাঁচার মধ্যে ফিরে আসে নি। পক্ষান্তরে শিল্প তখন স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্যে আগের মতই এগিয়ে চলেছিল, দ্বিতীয় রেমেসিসের কালের ভাস্কর্যের উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিই তার প্রমাণ।

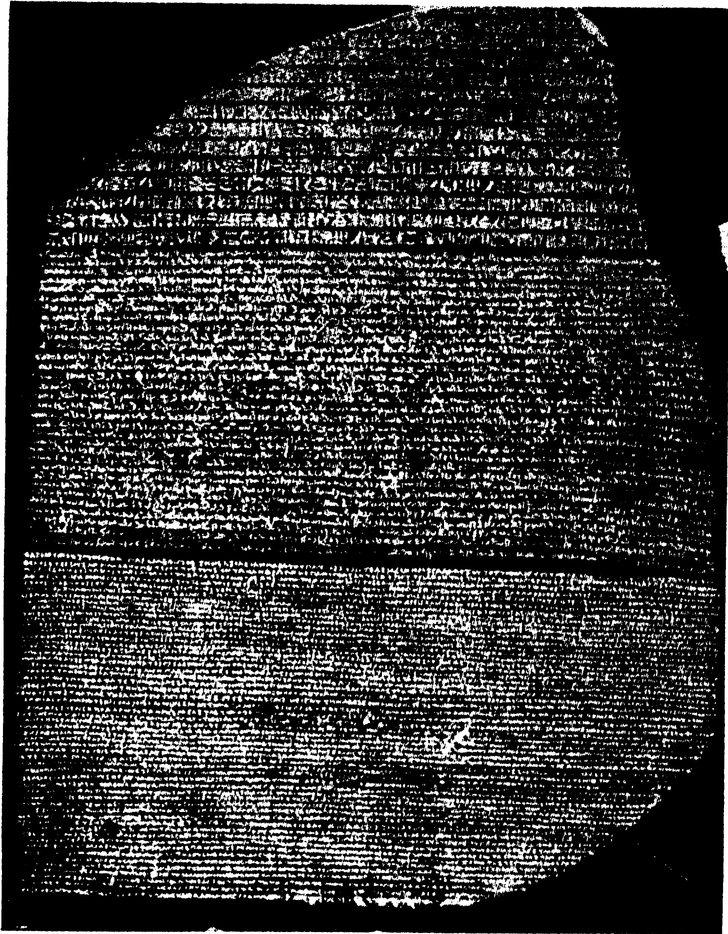
দ্বিতীয় রেমেসিসের পর থেকে শিল্প আবার গতানুগতিক পথ ধরে অধোদিকেই চলেছিল। কিন্তু মিশরীয় ইতিহাসে পূর্বে যেমন ঘটেছে, দীর্ঘকাল পরে আবার শিল্পের পুনর্জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন কালের সরল স্বভাবনিষ্ঠাকে শিল্পের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল 'সেইটি রাজা'দের (Saite Kings) আমলে কিন্তু এই প্রচেষ্টাই ছিল নির্বাণোন্মুখ দীপের শেষ দীপ্তি—কেন না এর পরেই মিশরের স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়েছিল। সে-সময়ের শিল্পের একটি নমুনা—বার্লিন মিউজিয়মে রক্ষিত মনটুমিহাইটের উপবিষ্ট প্রস্তর মূর্তি। ব্রঞ্জের মূর্তিনির্মাণ কিরূপ উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, লেডি-টিকোসেট-এর ব্রঞ্জ মূর্তিটি দেখলে তা বিলক্ষণ বোঝা যায়। শিল্প যখন এমনি করে আবার তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়লো পারসিকেরা—বাঘ যেমন পড়ে মেষপালের ওপর, এবং সমগ্র দেশটিকে দখল করে প্রভু শক্তির দাপটে সৃজনের উৎস-মুখকে দিল বন্ধ করে—আর শিল্পও সেই সঙ্গে চিরদিনের তরে পাথর চাপা পড়লো।

পাথরকে পুরোপুরি কেটে পূর্ণাঙ্গ মূর্তি (**figure in the round**) ও 'বাস্ট' (**bust**)প্রস্তুত ছাড়াও পাথর খোদাই করে নানা রকম চিত্র ফুটিয়ে তোলার কায়দাকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করেছিল মিশরীরা। এ-রকম প্রস্তর শিল্পের নাম 'বাস রিলিফ'। এই শিল্পটি খাঁটি ভাস্কর্য ও খাঁটি চিত্রাঙ্কনের মাঝামাঝি। লোহিত-সাগরে রানী হাট্‌সেপসুটের পুনট (সোমালিল্যাণ্ড) অঞ্চলে নৌ-অভিযান যা পূর্বে বলা হয়েছে, তারই প্রতিকৃতি খোদাই করা রয়েছে দের-এল-বেহরির দেয়ালের গায়ে। পাল তোলা জাহাজ দাঁড় বেয়ে চলেছে, সমুদ্রের জলে নানাবিধ জল জন্তু,—যেমন পুরুভুজ কাঁকড়া প্রভৃতি। কারনাকে 'হাইপোস্টাইল হলে'র বাইরে ১৭০ ফুট লম্বা দৃশ্যাবলী খোদাই করা রয়েছে পাথরের ওপর। তার মধ্যে একটি দৃশ্যে ফারাওকে দেখা যায় 'অশ্বযুক্ত রথে চড়ে' ধনুর্বাণ হস্তে যুদ্ধ করতে। সাম্রাজ্য-যুগের এই চিত্রটিতে অশ্বযুক্ত রথের প্রথম আবির্ভাব, যে-অশ্ব ও রথকে

মিশরদেশে এনেছিল হিকসোসরা। ঘোড়ার প্রতিমূর্তি জীবন্ত, নিপুণভাবে খোদাই করা। ছবির মতই নানাবর্ণে রঞ্জিত করা হয়েছিল এই খোদাই কার্যটিকে।

গ্রীক রাজা টোলেমিদের রাজত্বের পূর্বে মিশরীয় শিল্পে চিত্রাঙ্কনের কোন স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করা হয় নি। চিত্রাঙ্কন ছিল তখন স্থাপত্য ভাস্কর্য ও খোদাই কার্যের আনুষঙ্গিক শিল্প। প্রস্তর-শিল্পীর হাতুড়ি ও বাঁটুল যে খাঁজ রেখে যায় পাথরের ওপর, চিত্রশিল্পী তাই ভরাট করে তোলে রং দিয়ে। কিন্তু এমন ধারা পরিপূরক ও আনুষঙ্গিক শিল্প হলেও চিত্রাঙ্কন ব্যাপক ভাবেই চলেছিল সর্বত্র। মূর্তি, পাথরের খোদাই কাজ, দেউলের দেয়াল সবই চিত্রিত করা হত। চিত্রের স্থায়িত্ব কাল অল্প, তা সত্ত্বেও চিত্রিত আলেখ্যের অনেকগুলি নমুনা এখনো টিকে আছে মিশরে। 'পিরামিড যুগের শিল্প' প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রাচীন রাজ্যের নানা ছবির কথা বলা হয়েছে। তখনকার অধিকাংশ ছবি সামাজিক বা গার্হস্থ্য জীবনের দৃশ্যাবলী, যা থেকে সমাজ জীবনের অনেক বিষয় জানতে পেরেছি আমরা। মধ্যম রাজ্যের 'আমেনি-সমাধি' ও বেনি-হাসানের দেয়াল চিত্রে অনেক পশুপক্ষীর ছবি আছে, যেমন 'হরিণ ও কৃষক' 'বিড়ালের শুঁৎ পাতা'—সেগুলি গতিশীল ও জীবন্ত। আমেনির সমাধি-গাত্রে কুস্তীরত মল্লগণের একটি সমষ্টি চিত্র সত্যই উপভোগ্য। বর্ণের বিন্যাস-কৌশল ও রেখাগুলির কলা-সৌষ্ঠব এমনই বিচিত্র যে ছবিটির তুলনা করা চলে শুধু গ্রীক মৃৎপাত্রে যে-চিত্রাঙ্কন (vas-painting) দেখা যায়, তারই সঙ্গে।

চিত্র-শিল্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল সাম্রাজ্যের যুগে। স্বচ্ছন্দজাত বনফুলের মত বর্ণশোভায় যেন মাতোয়ারা করে তুলেছে এ-যুগের শিল্প। শিল্পী তখন রামধনুর সবকটি বর্ণের বিন্যাসকে আয়ত্তের মধ্যে এনেছে, তাই সে রং-এর নানারকম খেলা দেখাতে উন্মুখ। গৃহ, প্রাসাদ, মন্দির, সমাধি যেখানেই আছে দেয়াল আর ছাদের সিলিং সেখানেই বর্ণোজ্জ্বল জীবন্ত ছবি এঁকে ভরে দিয়েছে সে, শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, নীলাকাশে উড়ন্ত পাখী, সন্তরণশীল মাছ, বনের পশু। রং-করা মেঝেটিকে দেখা যায় যেন স্বচ্ছ সরোবর, ছাদের সিলিংটি যেন নক্ষত্র-খচিত আকাশ। 'নাচ-ওয়ালী', 'নৌকায় পাখী শিকার' প্রভৃতি ছবি শিল্পীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও শৈলীর মৌলিকত্বের পরিচয় দেয়। পাথর খোদাই কালে যেমন, চিত্রাঙ্কনেও তেমনি রেখা-টানগুলি খুবই নিপুণ, কিন্তু রচনায় ত্রুটি দেখা যায়। সমষ্টি-চিত্রের



রোজেটা প্রস্তর—ব্রিটিশ মিউজিয়াম

সংস্থানে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধটি যেমন ফুটে ওঠা দরকার, মিশরীয় শিল্পে সেই যোগাযোগের একান্ত অভাব। ব্যক্তিগুলি ছাড়া-ছাড়া ভাবে আঁকা, পরস্পর সম্পর্কশূন্য। পরিপ্রেক্ষিত (perspective) বলে কোন বস্তুই নেই আলেখ্য-গুলিতে। দূর নিকটের ব্যবধানের দিকে শিল্পীর দৃষ্টি অন্ধ, আর রীতি-নীতির বাঁধন দিয়ে শৈলীকে যেমন গোড়া থেকে আটক করে রাখা হয়েছিল, সেই বন্ধন থেকেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয় নি। যেমন, নারীমূর্তি চিত্রিত করবার রীতি ছিল শ্বেত বর্ণে, আর পুরুষের মূর্তি অঙ্কনে লাল রং ব্যবহার করা হত। কিন্তু এ-সব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও শিল্প-সৃষ্টি ছিল আশ্চর্য রকমের সজীব, জীবন্ত প্রকৃতিরই প্রতিরূপ—রূপ-রেখার মাধুর্যে, বর্ণোচ্ছ্বাসের ছটায় অতুলনীয়।

এই ত গেল প্রধান শিল্পগুলির কথা। তাছাড়াও যে সব কারিগরি শিল্প গড়ে উঠেছিল সেগুলির নির্মাণ নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য পিরামিড যুগ থেকেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সমানে ধাপ রেখে চলেছিল। পিরামিড যুগের আলোচনায় বয়ন, ছুতোরের কাজ, কুমোরের কাজ, অলঙ্কার নির্মাণ প্রভৃতি অনেক কারিগরি শিল্পের কথা বলা হয়েছে। সাম্রাজ্যযুগের কারিগরি শিল্পের নমুনাগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে পিরামিড যুগের শিল্পধারাই চলে এসেছে সুদীর্ঘ দুই সহস্র বছর পর্যন্ত। শিল্প এখন শুধু পরিপুষ্টি লাভ করেছে, নানা সাজসজ্জায় পরিশোভিত হয়েছে। তাঁতিদের বোনা গালিচা, পর্দা, আসনের ওপর নানা রং-এর বাহারে কারুকার্য দেখা যায়। সেই জিনিসগুলি সিরিয়ায় রপ্তানি হত। আজও সিরিয়ায় ঐ নমুনার বোনা জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। টুটেনখামেন-এর সমাধিগর্ভে সোনারূপায় মোড়া সুন্দর কাজ-করা কাঠের পালঙ্ক, চেয়ার প্রভৃতি তৈজস পাওয়া গেছে, সেগুলি মিশরীয় ভোগবিলাসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিচিত্র কারুকার্য করা স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র এবং প্রস্তরভাণ্ড শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

সারা প্রাচীন জগতে যেমন মিশরেও তেমনি—আর্ট ছিল ধর্মেরই সহচর। আর্ট স্বয়ংপূর্ণ—অর্থাৎ 'শিল্পের জন্যই শিল্প' (Art for Arts sake) এই ভাবটি সে-যুগে বোধ করি কোথাও জেগে ওঠে নি। রাজ্যের ও ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে আর্টেরও উন্নতি দেখা দিয়েছে। রাজ্যের সম্পদ শিল্পকে পরিপুষ্ট করেছে, আর ধর্ম জুগিয়েছে তার প্রেরণা, ভাব ও লক্ষ্য। ধর্মের সঙ্গে শিল্পের এই যোগাযোগের ফল অবিমিশ্র শুভ হয় নি। গাঁট ছড়ার বাঁধ নানা রকম বাঁধাধরা পদ্ধতি

(Convention) দিয়ে শৈলীকে আড়ষ্ট করে রেখেছে, আর সে জন্য স্বতস্ফূর্ত স্বাধীনতার মধ্যে শিল্প কখনও মুঞ্জরিত হতে পারে নি মিশরে। তাই জাতি যখন স্বধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছে, জাতীয় শিল্পের সজীবতাও তখন নষ্ট হয়ে গেছে।

এক কথায় মিশরীদের 'প্রাচীনকালের আমেরিকান' বলা যেতে পারে। আমেরিকানদের মতই আকারের বিরাটত্ব, বিশাল পরিকল্পনা তাদের চিত্ত আকর্ষণ করতো। পরিশ্রমী ও কর্মী ছিল তারা, তাই প্রস্তরশিল্প ও মূর্তি নির্মাণ ব্যাপারে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিল। পক্ষান্তরে ইতিহাসের চরম রক্ষণশীলতার দৃষ্টান্তস্থল মিশর। কালের প্রভাবে পরিবর্তন মিশরেও ঘটেছে এবং যতই পরিবর্তন ঘটেছে, ততই দেখা গেছে,—মিশর যে-কে-সে।

—শেষ—

বর্ষ-পঞ্জী

[মিশরীয় রাজবংশের কালনির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে, এখন পর্যন্ত বিষয়টির সন্তোষজনক মীমাংসা হয়েছে কি না সন্দেহ। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি মনে করেন, অধিকাংশ মিশরতত্ত্ববিদ ভ্রান্ত ধারণায় বশবর্তী হয়ে কাল নির্ধারণ করেছেন, কেন না তার মধ্যে একটা গোটা 'সোথিকচক্র' (Sothic Cycle) বাদ পড়ে গেছে। উষাক্ষণে উদয় থেকে মহাকাশ প্রদক্ষিণ করে সিরিয়াস নক্ষত্রটির আবার পূর্ব স্থানে ফিরে আসতে লাগে প্রায় ১৪০০ বছর, এবং এবং এই সুদীর্ঘ কালটিকে বলে 'সোথিক চক্র'। এই চক্রের আবর্তন কালের গণনা-পদ্ধতি মিসরীরা প্রথম আবিষ্কার করেছিল ৪৪৪১ খৃস্ট-পূর্বাব্দে, সে বিষয়ে প্রমাণ অনস্বীকার্য, কিন্তু গোল বাধে তার পর থেকে। অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গের মতে সিরিয়াসের এই উষাক্ষণে অভ্যুদয়ের কাল (heliacal rising of Sirius) নিরূপিত হয়েছিল মিশরের উত্তরাংশের অববাহিকা অঞ্চলে, সে-অঞ্চলই ছিল তখন অধিকতর সুসভ্য। তাঁরা বলেন, এই আবিষ্কারের হাজার বছর পরে দক্ষিণাংশ থেকে মেনেস এসে দুই অংশ যুক্ত করেছিলেন এবং প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (৩৪০০ খৃ: পূ:)। তঁহোদের মতে, 'সোথিক চক্র', আবিষ্কারের পর সিরিয়াসের উষাক্ষণে উদয় দ্বিতীয়বার ঘটেছিল পিরামিডযুগে। পক্ষান্তরে স্যর পেট্রির অভিমত এই যে, 'সোথিক চক্র' প্রথম আবিষ্কৃত হয় প্রাগ-বংশীয় যুগে নয়, চতুর্থ কি পঞ্চম বংশীর রাজত্বকালে। তাঁর গণনার হিসাব মত প্রথম বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খৃ: পূ: ৫৫৪৬ অব্দে এবং পিরামিড যুগ আরম্ভ হয় ৪৭৪৮ খৃস্ট পূর্বাব্দে। এই সূত্র ধরে স্যর পেট্রি একটি স্বকীয় বংশপঞ্জী রচনা করেছেন, আমরা সেটিকে গ্রহণ না করে কাল নিরূপণ ব্যাপারে ব্রেস্টেড হল প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি এই জন্যে যে বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করেছেন তাঁরা Cambridge Ancient History-র ওপর ভিত্তি করে, এবং সে ইতিহাস একান্ত নির্ভরযোগ্য।]

রাজবংশ ও রাজাদের রাজত্বকাল

১৮০০০ খৃ: পূ: —নীল নদীর পুরাতন প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি

১০০০০	খৃঃ পূঃ	—নীল নদীর নব প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি
৫০০০	"	—নীল নদীর ব্রঞ্জ সংস্কৃতি
৪২২১	"	—মিশরীয় পঞ্জিকার আবির্ভাব (?)
৩৫০০ (?)	"	—প্রথম বংশের প্রতিষ্ঠাতা মেনেস-এর রাজত্বকাল আরম্ভ
৩৫০০—৩১০০	"	—প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজবংশ
৩১০০—২৬৩১	"	**—প্রাচীন রাজ্য**
৩১০০—২৯৬৫	"	—চতুর্থ রাজবংশ : পিরামিড নির্মাণ
৩০৯৮—৩০৭৫	"	—খুফু : গেজের 'বৃহৎ পিরামিড'
৩০৬৭—৩০১১	"	—খাফরে : স্ফিনক্স মূর্তি
৩০১১—২৯৮৮	"	—মেনকাউরে
২৯৬৫—২৬৩১	"	—পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজবংশ
২৭৩৮—২৬৪৪	"	—দ্বিতীয় পেপি : জগতের ইতিহাসে দীর্ঘতম রাজত্বকাল
২৬৩১—২২১২	"	**—সামন্ত যুগ**
২৩৭৫—১৮০০	"	**—মধ্যম রাজ্য**
২২১২—২০০০	"	—দ্বাদশ রাজবংশ
২২১২—২১৯২	"	—প্রথম আমেনেম-হেট
২১৯২—২১৫৭	"	—প্রথম সেনুসার্ট বা সিসস্ট্রিস
২০৯৯—২০৬১	"	—তৃতীয় সেনুসার্ট
২০৬১—২০১৩	"	—তৃতীয় আমেনেম-হেট
১৮০০—১৬০০	"	**—হিকসোসদের রাজত্বকাল**
১৫৮০—১১০০	"	**—সাম্রাজ্য যুগ**
১৫৮০—১৩২২	"	—অষ্টাদশ রাজবংশ
১৫৮০	"	—অষ্টাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমেস
১৫৪৫—১৫১৪	"	—প্রথম থাটমোস
১৫১৪—১৫০১	"	—দ্বিতীয় থাটমোস
১৫০১—১৪৭৯	"	—রানী হাটসেপসুট : পুন্ট অভিযান
১৪৭৯—১৪৪৭	"	—তৃতীয় থাটমোস : মেগিডডোর প্রথম যুদ্ধ

১৪১২—১৩৭৬	খৃঃ পূঃ	—তৃতীয় আমেনহটেপ
১৪০০—১৩৬০	"	—আমরনা পত্রাবলীর কাল : পশ্চিম এশিয়ার বিদ্রোহ ও সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত
১৩৮০—১৩৬২	"	—চতুর্থ আমেনহটেপ বা ইখনাটন : 'আটন স্তোত্র'
১৩৬০—১৩৫০	"	—টুটেনখামেন
১৩৪৬—১২১০	"	—উনবিংশ রাজবংশ
১৩৪৬—১৩২২	"	—হোরেমহেব
১৩২১—১৩০০	"	—প্রথম সেটি
১৩০০—১২৩৩	"	—দ্বিতীয় রেমেসিস : কারনাকে বিরাট সভাগৃহ নির্মাণের পরিসমাপ্তি
১২৯৫	"	—কাদেসের যুদ্ধ : দাপুর অবরোধ
১২৮০	"	—খাটটিরাজ খাটটুসিলের সঙ্গে দ্বিতীয় রেমেসেসের সন্ধি
১২৩৩—১২২৩	"	—মারনেপটা
১২১৪—১২১০	"	—দ্বিতীয় সেটি
১২০৫—১১০০	"	—বিংশ রাজবংশ : 'রেমেসিস' রাজগণ
১২০৪—১১৭২	"	—তৃতীয় রেমেসিস : হ্যারিস প্যাপিরাসে সাম্রাজ্যের বিবরণ
১১৭২—১১০০	"	—দুর্বল রেমেসিসগণের রাজত্বকাল : বংশের শেষ নৃপতি একাদশ রেমেসিস
১১০০— ৯৪৭	"	—একবিংশ রাজবংশ : লিবিয়ান রাজগণ
১১০০	"	—পুরোহিত হেরিহোরের সিংহাসনে আরোহণ উত্তরাঞ্চল স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত—নানারূপ বিশৃঙ্খলা
৯৪৭— ৭২০	"	—দ্বাবিংশ রাজবংশ : 'বুবস্টাইট' রাজগণ
৮৫০— ৭৪৫	"	—ত্রয়োবিংশ রাজবংশ : 'থিবান' রাজগণ
৯৪৭— ৯২৫	"	—শেশেঙ্ক : জেরুসালেম অধিকার
৯২৫— ৮৮৪	"	—প্রথম ওসোরকন
৮৯৬— ৮৭১	"	—তাকেলোতি

৮৭৪— ৮৫০	”	—দ্বিতীয় ওসোরকন
৮৫১— ৮২৫	”	—দ্বিতীয় শেশেঙ্ক
		—দ্বিতীয় তাকেলোতি
৮৩২— ৭৮১	”	—তৃতীয় শেশেঙ্ক
৭৮১— ৭৭৭	”	—পিমাই
৭৭৭— ৭৪০	”	—চতুর্থ শেশেঙ্ক
৭৫৯— ৭৩৫	”	—পেতুবাস্তে
৭৪৪— ৭২০	”	—তৃতীয় ওসোরকন
৭২৫— ৬৬৩	”	—চতুর্বিংশ রাজবংশ : ‘মেমফাইট’ রাজগণ
৭২০— ৭১৮	”	—তেফনাখ্‌তে
৭৪৫— ৬৬৩	”	—পঞ্চবিংশ রাজবংশ : ‘ইথিওপীয়’ রাজগণ
৭২৮— ৭১৫	”	—পিয়ানখি
৭১৫— ৭০১	”	—সাবাক
৭২০	”	—রাফিয়ার যুদ্ধ—আসিরীয় সম্রাট দ্বিতীয় সারগন কর্তৃক আক্রান্ত মিশর বাহিনীর পরাজয়
৭০৫ (?)	”	—এলেটেকের যুদ্ধ : মিশরের দ্বারদেশে সসৈন্য আসিরীয় রাজা সেননাচেরিব
৭০১— ৬৮৯	”	—সাবাতোকা
৬৮৯— ৬৬৩	”	—তাহরকা
৬৭৪	”	—আসিরিয়া-রাজ এসারহেডন কর্তৃক মিশর জয়
৬৬১	”	—আসিরিয়া-রাজ আসুরবানিপাল কর্তৃক মিশর পুনর্বিজয়
৬৬১— ৬৫১	”	**—মিশরে আসিরিয়ার প্রভুত্ব**
৬৬৩— ৫২৫	”	—ষড়বিংশ রাজবংশ : ‘সাইটে’ রাজগণ : শিল্পকলার বিকাশ
৬৬৩— ৬০৯	”	—সামেটিক
৬০৯— ৫৯৩	”	—নেকো : মিশরে গ্রীক আদর্শ প্রবর্তনের সূত্রপাত
৬০৮	”	—মেগিড্‌ডোর যুদ্ধ : ইসরায়েল রাজ জোসুয়া নিহত
৬০৪	”	—কারকেমিশের যুদ্ধে নেকোর পরাজয়

৫৯৪— ৫৮৯	"	—দ্বিতীয় সামেটিক
৫৮৯— ৫৭০	"	—উশব্রা
৫৭২— ৫২৬	"	—আমোসিস
৫২৬— ৫২৫	"	—তৃতীয় সামেটিক : পেলুসিয়ামের যুদ্ধ
৫২০	"	**—পারস্য কর্তৃক মিশর বিজয়**
৪৮৫	"	—পারস্যের বিরুদ্ধে মিশরের বিদ্রোহ
৪৮৪	"	—পারস্যরাজ জারেকজেস কর্তৃক মিশর পুনরধিকার
৪৮২	"	—গ্রীসের বিরুদ্ধে পারস্যের অভিযানে মিশরের যোগদান
৪৫৫	"	—মিশরের বিরুদ্ধে এথেনসের ব্যর্থ নৌ-অভিযান
৪০৭— ৩৪২	"	—পারস্যের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিদ্রোহ
৩৩২	"	**—গ্রীকদের মিশর বিজয়ঃ আলেকজান্দ্রিয়া নগর স্থাপন**
২৮৩— ৩০	"	—টোলেমি রাজগণ
৩০	"	—টোলেমি বংশীয়া রানী ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর মিশরকে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তীকরণ

গ্রন্থ-পঞ্জী

J. H. Breasted—A History of Egypt
—Ancient Times
—Development of Religious Thoughts in Ancient Egypt
James Baikie—A History of Egypt
H. R. Hall—The Ancient History of the Near East
Will Durant—Our Oriental Heritage
Arnold Toynbee—A Study of History
H. G. Wells—An Outline History of the World
Webster and Westby—World Civilisation
V. Gordon Childe—What Happened in History
—New Light on the Most Ancient East
Weidemann—The Realm of the Egyptian Dead
Sir William Petrie—Religion and Conscience of Ancient Egypt
Sir Leonard Wooley—Digging up the Past
H. Frankfort & others—Before Philosophy
Lewis Spence—Outlines of Mythology
L. W. King—History of Babylon
A. Robertson—Morals in World History
F. Sherwood Tayler—History of Science
F. W. Westaway—The Endless Quest (3000 years of Science)
Bible (Old Testament) : King ; Chronicles ; Amos ; Genesis
—(New Testament) : St John

নাম-সূচী